কাকাবাবুর কাণ্ডকারখানা

কামিনী প্রকাশালয় ॥ ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন কলি-৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলিকাতা - ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

অলংকরণে ঃ
দিলীপ দাস

মূল্য ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা

মুদ্রণে ঃ
শ্রীমা মুদ্রণ
৮/বি, শিব নারায়ণ দাস লেন,
কলকাতা - ৭০০০০৬

কাকাবাবুর কাণ্ডকারখানা

কাকাবাবুর কাণ্ডকারখানা
কাকাবাবুর কাণ্ডকারখানা

ঃ এতে যা আছে ঃ

জঙ্গলগড়ের চাবি
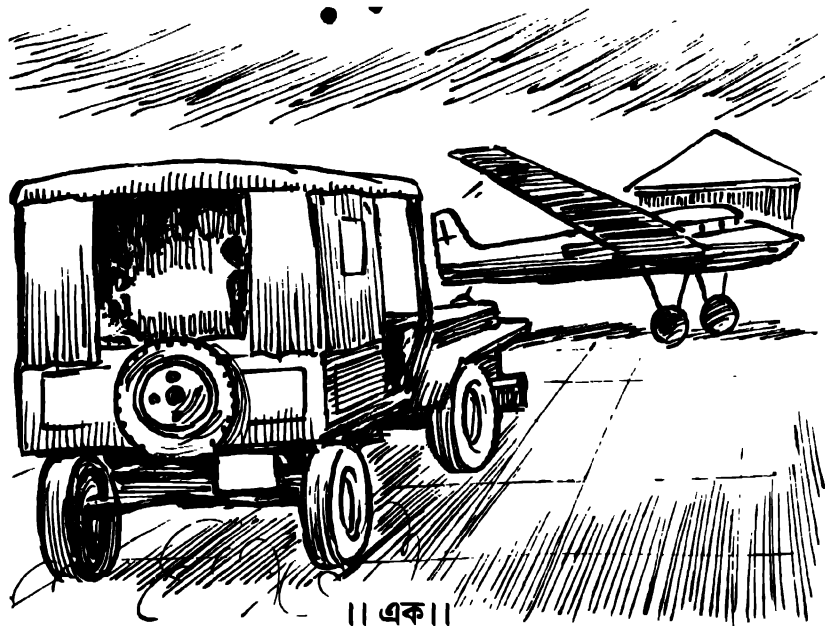
।। এক ।।

মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ সকালে। রাস্তা থেকে হকার খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে গেছে একটু আগে, সেটা পড়ে আছে দোতলার বারান্দার কোণে।

সন্তু কিন্তু ঘুমিয়ে আছে এখনও। আজ যার রেজাল্ট বেরুবার কথা, তার কি এতবেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা উচিত? একটু চিন্তা-ভাবনা নেই?

আসলে সন্তু সারারাত ঘুমতেই পারেনি। ছট্‌ফট্ করেছে বিছানায় শুয়ে। মাঝে মাঝে উঠে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখছে ভোর হল কিনা। বুকের মধ্যে টিপ-টিপ শব্দ। ভয়ে সে সত্যি সত্যি কাঁপছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, পরীক্ষা দেবার সময় সন্তুর একটুও ভয় হয়নি, তারপর যে তিন মাস কেটে গেল তখনও একদিনের জন্য কোনও ভয়ের চিন্তা মনে আসেনি। কাল সন্ধ্যেবেলা সুমন্ত যেই বলল, 'জানিস, আজই রেজাল্ট আউট হতে পারে!' তারপর থেকেই সন্তুর বুক-কাঁপা শুরু হয়ে গেল। যদি সে ফেল করে!

সব কটা পরীক্ষায় মোটামুটি ভালই সব প্রশ্নের উত্তর লিখেছে সন্তু। কিন্তু কাল রাত্তিরেই শুধু তার মনে হল, যদি উত্তরগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে যায়? অঙ্কগুলো যদি সব ভুল হয়? অঙ্কের পেপারের সব উত্তর সন্তু মিলিয়ে দেখেছে বটে, কিন্তু মাঝখানের প্রসেস যদি কিছু লিখতে ভুল হয়ে থাকে?

ফেল করলে যে কি লজ্জার ব্যাপার হবে, তা সন্তু ভাবতেই পারছিল না। বন্ধুরা সব এগারো-বারোর কোর্সে পড়তে চলে যাবে। আর সে পড়ে থাকবে পুরনো ক্লাসে। নিচু ক্লাসের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে তাকে? সন্তু ফেল করলে মা-বাবা-কাকাবাবু ছোড়দিরা সবাই সন্তুর দিকে এমন অবহেলার চোখে তাকাবেন, যেন সন্তু একটা মানুষই নয়!

ফেল করার সবচেয়ে খারাপ দিক হল, তা হলে আর কাকাবাবু নিশ্চয়ই তাকে অন্য কোনও অভিযানে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। বাবা বলবেন, পড়াশুনো নষ্ট করে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান? কক্ষণও চলবে না।

এই সব ভাবতে ভাবতে সারারাত ছটফটিয়ে, শেষ পর্যন্ত এই ভোরের একটু আগে সন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাকাবাবু ছাড়া এ বাড়িতে সবাই একটু দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। তাছাড়া ভুপাল থেকে ছোড়দি বেড়াতে এসেছে বলে কাল অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়েছে। আজ আবার রবিবার। কারুর উঠবার তাড়াও নেই। সন্তু কাল রাত্তিরে কারুকে বলেওনি যে আজ তার রেজাল্ট বেরুবে।

কাকাবাবু ভোরবেলা উঠে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন।

প্রথমে ঘুম ভাঙলো ছোড়দির।

বিয়ের আগে ছোড়দিই সকালবেলা চা তৈরি করে বাবা আর মাকে ঘুম থেকে তুলত। আজও ছোড়দিই চা বানিয়ে এনে ঠিক সেই আগের মতন বাবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'চা কিন্তু রেডি !'

বাবা চায়ের টেবিলে এসেই অভ্যাস মতন বললেন, 'খবরের কাগজটা কই রে?'

ছোড়দি বারান্দা ঘুরে দেখে এসে বলল, 'এখনও কাগজ দেয়নি!'

আসলে হয়েছে কী, বারান্দায় কয়েকটা ফুলগাছের টব আছে তো। তারই একটা টবের পেছনে গোল করে বাঁধা কাগজটা লুকিয়ে আছে।

চা পানের সময় কাগজ পড়তে না পারলে বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি বিরক্তভাবে বললেন, 'কি যে হয়েছে আজকাল সব ব্যবস্থা, ঠিক সময়ে কাগজ আসে না। আর এক কাপ চা কর!'

মা বললেন, 'সন্তু এখনও ওঠেনি? ওকে ডাক্।'

ছোড়দি বলল, 'ডাকছি। সন্তু কি এখনও সকালে দুধ খায়, না অন্য কিছু খায়?'

মা বললেন, 'পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে ওরও এখন ওর কাকার মতন খুব চা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। শুধু দুধ খেতে চায় না।'

ছোড়দি আবার চায়ের জল চাপিয়ে ডাকতে গেল সন্তুকে।

বাড়িতে বেশি লোকজন এলে সন্তুর পড়াশুনোর অসুবিধে হয়। সেই

জন্য এখন সন্তুকে ছাদের ঘরটা একলা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানেই সে রাত্তিরে ঘুমায়।

ডাকতে এসে ছোড়দি দেখল সন্তুর চোখ দুটো বোজা থাকলেও দুটো জলের রেখা নেমে আসছে চোখের তলা দিয়ে! বুকটা মুচ্‌ড়ে উঠল ছোড়দির। আহা রে, ছেলেটা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কোনও দুঃখের স্বপ্ন দেখছে।

সন্তুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছোড়দি ডাকল, 'এই সন্তু, সন্তু! ওঠ্!'

দু'বার ডাকতেই, সন্তু চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে রে? মুখখানা এমন কেন? কি স্বপ্ন দেখছিলি?'

এবারেও সন্তু কোনও উত্তর দিল না। মনে মনে বলল, আজকের সকালের পর আর তাকে কেউ ভালবাসবে না।

ছোড়দি আদর করে সন্তুর হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে বলল, 'অমন শুকনো মুখ করে আছিস কেন? চল্ নিচে চল।

হঠাৎ সন্তুর মনে পড়ল, আজ রবিবার। আজ তো স্কুল খোলা থাকবে না। রেজাল্ট তো আনতে হবে স্কুল থেকে। তা হলে আর একটা দিন সময় পাওয়া গেল। কালকের আগে তার রেজাল্ট জানা যাবে না।

দ্বিতীয় কাপ চা পেয়ে বাবা বললেন, আঃ, এখনও কাগজ এল না?'

ছোড়দি বলল, 'দেখছি আর একবার।'

ছোড়দি ছুটে গেল বারান্দায়।

সন্তুর জন্য মা স্পেশাল চা বসিয়ে দিয়েছেন। অনেকখানি দুধের মধ্যে একটুখানি চা। তাও কাপে নয়, বড় গেলাসে। সেই গেলাসটা ধরে সন্তু গোঁজ হয়ে বসে আছে।

এবারে ছোড়দি টবের আড়াল থেকে কাগজটা পেয়ে গেল। সুতো খুলে প্রথম পাতাটা পড়তে-পড়তে এগিয়ে এসে বলল, আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে!'

সন্তু যেন পাথর হয়ে গেছে, তার নিঃশ্বাস বন্ধ।

মা বললেন, 'তাই নাকি? এই সন্তু, তোদের আজ রেজাল্ট বেরুবে, তুই জানতিস না।'

সন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে এমনভাবে একটু আস্তে মাথা নাড়ল যার মানে হ্যাঁ-ও হয়, না-ও হয়।

বাবা বললেন, 'তোর রেজাল্ট তো স্কুলে আসবে! এক্ষুনি স্কুলে চলে যা!'

সন্তু খসখসে গলায় বলল, আজ রবিবার!'

ছোড়দি বলল, 'আমাদের সময় তো কলেজ স্ট্রিটে রেজাল্ট-এর ছাপা বই বিক্রি হত। এখন হয় না?'

বাবা বললেন, 'কী জানি! কিন্তু রবিবার হলেও আজ স্কুল খোলা রাখবে নিশ্চয়ই। ছেলেরা রেজাল্ট আনতে যাবে না?'

ছোড়দি বলল, 'এই তো ফার্স্ট বয় আর ফার্স্ট গার্লের ছবি বেরিয়েছে। ফার্স্ট হয়েছে সৌমিত্র বসু, নরেন্দ্রপুর। আর মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে কাকলি ভট্টাচার্য, বীরভূম। সেকেণ্ডেরও নাম দিয়েছে? ওমা, এক সঙ্গে দু'জন সেকেণ্ড হয়েছে, ব্রাকেটে, অভিজিৎ দত্ত আর সিদ্ধার্থ ঘোষ। সন্তু তুই এদের কারুকে চিনিস নাকি রে?'

সন্তুর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। এক্ষুনি যেন তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। ক্রমশই তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে, সে ফেল করেছে।

কান্না লুকোবার জন্য সন্তু বাথরুমে ছুটে চলে গেল।

ছোড়দির কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে নিলেন বাবা। অন্য খবরের বদলে তিনি রেজাল্টের খবরটাই পড়তে লাগলেন মন দিয়ে। খবরের কাগজের লোকেরা কি করে আগে থেকে খবর পেয়ে যায়? কালকের রাত্তিরের মধ্যেই ফার্স্ট হওয়া ছেলেমেয়েদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে হাজির হয়েছে, ছবি তুলেছে, তাদের বাবা মায়ের ইন্টারভিউ নিয়েছে। কাকলি ভট্টাচার্যের মা বলেছেন, তাঁর মেয়ে লেখাপড়াতেও যত ভাল, খেলাধূলোতেও তত ভাল। অনেক মেডেল পেয়েছে।

কাগর্জ পড়তে পড়তে বাবা হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, 'এঃ রাম!'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল?'

বাবা বললেন, দেখেছ কাণ্ড! আমাদের সন্তুটা ফিফ্‌থ হয়েছে।'

মা আর ছোড়দি দু'জনেই এক সঙ্গে চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? কি বললে?'

বাবা বললেন, 'এই তো প্রথম দশজনের নাম দিয়েছে। তার মধ্যে দেখছি সন্তুর নাম।'

মা আর ছোড়দি ততক্ষণে দু'পাশ দিয়ে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

মা বললেন, 'কই কই?'

ছোড়দি বলল, 'এই তো, সুনন্দ রায়চৌধুরী। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল!'

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ আমার সন্তুই তো?'

মা বললেন, 'তবে আবার কে হবে! ওর নাম রয়েছে, স্কুলের নাম রয়েছে

... সন্তু, এই সন্তু, কোথায় গেলি?'

বাবা বললেন, 'ওদের স্কুলে ওই নামে অন্য কোনও ছেলে নেই তো?'

মা বললেন, 'আহা-হা! অদ্ভুত কথা তোমার। ওদের ক্লাসে ঠিক এ-নামে আর কেউ থাকলে সন্তু আমাদের এতদিন বলত না? সন্তু কোথায় গেল! এই সন্তু—।

বাবা কাগজটা সরিয়ে রেখে দিয়ে বললেন, 'ছি ছি!'

মা দারুণ অবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড় বড় করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে? ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করেছে। আর তুমি বলছ ছি ছি?'

বাবা বললেন, ফিফ্‌থ হল। ফার্স্ট হতে পারল না?'

মা বললেন, ফিফ্‌থ হওয়াই কি কম নাকি? যথেষ্ট ভাল করেছে। আমি তো আশাই করিনি—'

বাবা বললেন, 'যে ফিফ্‌থ হতে পারে, সে আর একটু মন দিয়ে পড়লে ফাস্টও হতে পারত।'

ছোড়দি বলল, 'ভাল হয়েছে সন্তু ফার্স্ট হয়নি। ও ফার্স্ট হলে সৌমিত্র বসু সেকেণ্ড হত! তাহলে তার বাবার মনে দুঃখ হত না?'

মা বললেন, 'ছেলেটা বাথরুমে ঢুকে বসে রইল, নিশ্চয়ই এখনও কিছুই জানে না! এই মুন্নি, ওকে ডাক না!'

ছোড়দি ছুটে গিয়ে, বাথরুমের দরজায় দুম্‌দুম্ করে কিল মেরে ডাকে,'এই সন্তু, সন্তু।'

সন্তু কোনও সাড়া দিল না।

ছোড়দি বলল, 'শিগ্‌গির বের'হ! কি বোকার মতন এতক্ষণ বাথরুমে বসে আছিস!

সন্তুর ইচ্ছে, সে আজ, সারাদিন আর বাথরুম থেকে বেরুবে না। এইখানেই বসে থাকবে।

'দরজা খোল না। কি হয়েছে জানিস? কাগজে বেরিয়েছে, তুই ফিফথ হয়েছিস!'

একটা পিংপং বল্ যেন সন্তুর বুকের মধ্যে নাচানাচি করতে লাগল। কি বলল ছোড়দি? সে ভুল শোনেনি তো!

খটাস্ করে বাথরুমের দরজা খুলে সন্তু জিজ্ঞেস করল, কি বললে?'

'তুই ফিফ্‌থ হয়েছিস!'

'ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে?'

'কাগজে নাম ছাপা হয়েছে তোর। দেখবি আয় বোকারাম!'

ফিফ্‌থ হওয়ার ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিল না সন্তু। তার মানে সে পাশ করেছে? সত্যি সত্যি পাশ! ইস্কুলের পড়া শেষ!

সন্তু ছুটে গেল কাগজ দেখতে।

সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল। সন্তুর এক মামা ফোন করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাগজে মাধ্যমিকের রেজাল্টে এক সুনন্দ রায়চৌধুরীর নাম দেখছি। ওকি আমাদের সন্তু নাকি?'

ছোড়দি বলল, হ্যাঁ, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের নামও তো রয়েছে পাশে।'

মামা বললেন, কোথায় সন্তু। দে না তাকে ফোনটা। তাকে কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স জানাই।'

মায়ের মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে। বাবার মুখখানা কিন্তু দুঃখী দুঃখী। তিনি বললেন, 'যাই বল, ফিফ্‌থ হওয়ার কোনও মানে হয় না। ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতে পারলে তবু একটা কথা। নইলে ফিফ্‌থই হও আর টুয়েলফই হও, একই কথা।'

ছোড়দি বলল, 'মোটেই এক কথা নয়? দশজনের মধ্যে নাম থাকা মানে তো সন্তু স্কলারশিপ পাবে।'

মা বললেন, 'পাবেই তো! তাও তো এ-বছর ওর কতগুলো দিন সেই নষ্ট হয়েছে নেপালে! পড়ার বইয়ের চেয়ে গল্পের বই ও বেশি পড়ে—!'

সন্তু ফোন ছেড়ে দিতেই মা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুই ফার্স্ট ডিভিশন পেলেই আমরা খুশি হতুম রে সন্তু! তুই যে এতখানি ভাল করবি...! যা, বাবাকে প্রণাম কর!'

ছোড়দি বলল, 'মা, দারুণ একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু। সন্তুর বন্ধুদের ডেকে—'

সন্তু এখনও ভাল করে কথা বলতে পারছে না। সে এতই অবাক হয়ে গেছে। পাশ করা সম্পর্কেই তার সন্দেহ ছিল, আর সে কিনা স্কলারশিপ পেয়ে গেল!

বাবা বললেন, 'ফার্স্ট হলে কাগজে ওর ছবি ছাপা হত!'

মা বললেন, 'ফের তুমি ওরকম কথা বলছ? নেপালে সেবার ওই রকম কান্ড করবার পর প্রত্যেকটা কাগজে সন্তুর ছবি বেরিয়েছিল তোমার মনে নেই? এর চেয়ে অনেক বড় ছবি।'

এই সময় কাকাবাবু ফিরলেন বাইরে থেকে। ঘরে ঢুকে বললেন, 'কি ব্যাপার? এত গোলমাল কিসের?'

।। দুই ।।

কাকাবাবুর চেয়ে সন্তুর বাবা মাত্র দু'বছরের বড়। কিন্তু দু'জনের চেহারার অনেক তফাত। কাকাবাবু যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া কাঁধ, চওড়া কব্জি। আর পুরুষ্টু গোঁফটার জন্য কাকাবাবুকে মিলিটারী অফিসারের মতন দেখায়। সন্তুর বাবাও বেশ লম্বা হলেও রোগা-পাতলা চেহারা, কোনদিন গোঁফ রাখেননি, মাথার চুলও একটু-একটু পাতলা হয়ে এসেছে। কাকাবাবু যেমন অল্প বয়েস থেকেই পাহাড়-পর্বতে আর দেশ বিদেশে ঘোরাঘুরি করতে ভালবাসেন, বাবার স্বভাব ঠিক তার উল্টো। উনি বাড়ি থেকে বেরুতেই চান না, অফিসের সময়টুকু ছাড়া। জীবনবীমা সংস্থায় উনি অ্যাকচুয়ারির কাজ করেন, খুব দায়িত্বপূর্ণ পদ, দারুণ অঙ্কের জ্ঞান লাগে।

দুই ভাইয়ের সম্পর্ক ঠিক বন্ধুর মতন। সব রকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন দু'জনে।

কাকাবাবুর ডাকনাম খোকা।

সন্তুদের কাছে অভ্যেস হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বাইরের কেউ এসে এই নাম শুনে অবাক হয়ে যায়। অনেকে হেসে ফেলে। অতবড় একজন জাঁদরেল চেহারার মানুষের নাম খোকা হতে পারে? কিন্তু কাকাবাবুও তো একদিন ছোট্ট ছিলেন, তখন ওই নামে তাকে মানাত। বড় হলেও তো আর ডাকনাম বদলায় না।

সন্তুর রেজাল্টের কথা শুনে কাকাবাবু বললেন, 'অ্যাঁ, পাশ করেছে? কি আশ্চর্য কথা! সন্তু তো তাহলে খুব গুণের ছেলে। কখন পড়াশুনো করে দেখতেই পাই না।

বাবা বললেন, 'যা-ই বল। ফার্স্ট হলে আমি খুশি হতাম। পাশ তো সবাই করে।

মা কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে বললেন, 'দেখেছ, দেখেছ! বছরের মধ্যে ক'মাস বাইরে কাটিয়ে এসেও যে সন্তু এত ভাল রেজাল্ট করেছে, তাতে ওর বাবার আনন্দ নেই!'

বাবা বললেন, তুই-ই বল খোকা, যখন ফিফ্‌থই হল, তখন চেষ্টা করলে ফার্স্ট হতে পারত না? ফার্স্ট আর ফিফ্‌থের মধ্যে বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ নম্বরের তফাৎ।'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি তো জীবনে কোনদিন স্ট্যাণ্ড করিনি! সন্তুর তবু কাগজে নাম উঠেছে...অবশ্য দাদা তুমিও... বলে দেব, দাদা, বলে দেব সেই কথাটা?'

বাবা অমনি কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সন্তু

যা করেছে যথেষ্ট। এখন কোন্ কলেজে ভর্তি হবে সেটা ঠিক কর।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, কি কি? কি বলবে বলছিলে? চেপে যাচ্ছ কেন?'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললে, 'দাদা, 'বলে দিই?'

বাবা বললেন, 'আঃ খোকা, তুই কি যে করিস! ওসব পুরনো কথা—'

কাকাবাবু তবু বললেন, 'জান বৌদি, দাদা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল।'

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'অ্যাঁ?'

সন্তু এতক্ষণ লজ্জায় মুখ গুঁজে বসেছিল, সে-ও মুখ তুলে তাকাল। ছোড়দিও অবাক হয়ে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

মা বললেন, 'সত্যি? এ কথা তো আমি কোনদিন শুনিনি!'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি! আমাদের সময় তো স্কুল ফাইনাল ছিল না। তখন ছিল ম্যাট্রিক। দাদাকে এখন সবাই পণ্ডিত মানুষ হিসেবে জানে, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না, দাদা কিন্তু সত্যিই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল।'

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, তখন দাদু কি করেছিলেন? দাদু তো খুব রাগী ছিলেন, মেরেছিলেন বাবাকে?'

দাদু অর্থাৎ ঠাকুর্দাকে সন্তু চোখেই দেখেনি, তিনি মারা গেছেন সন্তুর জন্মের আগে। দাদু সম্পর্কে অনেক গল্প সে শুনেছে! বাবা আর দাদুর এই নতুন কাহিনীটি শোনবার জন্য সে উদগ্রীব হল।

কাকাবাবু বললেন, 'আমাদের বাবা খুব রাগী ছিলেন ঠিকই। আমরা কেউ পড়াশুনোয় একটু অমনোযোগী হলেই উনি বলতেন, আর কি হবে, বড় হয়ে চায়ের দোকানে বেয়ারার চাকরি করবি। আমার খেলাধূলোয় বেশি ঝোঁক ছিল বলে পড়াশুনোয় মাঝে মাঝে ফাঁকি দিতুম, সেইজন্য বাবার কাছে খুব বকুনি খেতুম, কিন্তু...'

বাবা অ-খুশি মুখ করে কাকাবাবুর কথা শুনছিলেন, এবার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুই অনেক মারও খেয়েছিস বাবার হাতে। সে কথা বলছিস না কেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ আমি মারও খেয়েছি অনেকবার।' কিন্তু দাদা বরাবরই পড়াশুনোয় খুব ভাল। সেই দাদা যে ম্যাট্রিক ফেল করবে তা কেউ ভাবেইনি। আসলে হয়েছিল কি, অঙ্ক পরীক্ষার দিন দাদা আইনস্টাইনের মতন নতুন থিয়োরী দিয়ে সব কটা অঙ্ক করেছিল। প্রত্যেকটা অঙ্কের উত্তর লিখেছিল প্রথমে, তারপর প্রসেস দেখিয়েছে—একজামিনার রেগে-মেগে জিরো দিয়ে দিয়েছে। রেজাল্ট বেরুবার দিন মা আর আমাদের এক পিসি

দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। ওঁরা ভাবলেন, বাবা রেগে-মেগে বোধহয় রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাবেন! সেইজন্য দাদাকে লুকিয়ে রাখা হল ঠাকুর ঘরে। বাবা কিন্তু দাদাকে খুঁজলেনও না। সারাদিন মন খারাপ করে শুয়ে রইলেন। তারপর সন্ধ্যেবেলা মাকে বললেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমার খরচ বেঁচে গেল। ও ছেলেকে আমি আর পড়াব না। ওকে চায়ের দোকানের চাকরি খুঁজে নিতে বল তোমরা! বাবা সাঙ্ঘাতিক জেদি আর এক-কথার মানুষ। কিছুতেই আর তাঁর মত ফেরান গেল না। আমাদের ইস্কুলে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন যে তাঁর ওই ছেলেকে আর ফেরত নেবার দরকার নেই।'

ছোড়দি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কি হল?'

'দাদা তখন ঠিক করল মনুমেন্টের ওপর থেকে ঝাঁপ দেবে!'

বাবা বললেন, 'কি বাজে কথা বলছিস, খোকা? মোটেই আমি ওরকম..'

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ দাদা, আমার আজও মনে আছে। তুমি আমাকে ওই কথা বলেছিলে। আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। ভাবছিলুম মাকে জানিয়ে দেব। যাই হোক, দাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল চন্দননগরে আমাদের মামাবাড়িতে। সেইখান থেকেই পরের বছর পরীক্ষা দেয়। পরের বছর কি হয়েছিল বল তো?

ছোড়দি বললে, 'জানি। বাবা ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিল।'

মা বললেন, 'আমরা এতদিন জেনে এসেছি যে, তুমি সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছাত্র। কিন্তু তোমারও যে এসব কলঙ্ক আছে তা তো আমাদের কোনদিন বলনি!'

কাকাবাবু বললেন, 'একবার ফেল করে ভালই হয়েছিল দাদার পক্ষে। দাদা ভাল ছাত্র ছিল বটে, কিন্তু ফার্স্ট হবার মতন ছিল না। ফেল করে অভিমান হল বলেই—'

বাবা বললেন, 'না। মোটেই না। প্রথমবারই আমার ফার্স্ট হওয়া উচিত ছিল, এক্‌জামিনার আমার অঙ্ক বুঝতে পারেননি!'

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, 'পরের বার বাবা যে ফার্স্ট হলেন, সে খবর পেয়ে দাদু কি বললেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'তোমার বাবা ফার্স্ট হওয়ায় আমার বাবা হঠাৎ উল্টে আমার ওপর চোটপাট শুরু করে দিলেন। আমায় ডেকে বললেন, 'পারবি? তুই তোর দাদার মতন পারবি? তোর দাদার পা-ধোওয়া জল খা, তবে যদি পাশ করতে পারিস!'

সবাই হেসে উঠল এক সঙ্গে।

এইরকমভাবে আড্ডায় সকালটা কেটে গেল। সন্ধ্যেবেলা সন্তুর নেমন্তন্ন এক বন্ধুর বাড়িতে।

৭

সন্তুর বন্ধু আজিজের বোন রেশমা গত মাসে জলে ডুবে গিয়েছিল। সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

আজিজরা কলকাতায় পার্ক সার্কাসে থাকলেও ওরা প্রায়ই যায় জলপাইগুড়িতে। সেখানে ওদের একটা চা-বাগান আছে। গত মাসে সেই চা-বাগান থেকে ওরা অনেকে মিলে গিয়েছিল ডায়না নদীর ধারে পিকনিক করতে। রেশমার বয়েস মাত্র সাত বছর, সে যে কখন চুপিচুপি খেলা করতে করতে জলে নেমেছে, তা কেউ লক্ষ্যও করেনি। ডায়না নদীতে যখন জল থাকে, তখন বড় সাঙ্ঘাতিক নদী, খুব স্রোত। রেশমা সেই স্রোতে ভেসে যাবার পর আজিজের মামা প্রথমে দেখতে পান। তিনি চেঁচামেচি করে উঠলেন, সবাই তখন নদীর ধার দিয়ে দৌড়াতে লাগলেন। কাছেই একটা জেলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিল, সে রেশমাকে দেখে জাল ছুঁড়ে আটকে ফেলে। আর একটু দূরেই ছিল একটা বড় পাথর। সেখানে ধাক্কা লাগলেই রেশমার মাথা একেবারে ছাতু হয়ে যেত!

প্রায় অলৌকিকভাবেই বেঁচে গেছে রেশমা। সেইজন্যই এবারে তার জন্মদিন করা হচ্ছে খুব ধুমধামের সঙ্গে।

খুব ফুর্তির সঙ্গেই সন্তু গেল নেমন্তন্ন খেতে।

আজিজের বাড়িটা মস্ত বড়। আর ওদের আত্মীয়-স্বজনও প্রচুর।

তারা অনেকেই সন্তুকে চেনেন। সন্তুর কয়েকজন বন্ধুও এসেছে। আজিজের বাড়ির লোকেরা কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন সন্তু, কি রকম রেজাল্ট হল? সন্তুকে নিজের মুখে কিছুই বলতে হল না। আজিজ কিংবা অন্য কোনও বন্ধু আগে থেকেই বলে ওঠে, জান না, ও ফিফ্‌থ হয়েছে। কাগজে আমাদের ইস্কুলের নাম বেরিয়েছে এই সন্তুর জন্য।

তখন তাঁরা সবাই 'বাঃ বাঃ' বলে পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন সন্তুর।

সন্তুর একটু-একটু গর্ব হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু লজ্জাও হচ্ছে খুব। যেন এই বিষয়টা নিয়ে কেউ আলোচনা না করলেই ভাল হয়। ফিফ্‌থ হওয়াটাই বা এমন কি ব্যাপার!

কালকের সন্ধ্যের সঙ্গে আজকের সন্ধ্যের কত তফাৎ। আজ কত আনন্দ আর হৈ হৈ, আর কালকে সে ফেল করার দুশ্চিন্তায় একেবারে চুপ্‌সে কাচু হয়েছিল। মানুষের জীবনের পর পর দুটো দিন যে ঠিক এক রকম হবেই, তা কেউ বলতে পারে না।

এক সময় সন্তু ভাবল, কেন মিছিমিছি অত ভয় পাচ্ছিল কাল? ফেল করলেই বা কি হত? তার বাবাও তো ফেল করেছিলেন। ফেল করলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় না। মনের জোর রাখাটাই আসল ব্যাপার।

আজিজের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আগে অনেক রকম খেলা হল। তার মধ্যে শেষ খেলাটা হল বন্দুক ফাটান।

অন্তত দশটা বেলুন দিয়ে সাজান হয়েছে সারা বাড়িটা। লাল টুকটুকে ভেলভেটের ফ্রক্ পরা রেশমাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা পরীর মতন। জন্মদিনের কেক কাটার পর ফুঁ দিয়ে যখন মোমবাতিগুলো নেভান হচ্ছে, ঠিক সেই সময় আপনা-আপনি একটা বেলুন খসে পড়ল সেখানে। জলন্ত মোমবাতির কাছাকাছি আসতেই দুম করে ফেটে গেল সেটা।

রেশমা হাততালি দিয়ে বলে উঠল, কি মজা! কি মজা!

তারপরই সে আবদার ধরল, 'কী মজা। কী মজা! আরও বেলুন ফাটিয়ে দাও! সব কটা বেলুন ফাটিয়ে দাও!'

রেশমার বাবা সুলেমান সাহেব বললেন, 'না, না এখন ফাটিও না, সুন্দর সাজান হয়েছে, কাল সকালে...'

রেশমা তবু বলল, 'না, ফাটিয়ে দাও! সব কটা ফাটিয়ে দাও।'

আজকের দিনে রেশমার আবদার মানতেই হয়। সেইজন্য অন্যরা যে যে কটা বেলুন পেল, ফটাস ফটাস করে ফাটাতে শুরু করে দিল।

কিন্তু বেশির ভাগ বেলুনই ওপরে ঝোলান, হাতের নাগাল পাওয়া যায় না। অনেকে লাফিয়ে সেগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগল আর খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগল রেশমা।

আজিজ টুক করে নিয়ে এল ওর এয়ারগানটা। সেটা উঁচিয়ে তুলে বলল, 'এবার দ্যাখ্ রেশমা, সব কটা কি রকম ফাটিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু আজিজের অত ভাল টিপ নেই। সে চার-পাঁচটা গুলি ছুঁড়লে একটা বেলুন ফাটে।

তখন শুরু হয়ে গেল কমপিটিশন। পরপর দশটা গুলি ছুঁড়ে কে সবচেয়ে বেশি বেলুন ফাটাতে পারে। কেউ তিনটে চারটের বেশি পারল না। আজিজের মামা ফাটালেন পাঁচটা!

সন্তু এয়ারগানটা হাতে নিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'সবাই এক এক করে গুনুক্। আমি দশটায় ঠিক দশটা ফাটাব!'

এ ব্যাপারে গর্ব করতে সন্তুর কোনও লজ্জা নেই। সে আসল রিভলভারে গুলি ছুঁড়েছে। এতো সামান্য একটা এয়ারগান।

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, এক!

সন্তু সত্যি-সত্যি পরপর দশটা বেলুন ফাটাতে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল একসঙ্গে। সন্তু বীরের মতন এয়ারগানটা তুলে দিল পাশের বন্ধুর হাতে।

ইটের পাজার কাছে কাকাবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে আছে

খুব মজা হল রাত পর্যন্ত।

পরদিন সকালটা আবার একেবারে অন্যরকম।

সন্তু সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। কাকাবাবু এখনও মর্নিং ওয়ার্ক থেকে ফেরেননি। বাবা যথারীতি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজের অপেক্ষায় বারান্দায় পায়চারি করছেন।

এই সময় পাড়ার দুটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে পাগলের মত দুম্ দুম্ করে ধাক্কা দিতে লাগল সন্তুদের বাড়ির দরজায়।

বাবা বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার? এই যে, তোমরা ওরকম করছ কেন!'

ছেলে দুটি বলল, 'শিগ্‌গির আসুন! পার্কে কে যেন কাকাবাবুকে গুলি করেছে!'

।। তিন।।

বাবা ওপরের বারান্দা থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, 'অ্যাঁ? কি বললে? কী সর্বনাশ! সন্তু কোথায়?'

সন্তু ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে তীরের মতন ছুটতে আরম্ভ করেছে। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা, তারপর ডান দিক বেঁকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই পার্কটায় পৌঁছান যায়। সন্তু পৌঁছে গেল দেড় মিনিটে।

পার্কটা খুব বড় নয়, কিন্তু তার একপাশে একটা কবরখানা। আর একদিকে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, একটা বারোতলা বাড়ির লোহার কঙ্কাল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে রাশি রাশি ইট।

সেই ইটের স্তূপের কাছে এক দঙ্গল মানুষের ভিড় দেখেই বোঝা গেল যে ঘটনাটা সেইখানেই ঘটেছে। সেখানে শোনা যাচ্ছে একটা কুকুরের অবিশ্রান্ত ডাক।

সন্তু ভিড়ের মধ্যে গোঁত্তা মেরে ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখল ইটের পাঁজার কাছে কাকাবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। গুলি লেগেছে কাঁধের বাঁ দিকে, পাতলা জামাটার পাশাপাশি দুটো কালো গোল দাগ তার চারপাশে রক্ত।

কাকাবাবু সন্তুর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসেন রোজ। সেই কুকুর কাকাবাবুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ডেকে চলেছে, সন্তুকে দেখতে পেয়েই সে পাগলের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সন্তু কাকাবাবুর গায়ে হাত দিল না, কান্নাকাটিও শুরু করল না। তাকে এখন এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলে চলবে না।

সে কুকুরের গলায় চাপড় মেরে বলল, 'তুই এখানে থাক। দেখিস, কেউ যেন কাকাবাবুর গায়ে হাত না ছোঁয়ায়।'

কুকুর সন্তুর সব কথা বোঝে। সে আবার গিয়ে দাঁড়াল কাকাবাবুর কাছে। সন্তু আবার ভিড় ভেদ করে বেরিয়ে ছুটল।

ডঃ সুবীর রায় তখন চেম্বারে বেরুবার জন্য সবে মাত্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছেন, সন্তু ঝড়ের মতন ঢুকে এল তাঁর ঘরে। এক হাতে তাঁর যন্ত্রপাতির বাক্সটা টপ করে তুলে নিয়ে অন্য হাতে ডঃ সুবীর রায়কে ধরে টানতে টানতে বলল, 'শিগ্‌গির চলুন। ডাক্তার মামা, এক্ষুনি।'

ডঃ সুবীর রায় অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'কিছু বলবার সময় নেই। কাকাবাবু—'

'কাকাবাবু?' কোথায় ... দাঁড়া জুতোটা পরে নিই।'

'না, জুতো পরতে হবে না।'

খালি পায়েই ডঃ সুবীর রায় ছুটতে লাগলেন সন্তুর সঙ্গে। তাঁর বাড়িও পার্কের কাছেই।

ততক্ষণে সন্তুর বাবা আর মা পৌঁছে গেছেন। আর এসেছে একজন পুলিশ কনস্টেবল।

ডঃ সুবীর রায় হাঁটু গেড়ে বসলেন কাকাবাবুর দেহের পাশে। আস্তে আস্তে উল্টে দিলেন, কাকাবাবুকে। কাকাবাবুর মুখে একটা দারুণ অবাক হবার ভাব।

যে সমস্ত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা অনেকেই কাকাবাবুকে চেনে। অনেকেই এখানে সকালে বেড়াতে আসে। সবাই নানান কথা বলাবলি করছে। কিন্তু আগেই যে একজন ডাক্তারকে খবর দেওয়া উচিত সে কথা কারুর মনে পড়েনি।

দু'তিনজন নাকি স্বচক্ষে দেখেছে কাকাবাবুকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে। গুলির আওয়াজ হয়েছিল তিনবার অর্থাৎ একটা গুলি ফসকে গেছে। কিন্তু কে গুলি করেছে, তা বোঝা যায়নি। কাছাকাছি তো কেউ ছিল না, কিংবা কারুকে পালাতেও দেখা যায়নি।

একজন বলল, 'নিশ্চয়ই কেউ কবরখানায় লুকিয়ে থেকে গুলি করেছে।'

সন্তু বুঝতে পারল না, কাকাবাবু পার্কে বেড়াতে এসে এই ইঁটের পাঁজার কাছে কেন এসেছিলেন? এখানে বালি আর খোয়া ছড়ান, এই জায়গাটা তো হাঁটার পক্ষেও ভাল নয়।

ডঃ সুবীর রায়-এর মধ্যে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে বললেন, 'সন্তু এক্ষুনি ওঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করাতে হবে। এখনো

বেঁচে আছেন...আমার ড্রাইভার বোধহয় এতক্ষণে এসে গেছে... তুই গিয়ে ডেকে আন বরং।

সন্তু বলল, 'ওই যে দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। যদি ট্যাক্সি করে নিয়ে যাই'

বাবা বললেন, 'সেই ভাল, সময় বাঁচবে!'

সবাই মিলে ধরাধরি করে কাকাবাবুকে তোলা হল ট্যাক্সিতে। কুকুরটা কি যেন বুঝে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে, সেও সঙ্গে যেতে চায়।

কুকুরকে জোর করে মায়ের সঙ্গে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

নার্সিংহোমে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে অপারেশনের পর জানা গেল একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

ডঃ সুবীর রায় ছাড়া আরও দু'জন বড় ডাক্তারও ছিলেন অপারেশনের সময়। তাঁরা কেউ কখনও এরকম কাণ্ড দেখেননি।

কাকাবাবুর শরীরে যে গুলি দুটো ঢুকেছে, সেগুলি মানুষ মারবার জন্য নয়। বাঘ-সিংহের মতন বিশাল শক্তিশালী প্রাণীদের এইরকম গুলি মেরে ঘুম পাড়ান হয়।

তিনজন ডাক্তারই দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এর জন্য তো সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিডোজ দেবার কথা, নইলে বাঁচান যায় না। অথচ অনেক সময় কেটে গেছে।

যদিও ভরসার কথা এই যে কাকাবাবুর এখনও নিঃশ্বাস পড়ছে।

সুন্দরবনে দু'একটা বাঘকে গুলি করে ঘুম পাড়াবার কথা অনেকেই শুনেছে, কিন্তু কলকাতা শহরে সকালবেলা পার্কে কোনও মানুষকে এরকমভাবে গুলি করবে কে? কেন?

ডঃ তিমির বরাট একবার সুন্দরবনের একটা বাঘকে এই রকম গুলি মেরে অজ্ঞান করার সময় সেখানে ছিলেন। তাঁর পরামর্শ জানবার জন্য তাঁকে ফোন করা হল পি জি হাসপাতালে।

ডঃ তিমির বরাট তো ঘটনাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান না। তারপর বলতে লাগলেন, 'পেশেন্ট এখনও বেঁচে আছে? কি বলছেন আপনারা? এ যে অসম্ভব! ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি আসছি। আপনারা ততক্ষণে চিফ্ কন্জারভেরটার অব ফরেস্ট মিঃ সুকুমার দত্তগুপ্তকেও একটা খবর দিন। তাঁর এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে।'

সুকুমার দত্তগুপ্তও টেলিফোনে ওই একই কথা বলতে লাগলেন। ঘুমের গুলি? আপনাদের ভুল হয়নি তো? সেই গুলি শরীরে গেলে তো কোনও মানুষের পক্ষে এতক্ষণ বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব! মিঃ রায়চৌধুরীকে আমি চিনি, ওঁকে এইরকমভাবে...'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলেন ওঁরা দু'জনে। আর বারবার বলতে লাগলেন, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!

সুকুমার দত্তগুপ্ত বললেন, 'এই রকম গুলি বিদেশ থেকে আসে, এ তো কোনও সাধারণ লোকের পাবার কথা নয়।'

ডঃ সুবীর রায় বললেন, 'যারা পার্কের মধ্যে সকালবেলা কারুকে গুলি করে, তারা কী সাধারণ লোক?'

সমস্ত ডাক্তারকে অবাক করে কাকাবাবু এর পরেও তিন দিন বেঁচে রইলেন অজ্ঞান অবস্থায়।

চতুর্থ দিনে তিনি চোখ মেলে চাইলেন।

তবু আরও দু'দিন তাঁর ঘুম-ঘুম ভাব রইল, ভাল করে কথা বলতে পারেন না, কথা বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যায়।

আস্তে আস্তে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তাঁর হাত দুটো অবশ হয়ে রইল। হাতে কোনও জোর পান না। কোনও জিনিস শক্ত করে ধরতে পারেন না।

অনেক ওষুধপত্র দিয়েও তাঁর হাত দুটো ঠিক করা গেল না। ডাক্তাররা বললেন, 'আর কিছু করবার নেই। এখন ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যদি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।'

এতদিন পর সন্তু রাত্রিবেলা তার ছাদের ঘরে শুয়ে-শুয়ে খুব কাঁদল।

কাকাবাবুর হাত দুটো নষ্ট হয়ে যাওয়া তো তাঁর মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

কাকাবাবুর একটা পা খোঁড়া, শুধু মনের জোরে আর ওই লোহার মতন শক্ত হাত দু'খানার জোরে তিনি কত পাহাড়-পর্বতে পর্যন্ত উঠেছেন। কিন্তু এখন? আর তিনি কোনও অভিযানে যেতে পারবেন না। তিনি এখন অথর্ব।

এর মধ্যে কলকাতার পুলিশের বড় বড় কর্তারা আর দিল্লী থেকে সি.বি.আই-এর লোকেরাও কাকাবাবুর কাছে এসে অনেক খোঁজখবর নিয়ে গেছেন।

কাকাবাবু সবাইকে বলেছেন যে, কে তাঁকে ওই রকম অদ্ভুত গুলি দিয়ে মারার চেষ্টা করতে পারে, সে সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। আততায়ী একজন না কয়েকজন তাও তিনি জানেন না, কারণ কারুকেই তিনি দেখতে পাননি। তাঁকে গুলি করা হয়েছে পেছন দিক থেকে।

সকলেরই অবশ্য ধারণা হল যে, ঘুমের গুলি মারার কারণ একটাই হতে পারে। কাকাবাবুকে কেউ বা কারা অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই।

তবে তারা নিয়ে গেল না কেন? সকালবেলা পার্কে কিছু নিরীহ লোক

ঘুরে বেড়ায়। তাদের চোখের সামনে দিয়েই যদি তারা কাকাবাবুকে তুলে নিয়ে যেত, কেউ বাধা দিতে সাহস করত না।

মিঃ ভার্গব নামে সি. বি. আই-এর একজন অফিসার কাকাবাবুর কাছে রোজই যাতায়াত করছিলেন। তিনিই বললেন যে স্বাস্থ্য সারাবার জন্য কাকাবাবুর কোন ভাল জায়গায় গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার।

সন্তুর বাবা এবং মা দু'জনেই এতে খুব রাজি।

ঠিক হল যে সবাই মিলে যাওয়া হবে পুরীতে? সন্তুর মামাদের একটা বাড়ি আছে সেখানে! সুতরাং কোন অসুবিধে নেই। বাবা ছুটি নিয়ে নিলেন অফিস থেকে। ছোড়দিরও খুব যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ছোড়দিকে ফিরে যেতে হল ভূপালে।

শনিবার দিন রাত ন'টায় ট্রেন। একটু আগেই বেরুন হল বাড়ি থেকে।

ট্যাক্সিটা যখন রেড রোড ছাড়িয়ে রেডিও স্টেশনের পাশ দিয়ে বেঁকেছে, সেই সময় একটা সাদা রঙের জিপ গাড়ি তীব্র বেগে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একজন লোক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হুকুম দিল, 'গাড়িটা বাঁয়ে দাঁড় করাও।'

সেই জিপ থেকে নামলেন মিঃ ভার্গব।

তিনি বললেন, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের প্ল্যানটা একটু বদল করতে হবে। আপনার পুরী যাওয়া হবে না।'

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে শুধু চেয়ে রইলেন মিঃ ভার্গবের দিকে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কি ব্যাপার!'

মিঃ ভার্গব বললেন, 'আমরা খবর পেয়েছি, পুরীতে কয়েকজন সন্দেহজনক লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে মিঃ রায়চৌধুরীর এই ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা ঠিক বলা না গেলেও তারা ঠিক এইসময় পুরীতে গেল কেন, তা আমাদের জানতে হবে। যদি ওরা মিঃ রায়চৌধুরীর কোনও ক্ষতি করে... সেইজন্য আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে পারি না।

বাবা বললেন, তাহলে কি আমরা ফিরে যাব।'

মিঃ ভার্গব বললেন, মিঃ রায়চৌধুরীর জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করেছি! আপনারা ইচ্ছে করলে পুরী যেতে পারেন।'

সন্তু বলল, 'আমি কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গেই যাব!'

মিঃ ভার্গব হেসে বললেন, তা জানি! সেরকম ব্যবস্থা হয়েছে। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আর একজন যাবেন এঁর নাম প্রকাশ সরকার, ইনি

একজন তরুণ ডাক্তার। সদ্য পাশ করেছেন...

একটুক্ষণ কথা বলেই কাকাবাবুকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে তোলা হল জিপটায়। সন্তু ভাগ্যিস আলাদা একটা ছোট সুটকেসে নিজের জামাপ্যান্ট গুছিয়ে নিয়েছিল, তাই কোনও অসুবিধে হল না।

জিপটা ছুটল অন্যদিকে। সোজা একেবারে এয়ারপোর্ট।

সেখানে আর্মির একটা স্পেশাল প্লেনে উঠল ওরা। তখনও কোথায় যাচ্ছে সন্তু জানে না। নামবার পর দেখল যে, জায়গাটা গৌহাটি।

প্রকাশ সরকার আর সন্তু দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে নামাল কাকাবাবুকে। এবার উঠতে হবে আর একটা জিপে।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতন হয়ে গেছি, না রে? হাঁটতে পারি না, একটা চায়ের কাপ পর্যন্ত ধরতে পারি না! আমায় নিয়ে কি করবি তোরা?'

।। চার ।।

প্লেনের সিঁড়ি থেকে কাকাবাবুকে ধরাধরি করে নামিয়ে আনা হ'ল!

কাছেই টারম্যাকের ওপর অপেক্ষা করছে বেশ বড় একটা জিপ। তার পেছন দিকে দুই সিটের মাঝখানে বিছানা পাতা। প্রকাশ সরকার আর সন্তু দু'জনে মিলে কাকাবাবুকে সেখানে শুইয়ে দিল খুব সাবধানে। সন্তু সেইখানেই বসল। আর প্রকাশ সরকার গিয়ে বসল সামনের দিকে। সেখানে ড্রাইভারের পাশে আর একজন লোক বসেছিল।

সেই লোকটি প্রকাশ সরকারকে নিচু গলায় কিছু বলবার পরই চলতে শুরু করল গাড়ি।

সন্তু এর আগে কখনও আসামে আসেনি। কিন্তু আসামের পাহাড় আর জঙ্গল সম্পর্কে অনেক গল্পের বই পড়েছে। হাতি, বাঘ কি নেই আসামে। সেইজন্য আসামের নাম শুনলেই তার রোমাঞ্চ হয়।

সে কৌতুহলী হয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে! কিন্তু চারপাশে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

সন্তু ভেবেছিল, এয়ারপোর্টে যখন নেমেছে, তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি শহর থাকবে। আলো দেখা যাবে।

কিন্তু গাড়িটা শহরের দিকে গেল না। মাঝে-মাঝে দুটো একটা আলো দেখা গেলেও বোঝা যায়, গাড়িটা চলে যাচ্ছে লোকালয়ের বাইরে। একটা ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িটা ছুটল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

ঘন্টাখানেক পরে সন্তু অবাক হয়ে দেখল, তাদের গাড়ি আবার একটা এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে ট্যারম্যাকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

কাকাবাবু ঘুমোননি, চুপচাপ শুয়েছিলেন।

এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবার কোথায় এলুম, বল্‌ তো সন্তু?'

সন্তু বলল, 'আর একটা এয়ারপোর্ট...নামটা পড়তে পারিনি!'

কাকাবাবু বললেন, 'বুঝতে পারলি না? আবার সেই আগের এয়ারপোর্টে ফিরে এলুম! ওই যে পাশাপাশি দুটো আলো, তার মধ্যে একটা দপ্‌দপ্‌ করছে!'

সন্তু দেখল, তাই তো! ঠিকই। অসুস্থ, শোয়া অবস্থাতেও কাকাবাবু এটা লক্ষ্য করেছেন ঠিক।

প্রকাশ সরকার এদিকে এসে বিনীতভাবে বলল, 'স্যার আপনাকে আবার একটু কষ্ট করে নামতে হবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'ব্যাপার কি? এত সাবধানতা কিসের? আমি তো একেবারে অথর্ব হয়ে গেছি, হাঁটতে পারি না, কোনও কিছু ধরতে পারি না, আমায় নিয়ে আর কার মাথা ব্যথা থাকবে?'

প্রকাশ সরকার বলল, 'আমাদের দেশের পক্ষে আপনার জীবন খুবই মূল্যবান। আপনার যদি কোনও বিপদ হয় সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার সন্তু?'

সন্তুও তো কিছুই বুঝতে পারছে না। অন্য-অন্য বার কাকাবাবু নিজেই প্রথম দিকে সন্তুর কাছে অনেক কথা গোপন করে যান। এবার কাকাবাবু নিজেই জানেন না কি হচ্ছে! একই এয়ারপোর্টে দুবার তাঁকে কেন আনা হল? কারুর চোখে ধুলো দেবার জন্যে? কিন্তু তারা যে প্লেনে আসামে চলে আসবে, সে-কথা তো সন্ধ্যের আগে কেউ জানতই না।

কাকাবাবুকে আবার নামান হল জিপ থেকে।

সেই সেনাবাহিনীর বিমানটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। সেটাতেই আবার উঠতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, 'দাঁড়াও, একটু টাটকা হাওয়া খেয়ে নিই। আসামের হাওয়া খুবই ভাল।'

সত্যি সত্যি তিনি মুখটা হাঁ করে হাওয়া খেতে লাগলেন।

একদিকে প্রকাশ সরকার, আর একদিকে সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। সন্তু একটু লম্বায় ছোট বলে কাকাবাবুকে একদিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে।

সেই অবস্থায় প্রায় প্রকাশ সরকারকে শুনিয়ে শুনিয়েই কাকাবাবু সন্তুকে

ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'মনে কর, এরাই যদি গুণ্ডা হয়, এরাই হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের কোথাও গুম্ করতে নিয়ে যাচ্ছে, তা হলে কি করবি?'

সন্তু আড়চোখে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকাল।

প্রকাশ সরকার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলল, 'এ কি বলছেন স্যার? এরা সব আর্মির লোক. এটা আর্মির জিপ, ওইটা আর্মির জেট। দিল্লী থেকে স্পেশাল অর্ডার এসেছে বলেই আপনাকে।'

কাকাবাবু বললেন, হুঁ! কিছুই বলা যায় না!'

প্রকাশ সরকার এবার রীতিমত আহত হয়ে বলল, 'স্যার, আপনার এখনও অবিশ্বাস হচ্ছে? মিঃ ভার্মার চিঠি আছে আমার কাছে। যদি দেখতে চান?'

'যাব! চল!'

আবার ওঠা হল সেই ছোট বিমানের মধ্যে। কাকাবাবুকে তাঁর সিটে বসবার পর তিনি চোখ বুজে রইলেন।

প্রকাশ সরকার সন্তুর পাশে বসে পড়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার ভাল আলাপ হয়নি। কিন্তু আমি তোমাদের সব কটা অ্যাডভেঞ্চারের কথা পড়েছি। সেই আন্দামানে.... কিংবা নেপালে, এভারেস্টের কাছে আর একবার, সেই কাশ্মীরে ... তুমি তো দারুণ সাহসী ছেলে!'

এইরকম কথা শুনলে সন্তু লাজুক লাজুক মুখ করে থাকে। কি যে উত্তর দেবে বুঝতে পারে না।

প্রকাশ আবার বলল, 'আর তোমার কাকাবাবু উনি তো জিনিয়াস! একটা পা নেই বলতে গেলে ... তবু শুধু মনের জোরে উনি কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। উনি কোন বিপদকে গ্রাহ্য করেন না!'

সন্তু এবার বলল, কিন্তু কাকাবাবুর এখন হাতেও জোর নেই।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে। আমি ডাক্তার, আমি সঙ্গে রয়েছি, কোনও চিন্তা নেই। আমার ওপর নির্দেশ আছে, উনি যখন যা চাইবেন তক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অন্তত একমাস যদি বিশ্রাম নিতে পারেন...?

'এক মাস?'

'তা তো লাগবেই। আর বেশি হলে ভাল হয়। কেন, তুমি সঙ্গে থাকতে পারবে না?'

'আমার যে কলেজ খুলে যাবে।'

'তুমি কলেজে পড় বুঝি?'

সন্তুর আবার লজ্জা পেয়ে গেল। সে এখনও ঠিক কলেজের ছাত্র হয়নি।

তবু 'কলেজে' কথাটা উচ্চারণ করতে তার বেশ লাগে।

এইসময় কাকাবাবু চোখ খুলে বললেন, 'এই যে বৈজনাথ শোন!'

প্রকাশ একবার এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আসছি, স্যার! ইয়ে মানে স্যার, আমার নাম তো বৈজনাথ নয়, এখানে বৈজনাথ বলে কেউ নেই। আমার নাম প্রকাশ, প্রকাশ সরকার।'

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তুমি বৈজনাথ নও! ঠিক বলছ? ভারি আশ্চর্য তো!'

'বৈজনাথ কে স্যার? সন্তু তুমি ওই নামে কারুকে চেন?'

সন্তু দুদিকে ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু আবার বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার কি নাম বললে যেন প্রকাশ? শোন প্রকাশ, আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি একটু ডাবের জল খাব।'

'ডাবের জল? এখানে কি ডাবের জল পাওয়া যাবে? কোল ড্রিংক্স আছে বোধহয়।'

'আমি ডাবের জল ছাড়া আর অন্য কিছু খাই না।'

'কিন্তু স্যার, রাত্তির বেলা ডাবের জল খাওয়াটা বোধহয় ঠিক নয়।'

'কেন, কি হয়?'

'কেউ খায় না। খেলে গলা ভেঙে যায়।'

'তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কথা লেখা আছে? যাইহোক, আমি রাত্তিরেও ডাবের জল খাই, আমার গলা ভাঙে না।'

'প্লেনের মধ্যে তো ডাবের জল দেবার উপায় নেই।'

'তা হলে সামনের স্টেশনে থামাও! সেখান থেকে ডাবের জল জোগাড় কর। এই যে বললে, 'আমি যখন যা চাইব, তুমি তা-ই দেবার ব্যবস্থা করবে।'

প্রকাশ অসহায়ভাবে সন্তুর দিকে তাকাল।

সন্তুও প্রায় নির্বাক হয়ে গেছে। কাকাবাবু ও কি রকম ব্যবহার করছেন। কাকাবাবু কোনদিন কারুর নাম ভুলে যান না। অথচ প্রকাশকে ডাকলেন বৈজনাথ বলে। ডাবের জল খাওয়ার জন্য আবদার, এ তো কাকাবাবুর চরিত্রের সঙ্গে একদম মানায় না। তারপর উনি বললেন, 'সামনের স্টেশন'! উনি কি প্লেনটাকে ট্রেন ভেবেছেন নাকি?

প্রকাশ বলল, 'স্যার, আমরা আর আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। সেখানে খুব চেষ্টা করব যদি ডাবের জল পাওয়া যায়। তার আগে কি একটা কোল্ড ড্রিংস্ কিংবা এমনি জল খাবেন?'

'না।'

কাকাবাবু আবার চোখ বুজলেন।

একটু পরে সন্তু ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

প্রকাশ বলল, 'একটু বাদেই তো নামব। তখন দেখতে পাবে।'

চোখ না খুলেই কাকাবাবু বলেন, 'আগরতলা, তাই না? একে বলে ঘুরিয়ে নাক দেখানো!'

প্রকাশ দারুণ চমকে উঠল! কোথায় যাওয়া হবে, তা একজন আর্মি অফিসার শুধু তার কানে কানে বলেছে। কাকাবাবুর তো কোনক্রমেই জানবার কথা নয়। উনি কি হিপ্‌নোটিজম জানেন নাকি। তাও তো চোখ বুজে আছেন।

'আসাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে শুনে সন্তু একটু নিরাশই হল। সে আরও ভাবতে লাগল, কাকাবাবু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর কথা বললেন কেন? কে কাকে ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছে?'

প্লেনের আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, তখন সেটা নামবার জন্য তৈরী হচ্ছে। একটু পরেই প্লেনটি একটি ঝাঁকুনি খেয়ে মাটি ছুঁল।

নামবার সময় এবারে আর কাকাবাবু কোনও কথা বললেন না। প্রকাশ খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে ফিরে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'স্যার, এত রাত্রে তো এখানে ডাব কোথাও নেই, কিছুতেই পেলুম না!'

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে।'

এবারে জিপ নয় একটা সাদা রঙের গাড়ি। প্রত্যেকবারই কাকাবাবুকে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে বসাতে হচ্ছে। অথচ, কাকাবাবু কখনও পরের সাহায্য নেওয়া পছন্দ করেন না। খোঁড়া পায়েই ক্রাচ্ বগলে নিয়ে উনি একা পাহাড়ে পর্যন্ত উঠতে পারেন। কিন্তু এখন হাতেও জোর নেই, ক্রাচও ধরতে পারছেন না।

গাড়ি এসে থামল আগরতলার সার্কিট হাউসে।

খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘর কাকাবাবুর জন্য, অন্য ঘরটিতে প্রকাশ আর সন্তু থাকবে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও তৈরিই ছিল। প্রকাশ বলল, 'আজ অনেক ধকল গেছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া যাক।'

কাকাবাবু এখন নিজে খেতেও পারেন না, তাঁকে খাইয়ে দিতে হয়। চামচে করে যে খাবার তুলবেন, হাতে সেই জোরটুকুও নেই। এই ক'দিন বাড়িতে ছোড়দিই খাইয়ে দিয়েছে কাকাবাবুকে। আজ সন্তু বসল কাকাবাবুকে খাওয়াতে।

কিন্তু তার তো অভ্যেস নেই, সে ঠিকঠাক পারবে কেন? ভাত কাকাবাবুকে মুখে তুলে দিতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

প্রকাশ বলল, 'তুমি সর, সন্তু, আমি দিচ্ছি। আমরা তো নার্সিং করতে জানি।'

কাকাবাবু দু'তিনবার ঠিকঠাক খেলেন। তারপর একবার কট্ করে চামচেটাতেই কামড়ে ধরে এক ঝট্কায় ছাড়িয়ে নিলেন প্রকাশের হাত থেকে। তারপর সেই চামচটাকে চিবুতে লাগলেন কচর-মচর করে।

প্রকাশ আঁতকে উঠে বলল, 'স্যার স্যার, ও কি করছেন? ও কি?'

কাকাবাবু কট্মট্ করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমায় স্যার স্যার বলছ কেন! আমার নাম রামনরেশ যাদব। আমি বিহারের একজন গোয়ালা। আমার একশ সাতান্নটা গোরু আছে। তুমি কি তারই একটা গোরু।'

সন্তুর বুকের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগল।

।। পাঁচ।।

প্রকাশ সরকার কাকাবাবুকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর সন্তুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে নিজেদের ঘরে এসে বসল।

সন্তুর মুখখানা শুকিয়ে গেছে একেবারে। সে যেন বুঝতে পারছে কাকাবাবুর একটা ভীষণ বিপদ আসছে। এই অবস্থায় বাড়ি থেকে এতদূরে থাকা কি ঠিক?

প্রকাশ জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার হল বল তো, সন্তু! উনি একবার বৈজনাথ বলে ডাকলেন আমাকে। তারপর নিজের নাম বললেন রামনরেশ যাদব। এরা কারা?'

সন্তু বলল, 'কোনদিন আমি এই সব নাম শুনিনি!'

'তুমি তো ওঁর সঙ্গে সবকটা অভিযানেই গেছ, তাই না? সুতরাং যে-সব ব্যাড ক্যারেকটারদের উনি দেখেছেন, তুমিও তাদের দেখেছ?'

'তার কোনও মানে নেই। আমি তো মোটে চার-পাঁচ বার গেছি কাকাবাবুর সঙ্গে। তার আগে কাকাবাবু আরও কত জায়গায় গেছেন। পাটা ভেঙে যাবার আগে তো উনি আমাকে সঙ্গে নিতেন না।'

আগেকার কথা বাদ দাও। গত পাঁচ-ছ বছর ধরে তো তুমি ওঁর সঙ্গেই থেকেছ—'

একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, 'না, তাও ঠিক বলা যায় না। গত বছর আমার যখন পরীক্ষা ছিল, সেই সময় কাকাবাবু একাই যেন কোথায় গিয়েছিলেন—'

'কোথায়?'

'তা আমি ঠিক জানি না। তবে মনে হয় যেন আসামের দিকেই।'

'কেন তোমার আসামের কথা মনে হল? উনি কি তোমায় কিছু বলেছিলেন?'

'না। তা বলেননি। তবে, উনি মা'র জন্য একটা বেশ সুন্দর নানা রঙের কম্বলের মতন জিনিস এনেছিলেন, তার নাম খেস্। মা বলেছিলেন, ওই জিনিস আসামেই ভাল পাওয়া যায়।'

'কিন্তু আসামে এসে বৈজনাথ কিংবা রামনরেশ যাদব টাইপের নামের ক্যারেকটারদের উনি মিট করবেন, এটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। বিহার, উত্তরপ্রদেশেই এ ধরনের নামের লোক থাকে।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু—'

'আমায় ডাক্তারবাবু বলার দরকার নেই। আমায় তুমি প্রকাশদা বলতে পার।'

'আপনার কি মনে হয়, কাকাবাবুর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?'

'কিছু একটা গণ্ডগোল যে হয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। উনি নিজেকেও অন্য মানুষ ভাবছেন। অবশ্য এটা খুব টেমপোরারিও হতে পারে। দেখা যাক্ কাল সকালে কেমন থাকেন!'

'আপনি সত্যি করে বলুন, কাকাবাবু আবার ভাল হয়ে যাবেন তো?'

নিশ্চয়ই! যে কোনও ভাবেই হোক ওঁকে ভাল করে তুলতেই হবে। ওঁর মাথাটাই তো একটা অ্যাসেট! তা হলে শুয়ে পড়া যাক!'

পাশাপাশি দুটো খাটে ওদের বিছানা। মাঝখানে একটা টেবিল ল্যাম্প। প্রকাশ সরকার সেই আলো নিভিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু সন্তুর ঘুম আসছে না। সে আকাশ-পাতাল ভাবছে শুধু। কাকাবাবুর কথা মনে করলেই তার কান্না এসে যাচ্ছে। কাকাবাবু যদি পাগল হয়ে যান? না, না, তা হতেই পারে না! কাকাবাবুর মতন সাহসী মানুষ এরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাবেন?

যদি সত্যি-সত্যি কাকাবাবুর কিছু হয়, তা হলে সন্তু ছাড়বে না। যারা কাকাবাবুকে ঘুমের গুলি দিয়ে মেরেছে, তাদের সন্তু দেখে নেবে, যদি

পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও লুকোয়, তাহলেও সন্তু প্রতিশোধ নেবেই।

কিন্তু তারা কারা?

কাপুরুষের মতন তার কাকাবাবুকে পেছন থেকে গুলি করে পালিয়েছে। কাকাবাবুকে তারা পুরোপুরি মেরে ফেলতে চায়নি, শুধু তাঁর মাথাটাকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। এটা তো মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

এই সব ভাবতে ভাবতে কত রাত হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। একটু বোধহয় তন্দ্রার মতন এসেছিল, হঠাৎ একটা আওয়াজে চমকে উঠল সন্তু।

একটা গাড়ী ঢুকছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। ইঞ্জিনের শব্দ খুব জোর। কয়েকজন লোকের কথাও শোনা গেল এর পরে।

সন্তু তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানালার পাশে।

সার্কিট হাউসের বারান্দার আলো সারা রাত জ্বালাই থাকে। সেই আলোয় দেখা গেল, একটা জোঙ্গা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে, তার থেকে দু'-তিনজন লোক নেমে কথা বলছে নাইট গার্ডের সঙ্গে।

তাদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এল এদিকে। ঠিক যেন সন্তুর সঙ্গে কথা বলতেই আসছে। সোজা এসে তারপর লোকটি কিন্তু চলে গেল পাশের ঘরের দিকে।

সন্তুর তক্ষুনি মনে পড়ল কাকাবাবুর ঘরের দরজা খোলা আছে। কারণ কাকাবাবু তো নিজে দরজা বন্ধ করতে পারবেন না, দরজাটা ভেজিয়ে রাখা হয়েছিল। ওই লোকটা কাকাবাবুর ঘরের দিকেই গেল।

প্রকাশ সরকারকে ডাকবারও সময় পেল না সন্তু। সে অন্ধকারেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই। লোকটা নেই। কাকাবাবুর ঘরের একটা পাল্লা খোলা।

সন্তু সেই দরজার কাছে আসতেই তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল সন্তু। তার ধারণা হল, এইবার কেউ তাকে গুলি করবে।

কিন্তু সেরকম গুলি ছুটে এল না।

তার বদলে একজন কেউ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

মানুষের গলার আওয়াজ শুনে অনেকটা ভয় কেটে যায়। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি কে? আমাদের ঘরে ঢুকেছেন কেন?'

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ফেলল খাটের ওপর কাকাবাবুর মুখের ওপর।

ততক্ষণে সন্তু দরজার পাশের সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ফেলেছে।

কালো রঙের প্যান্ট ও কালো ফুল শার্ট পরা একজন ঢ্যাঙা লোক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা বড় টর্চ। সন্তু আগে কোনও লোককে ওরকম টর্চ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেনি।

লোকটা বলল, 'এই চার নম্বর ঘর আমাদের নামে বুক করা ছিল। নাইট গার্ড বলল, 'আমাদের রিজার্ভেশান ক্যানসেলড্ হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস হয়নি। এখন দেখছি, সত্যি এখানে একজন লোক শুয়ে আছে।'

প্রকাশ সরকারও এর মধ্যে উঠে এসেছে।

সে বলল, 'আপনি কে? কিছু জিজ্ঞেস না করে হুট করে এ-ঘরে ঢুকে এসেছেন কেন?'

লোকটি বলল, 'কেন, তাতে কি হয়েছে? এ ঘর আমাদের নামে বুকিং...'

প্রকাশ বলল, 'তা হতেই পারে না। একই ঘর কখনও দু'জনের নামে বুক হয়? আপনার বুকিং আছে কি না তা আপনি অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন।'

লোকটি বলল, 'আপনারা যখন শুয়ে পড়েছেন, তখন আপনাদের এখন এখান থেকে তুলে দেব না নিশ্চয়ই। দেখি অন্য কি ব্যবস্থা করা যায়।'

সন্তু আর প্রকাশকে পাশ কাটিয়ে লোকটি চলে গেল বাইরে।

প্রকাশ কাকাবাবুর কাছে এসে একটা চোখের পাতায় সামান্য আঙুল ছুঁয়ে বলল, 'উনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, কিছুই টের পাননি। তা হলেও...এত রাত্রে একটা লোক হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে...'

সন্তু বলল, 'ওরা দেখে গেল।

প্রকাশ বলল, 'মানে?'

সন্তু বলল, 'যাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য প্রথমে গৌহাটি যাওয়া হল, তারপর আগরতলায়—সেই তারাই এসে দেখে গেল কাকাবাবু এখানে এসেছে কি না!'

প্রকাশ হেসে বলল, 'আরে না, না। ও লোকটা একটা উট্‌কো লোক। ওদের বুকিংয়ে বোধহয় কিছু গোলমাল হয়েছে। তাছাড়া, আমরা তো ঠিক কারোর চোখে ধুলো দিতে চাইনি, এমনিই সাবধানতার জন্য...

'কিন্তু যে লোকটা ঘরে ঢুকেছিল, সেই লোকটা মোটেই ভাল না।'

'তুমি কি করে বুঝলে?'

'ও কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরেছিল। আমি কালো রঙের জামা পরা লোক আগে দেখিনি।'

'ওঃ হো! এই জন্য। ঠিক কালো নয় তো, খুব গাঢ় খয়েরী? এক রঙের প্যান্ট-শার্ট পরা আজকাল ফ্যাশান হয়েছে।'

'ওই রকম চৌকো টর্চ ..'

'গোল আর লম্বা টর্চ হাতে থাকলেই লোকটা ভালো হয়ে যেত?'

'লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে।

'তোমার দেখছি বড্ড বেশি সন্দেহ। শোন, আমরা যে আজ আগরতলা এসেছি, তা বাইরের কারুর পক্ষে জানা অসম্ভব।'

'কেন, আমরা কি এখনো মিথ্যে নাম লিখিয়েছি? সার্কিট হাউসের লোকেরা তো জানে। যাই বলুন, ওই লোকটার মুখ দেখে মনে হল, ও কাকাবাবুকে চিনতে পেরেছে।'

'যাঃ কি যে বল! কাল সকালেই আমি খবর নেব ওরা কারা। এখন চল, শুয়ে পড়া যাক।'

'আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এ-ঘরেই শোব। প্রথম থেকেই আমার তাই করা উচিত ছিল। আপনি বললেন বলে পাশের ঘরে চলে গেলাম।'

'বেশ তো, থাক না।'

সন্তু চট করে পাশের ঘর থেকে জামা কাপড় নিয়ে এল। এ ঘরেও দুটো খাট। কাকাবাবুর পাশের খাটে কিছু জিনিসপত্র রাখা ছিল। সেগুলো নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল সন্তু।

এবারেও তার ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। তার বারবার মনে হচ্ছে, ওই লম্বা লোকটা জোরাল টর্চ নিয়ে কাকাবাবুকে দেখতেই এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্তু এসে পড়ায় কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

সার্কিট হাউসে জায়গা না পেয়ে ওদের জোঙ্গা জিপটা একটু আগেই চলে গেছে। তা যাক। ওরা যদি শত্রুপক্ষের লোক হয়, তা হলে একজনের চেহারা তো সন্তুর জানা রইল। কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি হলে ওই লোকটাকে সন্তু ঠিক খুঁজে বার করবেই।

পরদিন সন্তুর ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

সন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, উঠে দরজা খুলে দিল। একজন বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে।

কাকাবাবু কোনও উত্তর না দিয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টি।

সন্তু কাকাবাবুর মাথার পেছনে হাত দিয়ে তাঁকে আস্তে-আস্তে বসিয়ে দিল। তারপর কাপে চা ঢেলে নিয়ে এল কাকাবাবুর মুখের সামনে।

কাকাবাবু একটা চুমুক দিলেন।

তারপর খস্‌খসে গলায় বললেন, 'এটা চা নয়। ষাঁড়ের রক্ত। এ জিনিস বাঘে খায়। মানুষে খায় না।'

সন্তু বলল, 'চা-টা ভাল হয়নি বুঝি। আচ্ছা, আমি আবার অন্য চা দিতে বলছি।'

তখন ফিরে সন্তু সেই চায়ের কাপে নিজে একটা চুমুক দিয়ে দেখল। তার তো কিছু খারাপ লাগল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, 'আজ কি ফেব্রুয়ারী মাসের তিন তারিখ?'

সন্তু বলল, 'না তো! এখন তো জুন মাস, আজ আট তারিখ!'

কাকাবাবু বললেন, 'একতলা বেলতলা, কে এল আগরতলা?'

সন্তু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কি বললেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, হরিণ বলে কোথায় যাই!'

সন্তুর আবার ভয় করতে লাগল। কাকাবাবু ভুল বকতে শুরু করেছেন। এক্ষুনি প্রকাশ সরকারকে ডাকা দরকার।

সে চলে গেল পাশের ঘরে। সে-ঘর ফাঁকা। প্রকাশ নেই। বাথরুমেও নেই। বাইরে উঁকি দিয়েও দেখা গেল না। সকালবেলা সে কোথায় চলে গেল?

অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না প্রকাশ সরকারকে।

।। ছয় ।।

সন্তু এখন ঠিক কি করবে, তা প্রথমে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

এখন সে কি প্রকাশ সরকারকে ভাল করে খুঁজে দেখতে যাবে? কিন্তু তা হলে কাকাবাবুর কাছে কে থাকবে? কাকাবাবুকে একা ফেলে রাখা যায় না।

প্রকাশ সরকার এত সকালে কোথায় গেল? সন্তুকে কিছু না বলে সে সার্কিট হাউসের বাইরে চলে যাবে, এটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয়ই ওর কোনও বিপদ হয়েছে।

দরজার সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্তু একটুক্ষণ ভাবতে লাগল।

এই জায়গাটায় কারুকেই সে চেনে না। এখানে থাকবার ব্যবস্থা করেছে প্রকাশ সরকার। সে যদি আর না ফেরে, তা হলে তো সন্তু মহামুশকিলে পড়ে যাবে। কাকাবাবুর চিকিৎসার জন্য এক্ষুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

কপালে হাত দিয়ে সন্তু নিজের ভুরু দুটো সোজা করল। ভুরু কুঁচকে থাকলে চলবে না। কেউ যেন বুঝতে না পারে সে ঘাবড়ে গেছে। হয়তো শত্রুপক্ষের লোক নজর রাখছে তার দিকে।

কিন্তু কারা শত্রুপক্ষ?

প্রকাশ সরকার যদি সত্যিই আর না ফেরে, তাহলে এখানে সন্তু কতদিন থাকবে কাকাবাবুকে নিয়ে? ফিরবেই বা কি করে?

সন্তু একবার ভাবল, বাড়িতে বাবার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে। তারপরই ভাবল, এর আগে যতবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছে, কোনবারই সে বাড়িতে কোনও বিপদের কথা জানায়নি! মা-বাবা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু এবারে তা ছাড়া উপায়ই বা কি?

এমন সময়ে ঘরের ভেতর থেকে কাকাবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'ব্রজেশ্বর! সাহেব সিং!'

সন্তু ভেতরে এসে বলল, 'কি কাকাবাবু? কাকে ডাকছেন?'

কাকাবাবু গম্ভীর মর্মভেদী দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর বললেন, 'চেনা চেনা লাগছে! তোমার নাম কি খোকা? তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?'

'সত্যি করে বল তো, অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ মানে কি? অশ্বত্থামা নামে সত্যিই কি কোন হাতি ছিল? কই, আগে তো কোনদিন ওই নাম শুনিনি!'

সন্তু এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তা বুঝতে পারল না। তার বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। কাকাবাবু তাকে চিনতে পারছেন না।

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'চুপ করে আছ কেন? ঠিক করে বল, 'কাচ্চু মিঞা কোথায়?'

'কাচ্চু মিঞা কে?'

'কাচ্চু মিয়া হল রাবণের ছোট ভাই। রাবণ ছিল লঙ্কার রাজা, আর কাচ্চু মিঞা গোল মরিচের ব্যবসা করে।'

'আমি কোনদিন কাচ্চু মিঞার নাম শুনিনি।'

'কাচ্চু মিয়া জঙ্গলগড় থেকে পালিয়েছে। সে এখন লুকিয়ে আছে কোন জায়গায়।'

'জঙ্গলগড়? জঙ্গলগড় কোথায়?'

কাকাবাবু শুকনো গলায় হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ হাঃ করে। তারপর বললেন, অত সহজে কি জানা যায়? তুমি কোন দলের স্পাই?'

'কাকাবাবু, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি সন্তু।'

'আমি সবাইকে চিনি। আমি কুম্ভকর্ণকেও চিনি, আবার বেলগাছ তলায় যে বসে থাকে তাকেও চিনি।'

দরজার কাছে একটা ছায়া পড়তেই সন্তু চোখ তুলে তাকাল।

খাঁকি প্যাণ্ট-শার্ট পরা একজন লোক।

লোকটি বলল, 'প্রকাশ সরকার কে আছে।'

সন্তু বলল, 'আমাদের সঙ্গে এসেছেন। এখন এখানে নেই। কেন?'

লোকটি বলল, 'এখানে নেই? ঠিক আছে?'

সন্তু বলল, 'কেন? কে প্রকাশ সরকারকে খুঁজছে।

'টেলিফোন আছে।'

সন্তু যেন হাতে স্বর্গ পেল। টেলিফোনে প্রকাশ সরকারকে এখানে কে ডাকে? নিশ্চয়ই মিলিটারির লোক? কিংবা কলকাতার সেই মিঃ ভার্মা।

সন্তু বলল, 'আমি টেলিফোন ধরছি। আপনি যান। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

সন্তু দেখল কাকাবাবু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

কাকাবাবুকে এক মুহূর্তের জন্যও একা ফেলে রেখে যেতে চায় না সন্তু। কিন্তু টেলিফোনটাও ধরা দরকার।

টেবিলের ওপর তালা-চাবি পড়েছিল, সন্তু সেটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা টেনে তালা লাগিয়ে দিল। তারপর চাবিটা পকেটে ভরে সে দৌড় লাগাল অফিস ঘরের দিকে।

ফোন তুলে শুধু 'হ্যালো' বলতেই একটি ভারী কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল, 'প্রকাশ সরকার—ইয়োর কোড নাম্বার প্লিজ।'

সন্তু বলল, 'প্রকাশ সরকার এখানে নেই, কোথায় যেন গেছে। আমি—'

কট্ করে লাইনটা কেটে গেল।

সন্তু পাগলের মতন হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করলেও আর কোনও শব্দ শোনা গেল না।

সন্তু দারুণ দমে গেল। আসল দরকারি কথাটাই বলা হল না। প্রকাশ সরকারকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা জানান খুব দরকার ছিল। ওরা তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করত।

হতাশভাবে সন্তু ফিরে এল আবার। চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলল।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে হল, উনি দারুণ রেগে গেছেন। কাকাবাবুকে ঘরে তালা বন্ধ করে যাওয়াটা উনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেননি! কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি?

সকাল থেকে কাকাবাবুর চা-ও খাওয়া হয়নি। সন্তুরও খিদে পেয়েছে।

সে বেয়ারাকে ডাকবার জন্য বেল বাজাল। বেয়ারা খাবার তো দিয়ে যাবে, কিন্তু তারপর পয়সা দেবে কে? কাকাবাবুর কাছে কি টাকাকড়ি আছে? সে না হয় দেখা যাবে এখন।

বেয়ারা আসতে সন্তু তাকে দুটো ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল। আর বলে দিল চা যেন খুব ভাল হয়। বাজে চা হলে ফেরত দেওয়া হবে।

কাকাবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ফোন করেছিল?'

সন্তু বলল, 'জানি না! প্রকাশ-সরকার নেই শুনেই লাইন কেটে দিল। আমার কোনও কথা শুনলই না। কোড্ নাম্বার জিজ্ঞেস করছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'কালো কোট না সাদা কোট?'

'কোট না, কাকাবাবু কোড্ নাম্বার।'

'নাম্বার, প্লাম্বার স্লাম্বার কিউকাম্বার...'

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাকাবাবুর কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোনও আশাই নেই। প্রকাশ ডাক্তার যে এই সময় কোথায় গেল!

চুপ করে বসে রইল সন্তু। কাকাবাবু আপন মনে অনেক কথা বলে যেতে লাগলেন। সে-সব কোনও কথারই কোন মানে নেই।

সন্তু ঠিক করে ফেলল, আজ বিকেলের মধ্যে যদি কোনও সাহায্য না আসে, তাহলে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠাতেই হবে।

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল, সঙ্গে এল একজন বেশ সুন্দরী মহিলা। এই পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস।

মহিলাটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, সন্তু? ওমা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ!'

মহিলাকে সন্তু চেনেই না। জীবনে কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না।

মহিলাটি ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, 'কাকাবাবু কোথায়? ও, এই তো কাকাবাবু!'

ঝুঁকে পড়ে মহিলাটি কাকাবাবুর পায়ের ধুলো নিল। তারপর বলল, আপনার শরীর এখন ভাল আছে নিশ্চয়ই?'

কাকাবাবু তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন মহিলাটিকে।

সে আবার সন্তুর দিকে ফিরে বলল, 'আমায় তুমি চিনতে পারনি মনে হচ্ছে? আমার নাম ডলি। আমি তোমার মাসতুতো বোন হই। তুমি তোমার বোন বেলি মাসিকে চেন তো! আমি তোমার সেই বেলি মাসির মেয়ে।'

সন্তু ডলি কিংবা বেলি মাসির নাম তো কোনদিন শোনেইনি, এমন কি, আগরতলায় তার যে মাসি থাকে তাও সে জানে না!

ডলি বলল, 'আমরা আগে শিলচরে থাকতুম। এই তো গত মাসেই বাবা এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, আপনি জানলেন কি করে যে আমরা...মানে কাকাবাবু এখানে এসেছেন।'

ডলি বলল, 'বাঃ! জানাটা এমন কি শক্ত! আমার ভাই এয়ারপোর্টে কাজ করে। কাল রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে এসে সে বলল, কাকাবাবু আর সন্তুকে দেখলাম এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন থেকে নামতে। কাকাবাবুর মতন লোক এখানে এলে সার্কিট হাউসেই উঠবেন, সেটা খুব স্বাভাবিক। তারপর বল, তোমাদের বাড়ির সবাই কেমন আছেন? আর তোমার কুকুরটা?'

সন্তু ক্রমশই অবাক হচ্ছে। আর এই মাসতুতো দিদি তার কুকুরটার পর্যন্ত খবর রাখে, অথচ সে নিজে ওঁদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। মা তো কোনদিন এই বেলি মাসির কথা বলেননি।

ডলি বলল, 'কাকাবাবু, আপনারা আগরতলায় এসে সার্কিট হাউসে থাকবেন, এর কোনও মানে হয় না। আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে। আমাদের মস্ত বড় কোয়ার্টার...মা বললেন, 'যা ডলি, যেমন করে পারিস কাকাবাবু আর সন্তুকে নিয়ে আয়।'

সন্তু বলল, কাকাবাবু এখন নিজে হাঁটতে পারে না।'

ডলি বলল, 'জানি, সে খবরও পেয়েছি। তুমি আর আমি ধরে ধরে নিয়ে যাব। আমি একটা গাড়ি এনেছি সঙ্গে।'

সন্তু বলল, 'আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া বারণ। এখানেই থাকতে হবে।'

ডলি বলল, 'বারণ? কে বারণ করেছে?'

সন্তু বলল, 'না, মানে, আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিলেন, তিনি এখন নেই। সেইজন্যই এখন অন্য কোথাও যাওয়া মুশকিল।'

ডলি বলল, 'তাতে কি হয়েছে? এখানে আমাদের ঠিকানা রেখে যাব। তিনিও পরে যাবেন। নাও, খাবার ঠাণ্ডা করছ কেন, আগে খেয়ে নাও! কাকাবাবুকে খাইয়ে দিতে হবে তো? আমি দিচ্ছি।

সন্তু দেখতে চাইল, ডলি নামের এই মেয়েটি খাইয়ে দেওয়ায় কাকাবাবু কোনও আপত্তি করবেন কি না।

কিন্তু কাকাবাবু একটুও আপত্তি করলেন না! লক্ষ্মী ছেলের মতন সব খেয়ে নিতে লাগলেন।

খেতে খেতে একবার মুখ তুলে ছেলেমানুষের মতন গলা করে বলে উঠলেন, 'মাসির বাড়ি দারুণ মজা কিল চড় নাই!'

।। সাত।।

ডলি নামের মেয়েটি খুব যত্ন করে খাইয়ে দিল কাকাবাবুকে! তারপর

মুখ ধুইয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর বলল, 'এবার চলুন, কাকাবাবু।'

সন্তুর দিকে ফিরে বলল, 'সন্তু, তুমি সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে টুছিয়ে নাও।'

সন্তু পড়েছে মহা মুশকিলে। সে বুঝতে পারছে যে, এখন এই সার্কিট হাউস ছেড়ে অচেনা কোনও মাসির বাড়িতে যাওয়া তাদের উচিত নয়। চারিদিকে যেন বিপদের গন্ধ। সার্কিট হাউসে তবু অনেক লোকজন আছে, পাহারা দেবার ব্যবস্থা আছে। আর্মির লোকেরাও নিশ্চয়ই এখানে একবার খোঁজ খবর নিতে আসবে। অথচ এই মহিলাটি এমন জোর করছে, যেন যেতেই হবে।

অবশ্য আরও একটা ব্যাপার আছে। কাকাবাবু সন্তুর হাতে খেতে চান না। সন্তুর সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন না। বোধহয় তিনি আর সন্তুকে চিনতেই পারছেন না। এই অবস্থায় কাকাবাবুর দেখাশুনা করা তো একা সন্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। আর একজন কারুর সাহায্য দরকার!

তবু সন্তু আমতা আমতা করে বলল, 'এখন না গিয়ে বিকেলে গেলে হয় না?'

ডলি বলল, কেন, বিকেলে কেন? এখন গাড়ি এনেছি, বিকেলে গাড়ি পাব না। তা ছাড়া মা তোমাদের জন্য ইলিশ আর গল্‌দা চিংড়ি আনতে দিয়েছেন।

কাকাবাবু যোগী পুরুষদের মতন হাত দুটো ওপর দিকে তুলে বললেন, 'এই যে! শিগ্‌গির।'

সন্তু ওই ভঙ্গিটার মানে বোঝে। কাকাবাবু গেঞ্জি পরে আছেন, এখন তিনি জামা পরতে চান ঃ তাঁকে জামা পরিয়ে দিতে হয়। হাত উঁচু করতেও কাকাবাবুর কষ্ট হয়। ওই ভাবে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

অর্থাৎ কাকাবাবু যেতে চাইছেন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তু চটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল। কিন্তু তারপরই তার মনে পড়ল, সার্কিট হাউস ছেড়ে গেলে এখানকার বিল মেটাবে কে? সন্তুর কাছে মোটে দশ টাকা আছে। কাল রাত্তিরে প্রকাশ সরকার বলেছিল, কাকাবাবুর জন্য যা খরচপত্তর হবে সব ভারত সরকার দিয়ে দেবে। কিন্তু সে-সব ব্যবস্থা করবার ভার প্রকাশ সরকারের ওপর। সেই প্রকাশ সরকারই তো নেই।

ডলি বলল, 'চল, চল, আর দেরি করছ কেন?'

সন্তু বলল, 'আমাদের তো যাওয়া আর হবে না। সব জিনিসপত্র নিয়ে

চলে গেলে আমাদের বিল মেটাবে কে?

ডলি তক্ষুনি এ সমস্যার সমাধান করে দিল।

সে বলল, 'তা হলে জিনিসপত্তর এখন নেবার দরকার নেই, সব এখানেই থাক। ঘরে তালা দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। পরে আমার বাবা এসে টাকা-পয়সা দিয়ে বিল মিটিয়ে সব জিনিসপত্তর নিয়ে যাবেন।'

আর আপত্তি করা যায় না, এবার যেতেই হবে।

সন্তু আর ডলি কাকাবাবুর দু'দিকে গিয়ে দাঁড়াল, কাকাবাবু ওদের দু'জনের কাঁধে হাত রাখলেন, সেইভাবে তিনজনে বার হল ঘর থেকে।

দরজায় তালা লাগাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল, কাকাবাবুর কাছে এমন কয়েকটা দরকারি জিনিস থাকে, যা তিনি কখনো হাতছাড়া করতে চান না। তিনি যেখানেই যান, একটা কালো হ্যাণ্ডব্যাগ তাঁর সঙ্গে থাকে। এবারে কাকাবাবু সেই ব্যাগটা নিয়ে যাবার কথা কিছুই বললেন না। ব্যাগটা নিয়ে যাওয়া উচিত, না এখানেই রেখে গেলে ভাল হয়, তা সন্তু বুঝতে পারল না।

তবু সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু কালো ব্যাগটা—'

কাকাবাবু বললেন, 'কার ব্যাগ? কেন ব্যাগ? আমি ব্যাগ-ট্যাগের কথা কিছু জানি না।'

সন্তু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

হাঁটা শুরু করার পর কাকাবাবু ডলিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা লক্ষ্মী তুমি আগে আমাকে কতবার দেখেছ?'

ডলি বলল, 'অনেকবার। এই তো শেষবার দেখা হল, বছর চারেক আগে, আমরা পুজোর সময় কলকাতায় গিয়েছিলুম, তখন আপনার সঙ্গে দেখা হল...আপনার অবশ্য মনে থাকবার কথা নয়, আপনি ব্যস্ত লোক।'

কাকাবাবু বললেন, কেন মনে থাকবে না? খুব মনে আছে। সেবার রাস্তায় খুব জল জমেছিল, তুমি জলে ভাসতে ভাসতে এসে থামলে আমাদের বাড়ির সামনে।'

ডলি একটু চমকে গিয়ে বলল, 'জলে ভাসতে ভাসতে? হ্যাঁ, রাস্তায় জল জমেছিল বটে, তবে হাঁটু পর্যন্ত। আমি তো জলে ভাসিনি।'

কাকাবাবু বললেন, 'ভাসোনি? বাঃ, বললেই হল! তুমি একবার ডুবলে, একবার ভাসলে। একবার ডুবলে, একবার ভাসলে, একবার ডুবলে...'

কাকাবাবু ওই একই কথা বলে যেতে লাগলেন বারবার।

সার্কিট হাউসের সামনে দিয়ে একটা লম্বা টানা বারান্দা। সেই বারান্দার অন্য দিক দিয়ে দু'জন লম্বামতন লোক জুতোর শব্দ করে হেঁটে আসছে এদিকে।

ডলি বলল, 'চল সন্তু, আমরা উঠোন দিয়ে নেমে যাই। আমাদের গাড়িটা ওই দিকেই আছে।'

সন্তুর কেন যেন মনে হল, ওই লোক দুটি তাদের খোঁজেই আসছে। শত্রু, না মিত্র? শত্রু হলেও এখন পালাবার কোনও উপায় নেই। সুতরাং দেখাই যাক না। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোক দুটি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন, 'আপনিই তো মিঃ রায়চৌধুরী?'

কাকাবাবু যদি কিছু উল্টো-পাল্টা বলেন এই ভয়ে সন্তু আগে থেকেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, উনিই।'

প্রথম জন বলল, 'নমস্কার। আমার নাম শিশির দত্তগুপ্ত। আমি এখানকার ডি এস পি। আর ইনি অরিজিৎ দেববর্মন, এখানকার হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। কাল রাত্তিরে আমরা দিল্লী থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি যে, আপনি এখানে এসেছেন। তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি!'

কাকাবাবু লোক দুটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, কোন কথা বললেন না।

শিশির দত্তগুপ্তের মাথার চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া, বেশ বড় একটা গোঁফ আছে, সেটাও কোঁকড়া মনে হয়। আর অরিজিৎ দেববর্মনের মাথার ঠিক মাঝখানটায় একটা ছোট্ট গোলমতন টাক। তাঁর গোঁফ নেই।

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, 'ডাঃ প্রকাশ সরকার কোথায়? তাঁরও তো আপনাদের সঙ্গে থাকবার কথা। আপনারা কি বাইরে কোথাও যাচ্ছিলেন?'

সন্তু বলল, 'প্রকাশ সরকারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তার মানে?'

সন্তু বলল, 'সকালবেলায় উনি আমাদের কিছু না বলে কোথায় চলে গেছেন।'

'এতক্ষণেও ফেরেননি।'

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! এ রকম তো হওয়া উচিত না। মিঃ রায়চৌধুরীকে ফেলে রেখে উনি চলে গেলেন? চলুন, ঘরে বসা যাক, পুরো ব্যাপারটা শুনি।'

ডলি কাকাবাবুর হাতটা নিজের কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'তা হলে আমি চলে যাই?'

শিশির দত্তগুপ্ত এক দৃষ্টিতে ডলিকে দেখছিলেন, এবার ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমার নাম চামেলি না? তুমি এর মধ্যেই আবার কাজ শুরু করে

দিয়েছ? আপনারা একে চেনেন? আগে দেখেছেন কখনও?'

সন্তু আমতা আমতা করে বলল, 'মানে ঠিক চিনি না, তবে ইনি বললেন, ইনি আমার এক মাসির মেয়ে...মানে মাসতুতো বোন, আমাদের যেতে বললেন ওঁর সঙ্গে...'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'মাসতুতো বোন?' তারপরই হেসে উঠলেন হা—হা করে।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু চামেলি ওরফে ডলির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, একবার ভাসলে, একবার ডুবলে।'

সঙ্গে-সঙ্গে চামেলি ওরফে ডলি কেঁদে উঠল হাউহাউ করে।

কাকাবাবুকে ছেড়ে শিশির দত্তগুপ্তর একটা হাত চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'স্যার, আমায় বাঁচান। আপনি আমায় বাঁচান। ওরা আমায় মেরে ফেলবে!'

শিশির দত্তগুপ্ত বাঁকাভাবে বললেন, 'আবার নাটক করছ? তোমার অভিনয় আমি ঢের দেখেছি।'

চামেলি ওরফে ডলি বলল, 'সত্যি বলছি স্যার। আমি বাইরে বেরুলেই ওরা মেরে ফেলবে আমায়। আপনি আমাকে বাঁচান।'

'ওরা মানে কারা?'

'তাদের চিনি না। কয়েকজন গুণ্ডামতন লোক, তারা বলেছে, যদি কাজ উদ্ধার করতে না পারি, তা হলে তারা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।'

'কাজ মানে, কি কাজ?'

কাকাবাবুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোন রকমে এখান থেকে নিয়ে যেতে বলেছিল। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'কোথায় গাড়ি? কি রঙের গাড়ি? কত নম্বর?'

'নম্বর জানি না। কালো রঙের অ্যাম্বাসাডার।'

শিশির দত্তগুপ্ত তক্ষুনি পেছন ফিরে দৌড়ে চলে গেলেন গেটের দিকে।

চামেলি ওরফে ডলির কান্নাকাটি শুনে আরও কয়েকজন লোক ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে ঃ সত্যি-সত্যি চোখের জলে চামেলির গাল ভেসে যাচ্ছে।

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, 'আপনাদের ঘর কোনটা? চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক।'

সন্তু বলল, 'আপনি একটু কাকাবাবুকে ধরুন, উনি নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না। আমি ঘরের তালা খুলছি।'

চামেলি তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে। অরিজিৎ দেববর্মন কড়া গলায় বলল, 'কান্না থামাও! তুমি রায়চৌধুরীকে অন্য দিকে ধর।

ওরা কাকাবাবুকে ধরে ধরে ফিরিয়ে আনতে লাগল। সন্তু যখন চাবি দিয়ে তালা খুলছে, সেই সময়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল চামেলি। সে কাকাবাবুকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল অরিজিৎ দেববর্মনের গায়ে। টাল সামলাতে না পেরে দু'জনেই পড়ে গেলেন মাটিতে।

সন্তু অবাক হয়ে পেছন ফিরে ব্যাপারটা দেখে চামেলিকে তাড়া করতে যাচ্ছিল, অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, 'থাক, ছেড়ে দাও? বোকা মেয়ে, এইভাবে কেউ পালাতে পারে না! ঠিক ধরা পড়ে যাবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'চিংড়ি মাছের মালাইকারি, ইলিশ মাছে সর্ষে বাটা ...ফসকে গেল, ফসকে গেল!'

।। আট।।

সন্তু ঘরের দরজা খুলে প্রথমে কাকাবাবুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। তারপর অরিজিৎ দেববর্মনকে বলল, 'আপনি একটু এখানে থাকবেন, আমি একটু বাইরেটা দেখে আসব?'

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন,'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। শিশিরবাবু ঠিক চামেলিকে ধরে নিয়ে আসবেন।'

সন্তু তবু দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বলল, 'উনি আমাদের কাছে ওঁর নাম বলেছিলেন ডলি। বললেন যে, আমার মাসতুতো বোন, আমাদের বাড়িতে অনেকবার গেছেন।'

অরিজিৎ বাবু বললেন, 'ওর যে কত নাম তার ঠিক নেই। ওর কাজই হল কলকাতা আগরতলা প্লেনে উঠে অন্য যাত্রীদের হ্যাণ্ডব্যাগ চুরি করা। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে!'

সন্তুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সে আগে কখনও কোনও মেয়েচোর দেখেনি। ডলি ওরফে চামেলির কথাবার্তাগুলো যেন তার প্রথম থেকেই কেমন অদ্ভুত লাগছিল, তা বলে যে চুরি করে, তা সে ধারণাই করতে পারেনি।

অরিজিৎবাবুর কথাই ঠিক হল। চামেলি ধরা পড়ে গেছে। সন্তু দেখল শিশির দত্তগুপ্ত তার এক হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে আসছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আসছে একদঙ্গল লোক।

শিশিরবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বার পরে লোকগুলো দরজার কাছে

স্যার আমায় বাঁচান। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে

দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। শিশিরবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, 'এই যে ভাই, আপনারা সব যান তো। এখানে ভিড় করবেন না।'

সন্তু গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

চামেলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নকল কান্না নয়, জলের ধারা গড়াচ্ছে তার দু'গাল বেয়ে।

শিশিরবাবু কড়া গলায় বললেন কান্না থামাও! হঠাৎ এরকম নাটক শুরু করে দিলে কেন? এখানে এসেছিলে কি মতলবে?'

কাঁদতে কাঁদতে চামেলি বলল, 'ওরা পাঠিয়েছিল। ওরা বলেছিল এ কাজ ঠিকঠাক না করতে পারলে ওরা আমায় মেরে ফেলবে।'

'ওরা মানে কারা? তাদের নাম বল।'

'নাম আমি জানি না। তাদের ভয়ংকর চেহারা, দেখলেই মনে হয় এরা মানুষ খুন করতে পারে। তারা বলল, কাকাবাবুকে যে-কোনও উপায়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গাড়িতে নিয়ে এস। নইলে তুমি প্রাণে বাঁচবে না!

অরিজিৎবাবু বললেন, 'ভাগ্যিস আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম। প্রায় তো নিয়েই যাচ্ছিল মেয়েটা।'

শিশিরবাবু বললেন, 'না, না, এ মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে। আমি বাইরে গিয়ে কোনও কালো অ্যামবাসাডার দেখতে পাইনি। কাল রাত্তিরে দিল্লি থেকে খবর পাওয়ার পর আজ ভোর থেকেই আমি সার্কিট হাউসের বাইরে দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। তারা বলল, অন্তত এক ঘন্টার মধ্যে ওরকম কোনও কালো গাড়ি এখানে আসেনি। চামেলিকে তারা ঢুকতে দেখেছে, চামেলি এসেছে সাইকেল রিকশা করে।'

চামেলি তবু হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'স্যার বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথা বলছি। কালো গাড়িটা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল, একেবারে কাছে আসতে চায়নি।'

শিশিরবাবু বললেন, 'কতটা দূরে গাড়িটা রেখেছিল?

'প্রায় আধমাইল।'

'এতদূরে তুমি মিঃ রায়চৌধুরীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে?'

'না না, সাইকেল রিকশায়।'

শিশিরবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমায় কি বলেছিল? সার্কিট হাউসের বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না?'

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ.......মানেঃ, সেই রকমই বলেছিলেন।'

কাকাবাবু ঘরে ঢোকার পর থেকে চোখ বুজে আছেন। যেন তিনি কিছুই শুনছেন না; এ-সব ব্যাপারে তাঁর কোনও আগ্রহই নেই।

চামেলি আবার বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ নেই। ওরা আমায় ভয় দেখিয়ে সব করিয়েছে।'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'কাজ হাসিল তো তুমি করতে পারনি। তবু তুমি পালাবার চেষ্টা করলে কেন? তোমার সেই 'ওরা' না হয় তোমাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল, তা হলে আমরা কি তোমায় খুন করতাম?'

'কি জানি স্যার, আপনাদের দেখেই আমার মাথাটা হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে গেল।'

তারপর সে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি আমায় মাপ করুন। আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি....ছি ছি ছি ছি, আমি অন্যায় করেছি। আমার মাথার ঠিক ছিল না...বলুন, কাকাবাবু, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন বলুন!'

সন্তু একেবারে শিউরে উঠল। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা বলেই কেউ তাঁর পায়ে হাত দিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। এমন কি কারুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেন না। নিশ্চয়ই কাকাবাবু এবার খুব রেগে উঠবেন।

কিন্তু কাকাবাবু চোখ মেলে খুব শান্তভাবে বললেন, 'একে ছেড়ে দিন। এই মেয়েটি এখানে রয়েছে কেন?

অরিজিৎবাবু ও শিশিরবাবু দুজনেই চমকে উঠলেন।

শিশিরবাবু বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি একে ছেড়ে দিতে বলছেন?'

কাকাবাবু বললেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে, মেয়েটি এখন বাড়ি যাক্।'

শিশিরবাবু বললেন, 'এই মেয়েটি দাগী আসামী। ওকে জেরা করলে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। আচ্ছা মিঃ রায়চৌধুরী, কারা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল, সে সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে? আগরতলায় আপনার কোন শত্রু আছে?'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার? হায়, হায়, হায়, হায়! সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়। হায়, হায়, হায়, হায়!'

শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। শিশিরবাবুর মুখখানা গোমড়া হয়ে গেল। অরিজিৎবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন! কিন্তু ব্যাপারটা তো খুব সিরিয়াস। দিল্লী থেকে যা খবর এসেছে!

কাকাবাবু বললেন, 'রামনরেশ ইয়াদব কভি নেহি দিল্লী গিয়া!'

সন্তু ফিসফিস করে শিশিরবাবুকে বলল, 'শুনুন, আমার কাকাবাবুর মাথায় কিরকম যেন গোলমাল হয়ে গেছে! ওঁর এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার।'

শিশিরবাবু বললেন, 'ইজ দ্যাট সো?'

কাকাবাবু সন্তুর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, 'এই খোকা, বড়দের সামনে ফিসফিস করে কানে কানে কথা বলতে নেই, জান না? ব্যাড ম্যানার্স! যাও, তোমার দিদির সঙ্গে বাড়ি চলে যাও।'

সন্তুর যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। কাকাবাবু তাকে আর একদম চিনতে পারছেন না।

এমন কি চামেলি পর্যন্ত কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে।

অরিজিৎবাবু বললেন, তা হলে তো এঁর এক্ষুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। ডক্টর প্রকাশ সরকারই বা কোথায় গেলেন?'

শিশিরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি চামেলিকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে ওকে আপাতত আটকে রাখুক। মিঃ রায়চৌধুরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা কি এখানে সুবিধে হবে, না হাসপাতালে পাঠাবেন?'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'এখানে নানা লোকের ভিড়। মহারাজার গেষ্টহাউস খালি আছে, আমি ভাবছিলাম মিঃ রায়চৌধুরীকে সেখানে রাখলে কেমন হয়। সেখানে চিকিৎসার কোনও অসুবিধা হবে না। একজন নার্স রেখে দিলেই হবে।'

চামেলি বলে উঠল, 'আমায় নার্স রাখুন। আমি নার্সিং খুব ভাল জানি। আমি কাকাবাবুর সেবা করব।'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'এ মেয়ের আবদার তো কম নয়। একটু আগে মেয়েটা ভদ্রলোককে ডাকাতদের হাতে তুলে দিচ্ছিল, এখন আবার বলে কি না সেবা করব।'

চামেলি বলল, 'একবার ভুল করেছি বলে বুঝি ক্ষমা করা যায় না?' আমি কাছাকাছি থাকলে ওরা আর কাকাবাবুকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে না।'

শিশিরবাবু বললেন, 'এবার সত্যি করে বল তো ওরা মানে কারা?'

'আপনি আমায় ঠিক বাঁচিয়ে দেবেন বলুন? আমি ওদের মধ্যে একজনকে চিনি। সে হচ্ছে জগদীপ।'

'জগদীপ!'

'হ্যাঁ, জগদীপই তো একটা রিভলবার আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল ...'

'ওঃ, এই মেয়েটা কি অসহ্য মিথ্যেবাদী! জগদীপ গত ছ'মাস ধরে জেল খাটছে, আর সে কিনা ওর কপালের সামনে রিভলবার তুলতে এসেছে?'

হ্যাঁ স্যার, সত্যি বলছি, জগদীপই আমায় ভয় দেখিয়েছে। জগদীপ জেল থেকে পালিয়ে গেছে, জানেন না?'

'একদম বাজে কথা!'

ঠিক তখনই ঠকঠক করে শব্দ হল দরজায়।

সন্তু দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখল, 'একজন বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ লোক, সাদা ধুতি আর সাদা হাফশার্ট পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখলেই বোঝা যায় লোকটি পুলিশ। কেন যে এদের সাদা পোশাকের পুলিশ বলে, তা কে জানে। একবার তাকালেই তো পুলিশ বলে চেনা যায়।

লোকটি প্রথম শিশিরবাবুর দিকে তাকিয়ে লম্বা স্যালুট দিল। তারপর অরিজিৎবাবুকে।

শিশিরবাবু ওকে দেখেই বললেন, 'এই তো ভজনলাল! তুমি বল তো জগদীপ এখন কোথায়? সে জেলে আছে না?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ স্যার!'

'সে কি জেল ভেঙে পালিয়েছে এর মধ্যে?

'না স্যার!'

শিশিরবাবু অন্যদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, দেখলেন, মেয়েটা কি রকম মিথ্যে কথা বলে?'

চামেলি একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, 'তাহলে বোধহয় জগদীপ নয় তা হলে বোধহয় জগদীপ ওর নাম রাজাধিপ।'

শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু দু'জনেই দারুণ চমকে উঠলেন এই নামটা শুনে।

অরিজিৎবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, 'প্রিপস্‌টারাস! এ তো সাংঘাতিক মেয়ে।'

শিশিরবাবু বললেন, 'একে আবার জেলে না দিয়ে উপায় নেই।'

বাইরের সাদা পোশাকের পুলিশটি এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'স্যার!'

শিশিরবাবু বললেন, 'ও! কি ব্যাপার, ভজনলাল?'

সেই লোকটি বলল, 'স্যার, গেটের কাছে একটা সাইকেল রিকশা একজন লোককে নিয়ে এসেছে। লোকটা অজ্ঞান।

শিশিরবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুও ছুটল গেটের দিকে।

।। নয়।।

সন্তুর ধারণা হল বাইরে গিয়ে সে ডক্টর প্রকাশ সরকারকে দেখতে পাবে। কারণ ভোর থেকে প্রকাশ সরকারের উধাও হয়ে যাবার সে কোনও যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু বাইরে এসে দেখল, একটা সাইকেল রিক্‌শার ওপর একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক গা এলিয়ে শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। লোকটির গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি, পায়ের চটিও বেশ দামি। কিন্তু লোকটির চেহারার সঙ্গে এই পোশাকে যে একেবারেই বেমানান। লোকটির গায়ের রং পোড়া-পোড়া, মুখে পাঁচ-ছ'দিনের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, মাথার চুল উস্‌কো-খুসকো।

শিশির দত্তগুপ্ত আর অরিজিৎ দেববর্মনও লোকটিকে চিনতে পারলেন না।

সাইকেল-রিক্‌শা চালকটি হতভম্ব মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শিশিরবাবু প্রথমে শুয়ে-থাকা লোকটির হাত ও বুক পরীক্ষা করে দেখলেন যে সে বেঁচে আছে কি না। তারপর রিকশা-চালককে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার একে কোথায় পেলে?

রিক্‌শা চালক বলল, 'বাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না। ফিসারি অফিসের ধার থেকে দুটি বাবু কাঁধ ধরাধরি করে উঠলেন। আমারে হেঁকে বললেন, সার্কিট হাউসে চল। খানিকবাদে আমি একবার পিছু ফিরে দেখি এক বাবু নেই। আর এক বাবু এরকম ধারা এলিয়ে পড়ে আছেন।'

'একজন মাঝপথ থেকে নেমে গেল, 'তুমি টেরও পেলে না?'

'না বাবা! আমি তো আগে, তার পেছনে ফিরে তাকাইনি!'

কিন্তু গাড়ি তো হাল্কা হয়ে গেল। তা ছাড়া একজন লোক নেমে গেলে গাড়িতে একটা ঝাঁকুনিও তো লাগবে?

'মাঝখানে এক জায়গায় রাস্তা খারাপ ছিল, সেখানে এমনিতেই তো গাড়ি লাফাচ্ছিল!'

যে লোকটি নেমে গেছে, তাকে দেখতে কেমন মনে আছে?'

'জামা আর প্যান্টুলুন পরা এমনি সাধারণ ভদ্দরলোকের মতন!'

'আর এই লোকটি কি তখন নিজে থেকেই তোমার রিকশায় উঠেছিল?'

'অন্য বাবুটির কাঁধ ধরাধরি করে এল। আমি ভাবলুম বুঝি শরীর খারাপ।'

সন্তু বলল, 'চামেলি এই লোকটিকে চেনে কিনা একবার দেখলে হয়।'

শিশিরবাবু বললেন, এমনও হতে পারে, এই লোকটির সঙ্গে মিঃ রায়চৌধুরীর কেসের কোনও সম্বন্ধই নেই। এ হয়তো সার্কিট হাউসের অন্য ঘরে থাকে। যাই হোক, দেখা যাক।'

ধরাধরি করে লোকটিকে নিয়ে আসা হল সার্কিট হাউসের অফিস ঘরে। ম্যানেজার কিংবা দারোয়ানরা কেউই লোকটিকে চেনে না!

সন্তু গিয়ে চামেলিকে ডেকে আনল। অরিজিৎবাবু রইলেন কাকাবাবুর কাছে।

চামেলি লোকটিকে দেখে বলল, 'ও-মা, এ আবার কে? একে তো কখনও দেখিনি।'

শিশিরবাবু সার্কিট হাউসের ম্যানেজারকে বললেন, লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। একজন পুলিশ সেখানে রেখে দিলেন লোকটিকে পাহারা দেবার জন্য।

কাকাবাবুর ঘরে ফিরে এসে সন্তু জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলল! তাদেরও সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে যেতে হবে। শিশিরবাবু এখানকার মহারাজার একটি গেস্ট হাউসে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

চামেলি এই সময় বলল, 'স্যার, আমি তাহলে এবারে যাই?'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'তুমি যাবে? কোথায় যাবে?'

'বাড়ি যাব।' আমি আর এখানে থেকে কি করব?'

'তোমার আবার আগরতলায় বাড়ি আছে নাকি? আমি তো যতদূর জানি তোমার বাড়ি ধর্মনগরে।'

'না, মানে, এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে।'

'তোমার বন্ধু কে, তার নামটা তো জানতে হচ্ছে। সে-ও নিশ্চয় তোমারই মতন।'

শিশিরবাবু বললেন, 'একটু আগে তুমি বললে, তুমি কাজ হাসিল না করতে পারলে ওরা তোমায় মেরে ফেলবে। তারপর একটু বাদে বললে, তুমি আগের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাকাবাবুর সেবা করবে। আবার এখন বলছ বন্ধুর বাড়ি যাবে। তুমি দেখছি পাগল করে দেবে আমাদের।

অরিজিৎবাবু বললেন, তোমায় আর ছাড়া হবে না! জেলখানাই তোমার পক্ষে ভাল জায়গা।'

চামেলি যেন খুব ভয় পেয়ে গেছে এই ভাবে বলল, 'না, না, আমায় আর জেলে পাঠাবেন না। আমার জেলের মধ্যে থাকতে একদম ভাল লাগে না।'

কাকাবাবু আগাগোড়া চুপ করে চোখ বুজে বসে আছেন। এসব কথা শুনছেন কি না কে জানে!

শিশিরবাবু এবার বললেন, মিঃ রায়চৌধুরী, 'উঠুন এখন আমাদের যেতে হবে।'

সন্তু বলল, 'ওঁকে ধরে-ধরে তুলতে হবে। উনি নিজে হাঁটতে পারেন না।'

শিশিরবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো! চল তুমি আর আমি ওকে ধরে নিয়ে যাব।

কাকাবাবু এবারেও কোনও কথা বললেন না, ওদের বাধাও দিলেন না।

সার্কিট হাউস ছেড়ে বাইরে যাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল ডাক্তার প্রকাশ সরকারের কথা! ভদ্রলোক কোথায় যে গেলেন! তারপর তিনি ফিরে এলেও সন্তুদের খুঁজে পাবেন কি না কে জানে!

শিশিরবাবু একটা স্টেশন ওয়াগান আনিয়েছিলেন। সেটার পেছন দিকে শুইয়ে দেওয়া হল কাকাবাবুকে। তারপর গাড়িটা ছেড়ে দিল।

ত্রিপুরার রাজাদের অনেকগুলো বাড়ি। তার মধ্যেই কয়েকটি বাড়িকে অতিথিশালা করা হয়েছে। সন্তুরা যে বাড়িটাতে এসে পৌঁছল, সেটা দেখলে রাজার বাড়ি মনে হয় না। বাড়িটা এমনিতে বেশ সুন্দর, ছোট-খাটো দোতলা। সাদা রঙের। সামনে অনেকখানি বাগান। মনে হয় কোনও সাহেবের বাড়ি। হয়তো এক সময় কোনও সাহেবেরই ছিল।

সবাই মিলে উঠে এল ওপরে। দোতলায় মাত্র তিনখানা ঘর আর বেশ চওড়া বারান্দা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘরটা সন্তুদের জন্য খুলে রাখা হয়েছে।

অরিজিৎবাবু বললেন, 'নিচে রান্নার লোক আছে, কেয়ারটেকার আছে, যখন যা চাইবে দেবে। তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে সারাক্ষণ থাকবে। আর একজন ডাক্তারও এসে দেখে যাবেন একটু বাদে।'

শিশিরবাবু বললেন, 'একতলার ঘরে দুজন পুলিশ থাকবে। অচেনা কোনও লোককে ওরা ওপরে আসতে দেবে না। তোমরাও কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা কোর না। তোমার কাকাবাবুর এখন একদম চুপচাপ নিরিবিলিতে থাকা উচিত।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'এখানে টেলিফোন আছে? হঠাৎ কোনও দরকার পড়লে খবর দেব কি করে?

শিশিরবাবু বললে, হ্যাঁ একতলায় টেলিফোন আছে। তাছাড়া কোনও দরকার হলে আমার পুলিশদের বোল, ওরাই সব ব্যবস্থা করবে।'

অরিজিৎবাবু বললেন, আমায় এক্ষুনি অফিসে যেতে হবে দিল্লিতে সব খবর জানান দরকার। সন্তু কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে কোনও খবর

পাঠাতে হবে?' একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, 'না, থাক।'

শিশিরবাবুরও কাজ আছে, তাঁকেও এখন যেতে হবে। দুজনেই 'আবার বিকেলে আসব' বলে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বারান্দার একটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কাকাবাবুকে! অনেকক্ষণ থেকে তিনি একেবারে চুপ করে আছেন। শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু এর মধ্যে কাকাবাবুর সঙ্গে দু-একবার কথা বলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কাকাবাবু কোনও উত্তর দেননি। এখন তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আকাশের দিকে।

কাকাবাবুর বেশ কয়েক কাপ কফি খাওয়ার অভ্যেস সকালবেলা। আজ উনি মোটে এক কাপ চা খেয়েছেন। বেলা এখন প্রায় এগারোটা। সেইজন্য সন্তু কাকাবাবুর কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু' কফি খাবেন আমাদের সঙ্গে কফি আছে নিচের লোকদের বানিয়ে দিতে বলতে পারি।'

কাকাবাবু আস্তে আস্তে মুখ ফেরালেন সন্তুর দিকে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর বললেন, 'তুমি তুই সন্তু না?'

সন্তু ব্যগ্রভাবে বলল, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু!'

একবার মনে হচ্ছে সন্তু, আর একবার মনে হচ্ছে মিংমা। আমি কিছুই মনে রাখতে পারছি না রে। মাথার মধ্যে সব যেন কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

এ কথা শুনেও সন্তু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কাল রাত্তির থেকে সে কাকাবাবুর মুখে এত স্বাভাবিক কথা আর শোনেনি।

সে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি কয়েকদিন একটু বিশ্রাম নিন, তা হলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমরা কোথায় এসেছি রে? এই জায়গাটা কোথায়?'

'এটা ত্রিপুরার আগরতলা।'

'আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানেই নিয়ে এল!'

'কেন কাকাবাবু? এখানে আপনার অসুবিধে হবে?'

'কি জানি! আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না!'

কাকাবাবু আবার চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। সন্তু আর কফি খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে সন্তু একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে নিল। তারপর ঘুরে দেখতে গেল সারা বাড়িটা।

অন্য দু'খানা ঘরের মধ্যে একটা ঘরে তালা বন্ধ, অন্য ঘরটি খোলা।

সেটার দরজা ঠেলে সন্তু দেখল, ঘরটি বেশ বড়, একপাশে একটা খাওয়ার টেবিল আর অন্য পাশে কয়েকটা সোফা কৌচ সাজান। একটা বেশ বড় রেডিও রয়েছে সেখানে। সে-ঘরের দু'দিকের দেওয়ালে দুটো ছবি। একটা ত্রিপুরার আগেকার কোন মহারাজার, আর একটা রবীন্দ্রনাথের।

তিনতলার একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে সন্তু দেখল ছাদের দরজায় তালাবন্ধ। সন্তু একটু নিরাশ হয়েই নেমে এল। যে-কোনও বাড়িতে গেলেই তার ছাদটা দেখতে ইচ্ছে করে।

সন্তু নেমে গেল একতলায়।

সিঁড়ির পাশের ঘরটার সামনেই টুল পেতে দুজন সাদা-পোশাকের ষণ্ডামার্কা পুলিশ বসে আছে। সন্তুকে দেখেই একজন জিজ্ঞেস করল, 'কি, কিছু লাগবে?'

সন্তু বলল, 'না, বাগানটা একটু দেখতে এসেছি।

বাগানটি বেশ যত্ন করে সাজান। নিশ্চয়ই মালি আছে। গোলাপ আর জুঁই ফুলই বেশি। সন্তু কক্ষণও ফুল ছেঁড়ে না, ফুল গাছে থাকতেই তার দেখতে ভাল লাগে। সে মুখ নিচু করে একটা একটা ফুলের গন্ধ নিতে লাগল।

বাগানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সন্তু অনেক কথা চিন্তা করতে লাগল। সকাল থেকে কত ঘটনাই না ঘটে গেল!

একটা ব্যাপার সন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। প্রথমে তাদের থাকবার কথা ছিল পুরী! তারপর হঠাৎ সেই প্ল্যান বদল করে তাকে আর কাকাবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল গৌহাটিতে, সেখান থেকে আবার তাদের আনা হল এই আগরতলায়। এক রাত্তিরের মধ্যে এসব ঘটেছে। তবু আগরতলায় এত লোক তাদের জানল কি করে? আর এখানে তাদের এত শত্রুই বা হল কেন?

সন্তু এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল, হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। কি রকম যেন স্প্রে করার মতন ফিঁস্‌স ফিঁস্‌স শব্দ। সন্তু সামনে তাকিয়ে দেখল একটা সাপ ফণা তুলে আছে তার দিকে।

।। দশ।।

সন্তু তো আর সাধারণ শহরের ছেলেদের মতন নয় যে, সাপ দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠবে! সে কত দুর্গম পাহাড় আর কত গভীর জঙ্গলে গেছে, সাপ-টাপ দেখার অভিজ্ঞতা তার অনেক আছে।

সাপটার চোখের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফুল দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে আর একটু হলেই সে সাপটাকে মাড়িয়ে দিত। তা হলেই হয়েছিল আর কি!

সেবার আন্দামানে যাবার পথে কাকাবাবু সন্তুকে সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সন্তু জানে, যে সাপ ফণা তুলতে পারে সে সাপের বিষ থাকে। তাহলেও বিষাক্ত সাপ চট করে মানুষকে কামড়ায় না। মানুষ তো আর সাপের খাদ্য নয়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সাপ নিজে থেকেই চলে যায়।

কিন্তু, এই সাপটা তো যাচ্ছে না! সন্তুর দিকেই ফণাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু একটু দুলছে। চিড়িক চিড়িক করে বেরিয়ে আসছে তার লম্বা জিবটা। এবার সন্তুর গায়ে ঘাম দেখা গেল।

সাপটার দিকে চোখ রেখে সন্তু খুব সাবধানে আস্তে আস্তে তার পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলতে লাগল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেই ছুঁড়ে মারল সাপটার গায়ে। সাপটা অমনি পাঞ্জাবিটার মধ্যে পাক খেতে খেতে ছোবল মারতে লাগল বারবার।

সন্তু এই সুযোগে সরে গেল অনেকটা দূরে। এই কায়দাটাও কাকাবাবুর কাছ থেকে শেখা। ছোটখাটো লাঠি কিংবা পাথর ছুঁড়ে সাপ মারার চেষ্টা না করে গায়ের জামা ছুঁড়ে মারলে অনেক বেশি কাজ হয়। সাপটার যত দাগ পড়েছে ওই পাঞ্জাবিটার ওপরে, ওটার মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে ছোবল মেরে যাচ্ছে বারবার।

সন্তুর ভাবভঙ্গি দেখে বারান্দায় বসে থাকা পুলিশ দু'জনের কি যেন সন্দেহ হল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, খোকাবাবু?'

এই খোকাবাবু ডাকটা শুনলে সন্তুর গা জ্বলে যায়।

আজ ক'দিন বাদে সে কলেজে পড়তে যাবে! এখনও সে খোকাবাবু!

যেন কিছুই না, একটা আরশোলা বা গুবরে পোকা, এই রকম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে সন্তু বলল, কুছ নেহি, একঠো সাপ হ্যায়!'

ত্রিপুরায় সবাই বাংলায় কথা বলে, সন্তু হিন্দীতে কেন জবাব দিল কে জানে! বোধহয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আপনিই হিন্দী এসে যায়!

'সাপ।' একজন পুলিশ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বাগানের মধ্যে নেমে এসে বলল, 'কোথায়?'

সন্তু আঙুল দিয়ে পাঞ্জাবিটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ঐ যে!'

এবারে পুলিশটি চমকে উঠে বলল, 'বাপ রে! সত্যিই তো সাপ! লাঠি,

লাঠি কোথায়। এই শিবু, লাঠি আন।'

তখনি অনেকে দৌড়ে এল।

সাপেরা এমনিতে কানে কিছুই শুনতে পায় না। কিন্তু লোকজন চলার সময় মাটিতে আর হাওয়ায় যে তরঙ্গ হয়, সেটা ঠিক শরীর দিয়ে টের পায়। এক সঙ্গে অনেক লোকের পায়ের ধুপধাপে সাপটা বুঝে গেল যে বিপদ আসছে। এবারে সে পাঞ্জাবিটা ছেড়ে সরসর করে ঢুকে পড়ল পাশের একটা ঝোপে।

পুলিশ দু'জন আর রান্নার লোকটি সেই ঝোপটায় লাঠিপেটা করতে লাগল। সেই লাঠির চোটে আহত হল কয়েকটা ফুলগাছ, সাপের গায়ে লাগল না। সন্তু দেখতে পেয়েছে সাপটা একটা গর্তে ঢুকে পড়েছে! সাপেরা কিন্তু বেশ বোকা হয়। গর্তের মধ্যে প্রথমে ঢুকিয়ে দেয় মুখটা লেজের দিকটা অনেকক্ষণ বাইরে থাকে। যে-কেউ তো লেজটা ধরে টেনে তুলতে পারে!

পুলিশটা ফুলের ঝোপে তখনও লাঠি পিটিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হৈ-হৈ করে ছুটে এল বাগানের মালি। সাপের ব্যাপারটায় সে কোনও গুরুত্বই দিল না, ফুলগাছ নষ্ট হচ্ছে বলে সে খুব রাগারাগি করতে লাগল।

ওটা নাকি বাস্তু সাপ, কারুকে কামড়ায় না।

সন্তু অবশ্য বাস্তুসাপের ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না। গায়ে পা পড়লেও সাপটা কামড়াত না! তাহলে তার জামার ওপর অত ছোবল, মারল কেন? আর তার বাগানে আসার শখ নেই!

মালি সন্তুর পাঞ্জাবিটা মাটি থেকে তুলতে যেতেই সন্তু বলল, 'ছোবেন না, ওটা ছোবেন না, ওতে সাপের বিষ আছে!

মালি কিন্তু বিষের কথা শুনেও ঘাবড়াল না। বলল, 'আপনার জামা! ও কিছু হবে না, একটু ধুয়ে নিলেই হয়ে যাবে।'

সন্তু অবশ্য আগেই ঠিক করে ফেলেছে যে, ও জামা সে আর গায়ে দেবে না। সাপের বিষ-মাখা জামা কেউ গায়ে দেয়? সে ওটা আর ছুঁয়েই দেখবে না।

মালি জামাটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই সন্তু বলল, ওটা আমার চাই না।'

তারপরই সে দৌড়ে চলে গেল ওপরে। এতবড় একটা খবর কাকাবাবুকে না জানালে চলে!

কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই তার উৎসাহ চুপসে গেল। কাকাবাবুর যেন এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহই নেই।

সন্তু, 'কাকাবাবু, সাপ! এই অ্যাত্ত বড়!'

ইচ্ছে করেই সন্তু সাপের সাইজটা একটু বাড়িয়ে দেখাল, কিন্তু কাকাবাবু শুকনো মুখে তাকিয়ে রইলেন! সন্তু আবার বলল, 'ঠিক আমার পায়ের কাছে আর একটু হলেই কামড়ে দিত।

কাকাবাবু তবু কোন কথা বললেন না। যেন শুনতেই পাচ্ছেন না। মনে হল, কোন কারণে কাকাবাবুর খুব মন খারাপ।

সন্তুরও মন খারাপ হয়ে গেল। সাপটা যদি তাকে কামড়ে দিত। তা হলে কি হত? সন্তু মরে যেতেও পারত। সাপে কামড়ালেই অবশ্য, সব সময় মানুষ মরে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে সেরে যায়। কিন্তু হাসপাতাল-টাসপাতাল সন্তুর খুব বিচ্ছিরি লাগে। সে মরে গেলে কিংবা হাসপাতালে শুয়ে থাকলে কাকাবাবুর দেখাশুনো করত কে? কাকাবাবুর মাথার ঠিক নেই।

সন্তু বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দেখল রিক্সা করে একজন মহিলা এসে নামল গেটের কাছে। একটু বাদেই একজন পুলিশ সেই মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল ওপরে।

সেই মহিলা একজন নার্স। দেববর্মনবাবু এঁকে পাঠিয়েছেন। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা মহিলার, কাজে বেশ পটু মনে হয়। সন্তু তাকে কাকাবাবুর অসুবিধেগুলো বুঝিয়ে দিল। কাকাবাবুও বেশ শান্তভাবে মেনে নিলেন এই নার্সের ব্যবস্থা। সন্তু অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে মনে হল, এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবুকে নিয়ে এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল। কাকাবাবু যদি কোনও নির্দেশ না দেন, কখন কী করতে হবে বলে না দেন তাহলে আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। এবং কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবুর চিকিৎসা করানো দরকার। বিকেলবেলা গভরমেণ্টের লোকেরা এলেই সন্তু এই কথা বলবে।

বিকেলবেলা ওঁরা আসবার আগেই আর একজন এলেন যাঁকে দেখে সন্তু খুব খুশি হয়ে উঠল। এঁর নাম নরেন্দ্র ভার্মা, দিল্লীর বড় অফিসার, কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। নরেন্দ্র ভার্মা এসে গেছেন, আর সন্তুর কোনও চিন্তা নেই। ভার্মাকে জিপ থেকে নামতে দেখেই সন্তু ওঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য নিচে নেমে গেল। ভার্মা কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন বলে বাংলাও মোটামুটি বলতে পারেন।

সন্তুকে দেখে ভার্মা বললেন, 'আরে আরে সন্টুবাবু, কেমন আছ? সব ভাল তো?'

ভার্মা সন্তুকে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নিলেন। ভার্মা খুবই লম্বা মানুষ, নস্যি রঙের সাফারি স্যুট পরে আছেন, তাঁর চোখ দুটো খুব তীক্ষ্ণ।

সন্তু অভিমান ভরা গলায় বলল, 'না নরেনকাকা, এবারে কিছুই ভাল লাগছে না। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।'

ভার্মা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি কিছু কিছু শুনেছি। আমি দুপুরে এসে পৌঁছেই সার্কিট হাউসে গেলাম তোমাদের ঢুঁড়তে। তোমাদের না পেয়ে ফোন করলাম দেববর্মনকে। তাঁর কাছে শুনলাম কি এর মধ্যেই রায়চৌধুরীকে স্ন্যাচ্ করার অ্যাটেম্প্ট হয়ে গেছে। বড় তাজ্জব কথা। আগরতলায় আমিই তোমাদের পাঠাতে বলেছি, এখানকার কোনও লোকের তো জানবার কথা নয়।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এত জাগয়া থাকতে আমাদের এই আগরতলাতেই পাঠালেন কেন?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভার্মা বললেন, 'ত্রিপুরার কথা তোমার কাকাবাবু খুব বলাবলি করছিলেন তখন। মানে ত্রিপুরাতে উনি কী যেন একটা ধান্দা করেছিলেন। তাই আমরা ভাবলাম কী, উনি ত্রিপুরাতে হাজির হয়ে শরীরটা সারিয়ে নিন, আর এখানে কিছু খোঁজ-খবরও নিন। একটা গুড্ নিউজ দিই সন্টুবাবু তোমাকে, যে বদমাশটা তোমার কাকাবাবুকে গুলি করেছিল সে ধরা পড়ে গেছে।

'ধরা পড়েছে? সে কি বলল? কেন গুলি করেছিল?'

'লোকটা গুংগা...মানে কি যেন বলে, হ্যাঁ, বোবা!'

'বোবা? যাঃ!'

'তাতে কোনও অসুবিধা নেই। ওকে যে পাঠিয়েছিল সে কানেকশন আমরা ঠিক বার করে নেব।'

'নরেনকাকা, এখানে কাকাবাবুর কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। এখন কলকাতায় ফিরে গেলে ভাল হয় না?'

'কলকাতার জন্য মন ছটফট করছে? কেন, ঘুড়ি উড়াবার সিজন বুঝি? আচ্ছা রায়চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে দেখি!'

কাকাবাবু পিঠের নিচে দুটো বালিশ দিয়ে আধ বসা হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘরের মধ্যে পা দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এই যে রাজা, কেমন আছ? তবিয়ত তো বেশ ভালই দেখছি?'

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'এ আবার কে? এই লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা লোকটা কোথা থেকে এল?'

ভার্মা যেন বুকে একটা ঘুসি খেয়ে থমকে গেলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ময়। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'রাজা, আমি নরেন্দ্র, আমায় চিনতে পারছ না?'

কাকাবাবু বললেন, নরঃ নরৌ নরাঃ আর ফলম্ ফলে ফলানি! আর একটা আছে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, গানের আমি কি জানি! আসলে কিন্তু আমি সব জানি। আমায় কেউ ঠকাতে পারবে না।'

নরেন্দ্র ভার্মা হতভম্ব মুখে বললেন, 'এটা, কি ব্যাপার! তুমি কি বলছ, রাজা!'

সন্তু ম্লান গলায় বলল, 'কাকাবাবু কোনও কথা বুঝতে পারছে না। ওই গুলি খাওয়ার জন্য বোধহয় মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে।'

'সর্বনাশ!'

কাকাবাবু আবার ঠাট্টা করে বললেন, 'কি সর্বনাশ? কেন সর্বনাশ? কার সর্বনাশ? তুমি সর্বনাশের কি বোঝ হে ছোকরা।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এ যে খুব খারাপ কেস।'

কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ওঁর দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা যাদুকরের ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি হিপনোটিজম জানি। দেখি তাতে কোনও কাজ হয় কি না! রাজা আমার চোখের দিকে তাকাও! এবার মনে করার চেষ্টা কর, তুমি কে? মনে কর দিল্লীর কথা—তুমি দিল্লীতে গত মাসে আমায় কি বলেছিলে—ডিফেন্স কলোনিতে আমার বাড়িতে—সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল—'

উনি এক পা এক পা করে এগিয়ে কাকাবাবুর চোখের সামনে হাতটা নাড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু একবারও চোখের পলক না ফেলে একই রকম গলায় বললেন, 'বাঃ বেশ নাচতে জান দেখছি। এবার ধেই ধেই করে নাচ তো ছোকরা।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'আশ্চর্য, কোন কাজ হচ্ছে না কেন? আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্, ঘর অন্ধকার করতে হবে। সন্টু জানালা-দরজা বন্ধ করে দাও, আর তোমরাও বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর।'

নার্সকে সঙ্গে নিয়ে সন্তু চলে গেল বাইরে। নরেন্দ্র ভার্মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

।। এগার।।

প্রায় আধঘন্টা বাদে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'না, কিছু হল না! মাথা একদম গড়বড় হয়ে গেছে। আমার কোনও কথাই বুঝতে পারছে না।'

সন্তু উদগ্রীবভাবে দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরে। সে বলল, 'তা হলে এখন কি হবে?'

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কোনও ডক্টর কি তোমার আংকেলকে দেখেছিলেন সন্টু?'

সন্তু বলল, 'না, মানে আমাদের সঙ্গেই তো একজন ডাক্তার এসেছিলেন কলকাতা থেকে। 'ডাক্তার প্রকাশ সরকার। কিন্তু তাঁকে আজ সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'প্রকাশ সরকার—তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

'ভোর থেকেই তাঁকে আর দেখতে পাইনি।'

'এসব কি কারবার চলছে এখানে? তবে তো আর এখানে থাকাই চলে না।'

আমার মনে হচ্ছে এবার কলকাতা ফিরে যাওয়াই ভাল। ওখানে আমাদের চেনা ভাল ডাক্তার আছে।'

'তা ঠিকই বলছ। লেকিন তোমার আংকেল ফিরে যাবেন কী এখানে থাকা পছন্দ করবেন, সেটা তো জানা যাচ্ছে না। উনি তো কোন কথাই ঠিক ঠিক বুঝছেন না।'

'সে-কথা আমিও ভেবেছি, নরেনকাকা। কাকাবাবু কোনও ব্যাপারেই শেষ না দেখে কখনও ফিরে যেতে চান না। কিন্তু এখানে আর তো উপায় নেই? এবার আমাদের ডিফিট, মানে হার স্বীকার করতেই হবে।'

'ডিফিট? কিন্তু লড়াইটা কার সঙ্গে সন্টুবাবু? সেটাই তো এখনও বোঝা গেল না। ঠিক আছে, এবারে কলকাতাতেই চলে যাওয়া যাক। আজ রাত সাবধানে থাক। কাল মর্নিং ফ্লাইটে কলকাতা ব্যাক করব। আমি এখন সার্কিট হাউসে ওয়াপ্‌স যাচ্ছি।

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'রাজা, আমি তবে এখন যাচ্ছি!'

কাকাবাবু হুংকার দিয়ে বললেন, 'গেট আউট!' যত সব রাস্‌কেল এসে গোলমাল করছে এখানে !'

নরেন্দ্র ভার্মার মুখখানা কালো হয়ে গেল। সন্তুরই খুব লজ্জা করতে লাগল কাকাবাবুর ব্যবহারে।

একটু পরেই নরেন্দ্র ভার্মা আবার হাসলেন! জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'ইশ, এমন গুণী মানুষটা একেবারে বেখেয়াল হয়ে গেছে। ভাল করে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। আমি চলি সন্টুবাবু!'

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু আবার চিৎকার করে বললেন, 'কফি! কেউ আমায় এক কাপ কফি খাওয়াতে পারে না?'

সন্তু দৌড়ে নিচে চলে গেল কফির অর্ডার দিতে।

কফি আনবার আগেই নার্সটি গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে কাকাবাবুর মুখ-টুখ মুছিয়ে দিয়েছেন আর জামাও পাল্টে দিয়েছেন।

কাকাবাবু কফি খাওয়ার সময় কোনও কথা বললেন না। শুধু মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখতে লাগলেন সন্তুকে। সন্তুর খুব আশা হল কাকাবাবু তাকে কিছু বলবেন।

কিন্তু কফি খাওয়া শেষ করার পর কাকাবাবু নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চামেলির দিদি?'

নার্স অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চামেলি? চামেলি কে? আমি তো তাকে চিনি না।'

কাকাবাবু তবু জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি চামেলির দিদি। তোমার নাম কি?' নার্স বললেন, আমার নাম সুনীতি দত্ত।'

কাকাবাবু বললেন, 'মোটেই তোমার নাম সুনীতি নয়। তোমার নাম পারুল। সাত ভাই চম্পা জাগ রে, কেন বোন পারুল ডাক রে? এবার বল তো, আমি কে?'

নার্সটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সন্তুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমায় চিনতে পারলে না তো? সিংহের মামা আমি নরহরি দাস, পঞ্চাশটি বাঘ আমার এক এক গেরাস। হালুম!'

নার্স বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আমায় খুব ছেলেমানুষ ভাবছেন, কিন্তু আমার বয়েস চল্লিশ।'

কাকাবাবু আর কিছু না বলে চোখ বুজলেন।

নার্সটি বাইরে চলে এসে সন্তুকেও হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

দু'জনে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াবার পর নার্স জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই, তোমার কাকাবাবুর এই রকম অবস্থা কতদিন ধরে?'

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'বেশিদিন নয়। কারা ওকে বাঘ-মারা গুলি মেরে পালিয়ে গেল—'

'বাঘ-মারা গুলি? বাঘ মারতে আলাদা গুলি লাগে বুঝি?'

'ভুল বলেছি, মাঘ-মারা গুলি নয়। বাঘকে ঘুম পাড়ান গুলি। তারপর থেকেই ওঁর গায়ের জোর সব চলে গেল, আর মাথাতেও গোলমাল দেখা দিল।'

'উনি কিছু মনে করতে পারেন না?'

'না। আমাকেই চিনতে পারছেন না!'

'উনি খুব নামকরা লোক বুঝি? ওঁর জন্য এখানকার পুলিশ আর গভর্নমেন্টের বড় বড় অফিসাররা সব ব্যস্ত দেখছি।'

'হ্যাঁ, উনি খুবই নামকরা লোক।'

আহা, এমন লোকের এই দশা। জান না, এই রকম পাগলরা আর কোনদিন ভাল হয় না।'

সন্তু নার্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাগের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই ভাল হয়। কলকাতায় অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে!'

নার্সটি সমবেদনার সুরে বলল, 'আমি তো ভাই এরকম কেস অনেক দেখেছি, সেইজন্য বলছি। যারা, চেনা মানুষ দেখলে চিনতে পারে না, তারা আর কখনও ভাল হয় না! দ্যাখ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে।'

সন্তুর আর নার্সের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল না। সে সেখান থেকে সরে গেল! সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আকাশটা লাল। সামনের বাগানটা সেই লাল আভায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু সন্তুর আর বাগানে যাবার শখ নেই। বাস্তু সাপ হোক আর যাই হোক, অত বড় সাপের কাছাকাছি সে আর যেতে চায় না।

সন্ধ্যেবেলা দেববর্মন এলেন খবর নিতে!

কাকাবাবু সেই একভাবে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সেইজন্য দেববর্মন আর ওকে বিরক্ত করলেন না। সন্তুর সঙ্গে একটুক্ষণ গল্প করার পর বললেন, 'আমি তা হলে নরেন্দ্র ভার্মার কাছেই যাই। তোমরা যদি কাল চলে যাও, তা হলে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। রাত্তিরটা তাহলে ঘুমিয়ে নাও ভাল করে। মর্নিং ফ্লাইটে গেলে খুব ভোরে উঠতে হবে। এই নার্স সারারাতই থাকবে এখানে।'

ন'টার মধ্যে রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা শুয়ে পড়ল। কাকাবাবু আর এর মধ্যে একটাও কথা বলেননি। সন্তু অনেকবার ভেবেছিল, কাল কলকাতায় ফিরে যাবার কথা কাকাবাবুকে জানাবে কি না। শেষ পর্যন্ত আর বলতে ভরসা পায়নি। কাকাবাবু হয়তো কিছুই বুঝতে পারবেন না, শুধু শুধু আবার উল্টোপাল্টা কথা শুনতে হবে। কাকাবাবুর মুখে ছেলেমানুষি কথা শুনতে সন্তুর একটুও ভাল লাগে না।

কিছুক্ষণ বারান্দার আলো জ্বেলে সন্তু এডহাউসের লেখা 'আংকল ডিনামাইট' নামে একটা মজার বই পড়ার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। কিন্তু এই পরিবেশে সে মজার বইতে মন বসাতে পারছে না! এক সময় সে শুয়ে

পড়ল কাকাবাবুর পাশের খাটে। নার্স বসে রইলেন চেয়ারে, ওই ভাবেই উনি সারারাত জেগে থাকবেন।

মাঝরাত্রে একটা চেঁচামেচির শব্দ শুনে সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল। সামনের বাগানে কে যেন কাঁদছে।

সন্তু মাথার কাছে টর্চ নিয়েই শুয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেই টর্চটা নিয়ে ছুটে গেল বারান্দায়। আলো ফেলে দেখল, একটা লোক কাঁপা গলায় বলছে, বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল!'

তক্ষুনি সন্তু বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী। একটা কোনও চোর এসে বাগানে লুকিয়ে ছিল। সে পড়েছে ওই বাস্তু সাপের পাল্লায়। চোর, না শত্রুপক্ষের কোনও লোক?

সাদা পোশাকের পুলিশ দুজনও ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই। তাদের নজর এড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে সাপটার কাছে।

এইবার পুলিশ দুজনের সাড়া পাওয়া গেল। সন্তুও নেমে গেল নিচে।

পুলিশ দু'জন টর্চের আলো ফেলে জিজ্ঞেস করছে কে? তুমি কে? বাগানে ঢুকেছ কেন?

ভয়ে পুলিশ দুজনও রাত্তিরে বাগানে ঢুকতে চাইছে না। সেই লোকটার গলা নেতিয়ে আসছে, বোধহয় এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আলো ফেলে সন্তু দেখল সাপটা ওই লোকটার একটা পা জড়িয়ে আছে। কিন্তু কামড়ায়নি। ফণাটা লকলক করছে বাইরে! বাস্তু সাপের গুণ আছে বলতে হবে।

দু'তিনটে টর্চের আলো পড়ায় সাপটা আস্তে আস্তে লোকটাকে ছেড়ে পাশের ঝোপের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। লোকটা টলতে টলতে ছুটে এল এদিকে।

একজন পুলিশ লোকটার কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে?'

কিন্তু লোকটা উত্তর দেবার অবসর ও পেল না। ঠিক সেই সময় প্রচন্ড শব্দ করে একটা ট্রেকার ঢুকল গেট পেরিয়ে। গেট কি করে খোলা ছিল তা বোঝা গেল না।

সন্তু ভাবল, 'নিশ্চয়ই নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা দেববর্মনরা কেউ এসেছেন জরুরি কোন খবর নিতে।

ট্রেকারটা বাড়ির সামনে এসে যাবার আগেই তার থেকে টপাটপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল পাঁচ-ছ'জন লোক। প্রত্যেকের মুখে সরু মুখোশ আঁটা। তাতে তাদের চোখ দেখা যায় না। সবাইকে এক রকম দেখায়। একজনের হাতে একটা মেশিনগান, অন্য দু'জনের হাতে রিভলবার! পুলিশ দু'জনের

একজন সন্তুর মুখ চেপে ধরল

বুকের কাছে রিভলবার ঠেকিয়ে ওদের দু'জন বলল, 'মরতে যদি না চাস তো চুপ করে থাক।'

সন্তু এরই মধ্যে তীরের মতন ছুটে উঠে গেল দোতলায়। কাকাবাবুর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাঁপাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল দুম দুম করে।

নার্সটি নিজেই খুলে দিল দরজার ছিটকিনি। তিনজন লোক একসঙ্গে ঢুকে পড়ল, তাদের একজনের হাতে মেসিনগান। একজন সন্তুর মুখ চেপে ধরল। মেসিনগানধারী বলল, 'চলুন মিঃ রায়চৌধুরী।'

গোলমালে কাকাবাবু জেগে উঠে চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন, এবারে বললেন, 'রাত দুপুরে ভূতের উপদ্রব!'

আগন্তুকদের একজন বলল, 'নার্স, তোমার পেসেন্টকে তৈার করে নাও, এক্ষুনি যেতে হবে।'

নার্স বললেন, সব তৈরিই আছে। আমি চট করে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছি।'

নার্স একটা সিরিঞ্জ বার করে কাকাবাবুর ডান হাতে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া মাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ওরা দু'জনে কাকাবাবুকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল। সন্তুকেও অন্য লোকটি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল বাইরে।

মাত্র দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ট্রেকার গাড়িটি ওদের তুলে নিয়ে আবার স্টার্ট দিল।

॥ বার ॥

গাড়িটা গেস্ট হাউসের গেট ছাড়িয়ে বাইরে পড়বার পর লোকগুলো দুটো কালো কাপড় দিয়ে কাকাবাবু আর সন্তুর চোখ বেঁধে দিল। কাকাবাবুর তো বাধা দেবার কোনও ক্ষমতাই নেই, সন্তুও বুঝল বাধা দেবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।

নার্স সুনীতি দত্ত এদের সঙ্গেই এসেছে আর লোকগুলোর সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছে। এই নার্স তাহলে শত্রুপক্ষেরই লোক। কাকাবাবুর মাথার গোলমাল হলেও এটা তো ঠিকই বুঝেছিলেন। এই জন্যই তিনি বলেছিলেন যে, এই নার্স হচ্ছে চামেলির দিদি।

সন্তু কাকাবাবুকে কোনদিন গান গাইতে শোনেনি। কিন্তু এখন এই চলন্ত গাড়িতে কাকাবাবু গুনগুন করে গান ধরেছেন। মেশিনগান ও রিভলভার-ধারী কয়েকজন দস্যুর সঙ্গে যে তিনি বসে আছেন সে-ব্যাপারে যেন তাঁর

কোন দুশ্চিন্তাই নেই। অথচ সন্তুর বুকের মধ্যে ধকধক করছে। কাকাবাবু যে গান গাইছেন, তার সুরও যেমন বেসুরো, কথাগুলোও অদ্ভুত।

কাকাবাবু গাইছেন ঃ

যদি যাও বঙ্গে
কপাল তোমার সঙ্গে
ত্রিপুরায় যারা যায়
তারা খুব কাঁঠাল খায়।
ধর্মনগর উদয়পুর
কোনদিকে আর কতদূর।

এই রকম আরও কী সব যেন কাকাবাবু একটানা গেয়ে যেতে লাগলেন, সন্তু বুঝতে পারল না গাড়ির আওয়াজে। গাড়িটা যে খুব জোরে ছুটছে, তা বোঝা যায়। সন্তু মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। ঘন্টায় কত মাইল? পঞ্চাশ! ষাট? রাত্তিরবেলা রাস্তা ফাঁকা, আরও বেশি হতে পারে! এই রকম বিপদের মধ্যেও মানুষের ঘুম পায়? কাকাবাবু অনেকক্ষণ চুপচাপ। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সন্তুরও ঝিমুনি এসেছিল খানিকটা, হঠাৎ আবার ধড়ফড় করে উঠে বসল।

আর অমনি একজন কেউ তার মাথায় একটা চাপড় মেরে বলল, চুপ করে বসে থাক। অত ছটফটানি কিসের?'

অন্যান্যবারে সন্তু এর চেয়েও বেশি বিপদের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু আগে সব সময়ই মনে হয়েছে, কাকাবাবু কিছু না কিছু একটা উপায় বার করবেনই। কিন্তু এবারে কাকাবাবুরই তো মাথার ঠিক নেই। এবারে আর উদ্ধার পাওয়া যাবে কি করে?

কাকাবাবুর মতন একজন অসুস্থ লোককে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এই লোকগুলো এত ব্যস্ত কেন, তাও সন্তু বুঝতে পারছে না। পুরনো কোনও শত্রুতা?

গাড়ির গতি কমে এল আস্তে-আস্তে। তারপর থামল এক জায়গায়। সন্তুর চোখ বাঁধা। তাকে এখন কি করতে হবে সে জানে না।

একজন লোক সন্তুর হাত ধরে ট্রেকার থেকে নিচে নামল।

একজন কেউ হুকুমের সুরে বলল, 'ছেলেটার চোখ খুলে দাও, কিন্তু হাত বেঁধে রাখ ওর। খেয়াল রেখ ও কিন্তু মহা বিচ্ছু ছেলে!'

সন্তুর চোখের বাঁধন খুলে দেবার পর সে দেখল অনেক গাছপালার মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে থেমেছে তাদের গাড়ি। সেই বাড়ির দরজার

কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেশ লম্বা মতন লোক, নস্যি রঙের স্যুট পরা, চোখে কালো চশমা। অন্ধ ছাড়া আর কেউ যে রাত্তিরে কালো চশমা পরে, তা সন্তু আগে জানত না।

একজন লোক কাকাবাবুর হাত ধরে নিচে নামাতে গেল। কাকাবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। বেশ জোরেই পড়েছেন, কারণ সন্তু টকাশ করে ওঁর মাথা ঠুকে যাবার শব্দ পেল।

কালো চশমা পরা লম্বা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, 'ইডিয়েট।' সাবধানে! জান না, ওর এক পায়ে চোট আছে। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না! একজন ওর মাথার কাছে রিভলবার ধরে থাক, কখন যে কী করবে ঠিক নেই। ওকে সার্চ করেছ?'

দু'জন লোক কাকাবাবুকে সাবধানে দাঁড় করিয়ে দিল। একজন বলল, 'হ্যাঁ, সার্চ করে দেখেছি, কাছে কোনও ওয়েপন্ নেই।'

কাকাবাবুর গায়ে স্লিপিং সুট। খালি পা! আছাড় খাবার সময় নিশ্চয়ই খুব ব্যথা লেগেছে। কিন্তু তাঁর যেন সে বোধই নেই। তিনি আবার গুনগুন করে গান ধরলেন ঃ

যদি যাও বঙ্গে
কপাল তোমার সঙ্গে
যারা যায় ত্রিপুরায়
যখন-তখন আছাড় খায়...।

লম্বা, কালো-চশমা পরা লোকটি বিস্ময়ে একটা শিস দিয়ে উঠল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, 'গান গাইছ, অ্যাঁ? কী রায়চৌধুরী, নেশা-টেশা করেছ নাকি?

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'পি লে, পি লে, হরিনাম কা পেয়ালা ... ঠুন ঠুন ঠুন। মাতোয়ালা, মাতোয়ালা, হরিনাম কা পেয়ালা!'

লোকটি এক হাত বাড়িয়ে কাকাবাবুর থুতনি ধরে উঁচু করে বললেন, 'ওসব নকশা ছাড়। কী রায়চৌধুরী, আমায় চিনতে পার?'

কাকাবাবু, এক দৃষ্টে লোকটির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'চেনা চেনা লাগছে। তুমি পান্ত ভূতের জ্যান্ত ছানা না?'

লোকটি ঠাস করে এত জোরে চড় মারল কাকাবাবুর গালে যে, কাকাবাবুর মুখটা ঘুরে গেল। তারপর অন্য গালে ঠিক তত জোরে আবার একটা চড় মেরে লোকটা বলল, 'এবার নেশা কেটেছে? এবার ভাল করে দ্যাখ তো চিনতে পার কিনা?

কাকাবাবু আবার লোকটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। সেই একই

রকম গলায় বললেন, 'হুঁ, আগের বারে ভুল হয়েছিল! তুমি আসলে রামগড়ুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে হাসব, না না না।'

লোকটি আবার মারবার জন্য হাত তুলতেই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মারবেন না, মারবেন না। উনি সাংঘাতিক অসুস্থ।'

সন্তু দারুণ চমকে উঠল। এ তো ডাক্তার প্রকাশ সরকারের গলা!'

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে সন্তু তাকে দেখতে পেল না। বেশি খুঁজবারও সময় নেই। সন্তু আবার এগিয়ে তাকাল!

কালো-চশমা পরা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'রায়চৌধুরী অতি ধুরন্ধর। ওসব ভেক আমি জানি। ওর পেটের কথা আমি ঠিক বার করবই। দেখি ও কত মার সহ্য করতে পারে।

লোকটি আবার এক চড় কষাতে গেল কাকাবাবুকে। তার আগেই সন্তু ছুটে গিয়ে এক ঢুঁ মারল লোকটার পেটে। আচমকা আঘাত পেয়ে লোকটা তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে অন্য দু'জন লোক এসে চেপে ধরল সন্তুকে। একজন তার কপালের ওপর রিভলভারের নল চেপে ধরল।

লম্বা লোকটি উঠে পোষাক থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, বলেছিলুম না, এটা একটা শয়তানের বাচ্চা। ওর ব্যবস্থা আমি পরে করছি। আগে বুড়োটাকে টিট করি।'

কাকাবাবু এইসব কোনও ব্যাপারেই একটুও বিচলিত হয়নি। মুখে এখনও মৃদু-মৃদু হাসি। লম্বা লোকটি তাঁর মুখোমুখি হতেই তিনি বললেন, 'তা হলে কি ঠিক হল? তুমি পান্ত ভুতের ছানা, না রামগড়ুড়ের ছানা?'

লম্বা লোকটি অতি কষ্টে রাগ দমন করে বলল, রায়চৌধুরী, তোমার সঙ্গে আমি এক তাঁবুতে কাটিয়েছি সাত দিন। তুমি আমায় চিনতে ঠিকই পারছ। তুমি ভালয় ভালয় জঙ্গলগড়ের সন্ধানটা দিয়ে দাও। তারপর তোমায় ছেড়ে দেব। নইলে এখান থেকে তোমার বেঁচে ফেরার কোনও আশাই নেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'জঙ্গলগড়? সে আবার কি? এর কথা তো সুকুমার রায় লিখে যায়নি? জঙ্গলগড়ের বদলে তুমি চণ্ডীগড়ে যেতে চাও? কিংবা গড়মান্দারণপুর?'

লম্বা লোকটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, এদের ওপরে নিয়ে চল। হাত-পা বেঁধে রাখবে। তারপর আমি দেখছি।'

।। তেরো।।

কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না জেনেও দু'জন লোক দু'দিক থেকে কাকাবাবুর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। কাকাবাবুর খুবই ব্যথা লাগছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি কিছুই বলছেন না। সন্তুও যে কিছু করবে তার উপায় নেই। আর দু'জন লোক তার জামার কলার ও চুলের মুঠি ধরে আছে। তার নড়বার উপায় নেই।

মুখোশধারীরা দোতলায় একটা হলঘরে নিয়ে এল ওদের। হলঘরটায় একটি মাত্র চেয়ার ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। কাকাবাবুকে এনে বসিয়ে দেওয়া হল সেই চেয়ারে। হাত-বাঁধা অবস্থায় সন্তুকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হল তার পায়ের কাছে।

বাকি লোকগুলো ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে শুধু টিম টিম করে একটা কম-পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মনে হয়, এ বাড়িতে অন্য সময় কোনও মানুষজন থাকে না।

নস্যি রঙের সুট পরা লোকটি ঘরে ঢুকল সবার শেষে। হুকুমের সুরে বলল, সর! সরে যাও, সামনে থেকে!'

অমনি অন্যরা সরে গিয়ে সামনে জায়গা করে দিল।

লোকটি কাকাবাবুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল কোমরে দু'হাত দিয়ে। ঠিক সিনেমার ভিলেনের মতন। চোখ থেকে এখনও কালো চশমাটা খোলেনি। একটুক্ষণ কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করল, 'রাজা রায়চৌধুরী, তুমি আমার সামনে ভরং করে থেক না। তাতে কোনও লাভ হবে না। শোন, তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। আমি যা চাই, তুমি যদি ভালয় ভালয়—'

কাকাবাবু মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'ডাবের জল! আমি একটু ডাবের জল খাব।'

লম্বা লোকটি হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'ডাবের জল?'

পাশ থেকে তার এক অনুচর বলল, 'এদিকে তো ডাব পাওয়া যায় না।'

লম্বা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কর। ডাবের জল কেন, এখন কোনও জলই ওকে দেওয়া হবে না।'

কাকাবাবু বললেন, 'জল দেবে না তাহলে জলপাই দাও। এখানে ডাব পাওয়া যায় না কিন্তু জলপাই তো পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে একটু নুন দিও!'

লম্বা লোকটি ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল। রাগে তার হাত কাঁপছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে মশকরা করবার জন্য

আমি রাতদুপুরে ধরে এনেছি? আমার কথার সোজাসুজি উত্তর দাও, আমি তোমাদের ছেড়ে দেব। নইলে—'

কাকাবাবু বললেন, তুমি কে বাপু? নইলে বলে থেমে রইলে? কালো চশমায় চক্ষু ঢাকা, গোঁফখানি তো ফড়িং-পাখা!'

লোকটি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর বাঁ হাতখানা তুলে তালুতে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরল!

কাকাবাবু হাত অসাড়, তাই তিনি কোনও ব্যথা পেলেন না, মুখে টুঁ শব্দও করলেন না। কিন্তু সন্তু ওই কাণ্ড দেখে শিউরে উঠল।

তখন মুখোশধারীদের পেছন থেকে ঠেলে সামনে এসে প্রকাশ সরকার বলল, 'দেখুন, রাজকুমার, আমি একজন ডাক্তার। আমি ওঁর সাথে ছিলাম। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, ওঁর মাথায় সত্যিই গোলমাল হয়েছে। উনি কিছুই মনে করতে পারছেন না। ওঁর ওপর অত্যাচার করে কোনও লাভ হবে না।'

'তাহলে তোমার মতে কি করা উচিত এখন?'

এখন ওঁর চিকিৎসা করান উচিত। পরপর কয়েকদিন টানা ঘুমলে উনি একটু সুস্থ হতে পারেন।'

'সে সময় আমার নেই!'

'কিন্তু অত্যাচার করলে ফল খারাপ হবে!'

নার্স সুনীতি দত্ত বললেন, দেখুন, আমিও তো আজ সারাদিন ধরে ওঁকে ওয়াচ করেছি। উনি সত্যিই এখন মানসিক রুগী। নিজের ভাইপোকেও চিনতে পারেন নি। দিল্লী থেকে ওঁর এক বন্ধু এসেছিলেন, তাঁকেও কি সব গালমন্দ করলেন।

লম্বা লোকটি আরও রেগে গিয়ে বলল, 'মাথা খারাপ হয়েছে? বললেই হল? জান, জঙ্গলগড়ের চাবি কোথায় আছে? আর কোথাও নেই, আছে ওর মাথার মধ্যে! কর্ণেল।'

মুখোশধারীদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার?'

'শোন, যে করেই হোক ওর কাছ থেকে কথা বার করতে হবে।'

যে লোকটিকে কর্ণেল বলে ডাকা হল, তার অবশ্য মিলিটারিদের মতন পোশাকও নয়, তার মিলিটারি গোঁফও নেই। এমনই সাধারণ চেহারার একটা লোক।

সে বলল, স্যার, জঙ্গলগড় জায়গাটা আসলে কোথায়? আমরা তো এদিকে জঙ্গলগড় বলে কোনও কিছুর নাম শুনিনি!'

লম্বা লোকটি ভেংচি কেটে বলল, 'সে কথা আমি তোমায় বলে দি, আর

তুমি তারপর আমায় পেছন থেকে ছুরি মার, তাই না? তখন নিজেই তার লোভে পাগল হয়ে উঠবে। শোন, জঙ্গলগড়ের ভেতরের জিনিসের ওপর একমাত্র আমারই বংশগত অধিকার আছে। আর কারুর নেই। এই লোকটা বাগড়া না দিলে এতদিন আমি সবকিছু পেয়ে যেতাম।'

কাকাবাবু হেসে বললেন, জঙ্গলগড় নয়, জঙ্গলগড় নয়, বোম্বাগড়! এতক্ষণে চিনলাম, তুমি হলে বোম্বাগড়ের রাজা। আর তুমি খাও আমসত্ত্ব ভাজা!'

লম্বা লোকটি ঝট করে কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আর তুমি কি খাও, তা মনে আছে? তুমি ছাগলের মতন কাগজ খাও! তুমি আমাদের ম্যাপটা খেয়ে ফেলেছিলে।'

কর্ণেল নামের লোকটা বলল, 'ম্যাপ খেয়ে ফেলেছিল?'

হ্যাঁ। বলতে গেলে আমারই চোখের সামনে। অ্যাত্ত বড় একটা তুলোট কাগজের ম্যাপ। আমি সেটা গায়েব করার আগেই ও সেটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে মুখে পুরে দিল! ম্যাপটা আগেই ও মুখস্থ করে ফেলেছিল। এখন ও ছাড়া আর কেউ সে পথের হদিস দিতে পারবে না।'

'হয়তো এই বুড়োটা সেই ম্যাপ আবার অন্য কোন জায়গায় এঁকে রেখেছে!'

'না! ও অতি শয়তান। সে সুযোগ ও দেবার পাত্র নয়! ওরা আগরতলায় চলে আসবার পর আমার লোকেরা ওদের কলকাতার বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। সেখানে কিছু নেই। দিল্লীতেও পাঠায়নি, সেখানেও আমাদের লোক রেখেছি। সুতরাং ম্যাপটা ওকে দিয়েই আঁকাতে হবে। কিংবা ও নিজেই যদি গাইড হয়ে আমাদের পথের সন্ধান দিতে রাজি হয়—'

তারপর সে কাকাবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কী রায়চৌধুরী, রাজি?'

কাকাবাবু বললেন, 'এক থালা সুপারি গুনতে নারে ব্যাপারি, বল তো কি? কিংবা এইটা পারবে? চক্ষু আছে মাথা নেই, রস খাব, পয়সা কোথা পাই?'

কালো চশমা হুংকার দিয়ে বলল, কর্ণেল! তোমার ছুরিটা বার কর।

কর্ণেল সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ফোল্ডিং ছুরি বার করল। তার স্প্রিং টিপতেই চকচকে ফলাটা বেরিয়ে এল।

কালো-চশমা বলল, 'ওই ছুরি দিয়ে ওর বুক চিরে দাও, দেখি তাতে ওর মুখ খোলে কি না।

কাকাবাবুর জামার বোতামগুলো খুলে বুকটা ফাঁক করে ফেলল কর্ণেল। ছুরিটা খুব আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে বুকে ঠেকাল।

সন্তু সেই সময় ছটফট করে উঠতেই লম্বা লোকটির ইশারায় দু'জনে গিয়ে চেপে ধরে রইল তাকে।'

কর্ণেল জিজ্ঞেস করল, 'কতটা ঢোকাব ছুরি—'

'রক্ত বার করো।'

কর্ণেল হাল্কাভাবে একটা টান দিতেই লম্বা রেখায় রক্ত ফুটে উঠল কাকাবাবুর বুকে।

কাকাবাবু যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। অবাক হয়ে দেখছেন এই সব কাণ্ড-কারখানা। তাঁর মুখে কোনরকম যন্ত্রণার চিহ্নই নেই।

প্রকাশ সরকার আবার এগিয়ে এসে ব্যাকুলভাবে বলল, আমি ডাক্তার আমার কথাটা শুনুন। এভাবে কথা আদায় করা যাবে না। ওঁর মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

লম্বা লোকটি বলল, 'হুঁ তোমার যে দেখছি খুব দরদ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমিও থাক এখানে। কী করে পাগল জব্দ করতে হয় আমি জানি। কর্ণেল উঠে এস। এই তিনটিকে এখানেই আটকে রেখে দাও এদের খাবার দেবে না, জল দেবে না, এমন কি ডাকলে সাড়াও দেবে না। শুধু বাইরে থেকে পাহারা দেবে! দেখি কতক্ষণ লাগে শিরদাঁড়া ভাঙতে!

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একে একে। কালো-চশমা পরা লোকটা দরজার কাছ থেকেও ফিরে এল আবার।

কাকাবাবুর মুখের কাছে মুখ এনে চরম বিদ্রুপের সুরে বলল, 'রায়চৌধুরী, আমি বাজি ফেলতে পারি, তুমি চব্বিশ ঘন্টাও তোমার জেদ বজায় রাখতে পারবে না। আর যদি সত্যিই তুমি পাগল হয়ে থাকো তবে সেইদোষে এই দু'জনও খিদে তেষ্টায় ছটফট করে মরবে! আমার কোনও দয়ামায়া নেই।'

কাকাবাবু নড়বড়ে অবশ হাত দুটি এবারে বিদ্যুতের মতন উঠে এল ওপরে! তিনি বজ্রমুষ্টিতে লম্বা লোকটির গলা চেপে ধরে প্রকাশ সরকারকে বললেন, 'শিগগির দরজাটা বন্ধ করে দাও ভেতর থেকে।'

।।চৌদ্দ।।

কাকাবাবু বজ্রমুষ্টিতে গলা চেপে ধরায় লম্বা লোকটা দু'বার মাত্র আঁ আঁ শব্দ করল। একটা হাত কোটের পকেটে ভরে কিছু একটা বার করে আনবার চেষ্টা করেও পারল না। তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

কাকাবাবু ওর অচৈতন্য দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে প্রকাশ সরকারকে

বললেন, 'বললুম যে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এস! এক্ষুনি ওর দলের লোকেরা ফিরে আসবে!'

প্রকাশ সরকার এতই অবাক হয়ে গেছে যে, নড়তেই পারছে না যেন। সন্তুরও সেই অবস্থা।

এবার প্রকাশ সরকার দৌড়ে গেল দরজা বন্ধ করতে। কাকাবাবু নিচু হয়ে সন্তুর হাতের বাঁধন খুলে দিতে লাগলেন।

সন্তুর এমন অবস্থা যে, সে যেন কথাই বলতে পারছে না। কথা বলতে গেলেই যেন তবু ফুঁপিয়ে কান্না এসে যাবে। তার এত আনন্দ হচ্ছে।

প্রকাশ সরকার দরজা বন্ধ করে এসে বলল, 'স্যার আপনি ভাল হয়ে গেছেন? মিরাকুলাস ব্যাপার! শুনেছি, সাড্‌ন শক্‌ পেলে এরকম হতে পারে!'

কাকাবাবু বললেন, 'এই লোকটার কোটের পকেটে রিভলবার আছে। সেটা বার করে আমায় দাও।

প্রকাশ সরকার বেশী তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই এমনই উল্টোপাল্টা করতে লাগল যে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটার কোটের পকেটই সে খুঁজে পেল না।

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, শিগগির! যে কোনও মুহূর্তে ওঁর জ্ঞান ফিরে আসবে।'

শেষ পর্যন্ত প্রকাশ সরকার রিভলবার খুঁজে পেল। কাকাবাবু সেটা হাতে নিয়ে তাতে গুলি ভরা আছে কি না চেক করে দেখলেন।

এবার সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, আসলে আপনার কিছুই হয়নি, তাই না?'

প্রকাশ সরকার বলল, 'অভিনয়? মানুষ এরকম অভিনয় করতে পারে?

কাকাবাবু মুচকি হাসলেন।

প্রকাশ সরকার বলল, 'সত্যিই স্যার, আপনার কিছু হয়নি? আপনি আমাদের পর্যন্ত ঠকিয়েছেন?'

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, আপনি ইচ্ছে করে এরকম সেজেছিলেন, নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য ছিল!'

কাকাবাবু বললেন, 'হাত দু'টো ক'দিনের জন্যে সত্যিই অসাড় হয়ে গিয়েছিল রে! পরশু থেকে হঠাৎ আবার ঠিক হয়ে গেল, তখন ভাবলুম কিছুদিন ওইরকম সেজে থাকা যাক!'

প্রকাশ সরকার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মাথাতেও তাহলে কোনও গোলমাল হয়নি?'

কাকাবাবু নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'মাথাটায় খুব ব্যথা

করত মাঝে মাঝে। এক এক সময় ভাবতুম, পাগলই হয়ে যাব নাকি। তা সত্যি সত্যি কি আমি পাগল হয়েছি? তোমাদের কি মনে হয়?'

'স্যার, আপনার হাতের তালুতে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরল, তবু আপনি একটু মুখ বিকৃত করলেন না। এটা কি করে সম্ভব?'

কাকাবাবু বললেন, 'ইচ্ছে করলে সবই পারা যায়।'

বাঁ হাতটা দেখলেন তিনি। সেখানে একটা বড় ফোসকা পড়ে গেছে এর মধ্যেই।

এই সময় দরজায় দুমদুম ক'রে ধাক্কা পড়ল। বাইরে থেকে সেই কর্ণেল উত্তেজিতভাবে ডাকল, 'রাজকুমার! রাজকুমার!'

প্রকাশ সরকার বিবর্ণ মুখে বলল, 'সাড়া না পেলে ওরা তো দরজা ভেঙে ফেলবে ওদের দলে অনেক!'

কাকাবাবু বললেন, চিন্তার কিছু নেই। নরেন্দ্র ভার্মা পুলিশ নিয়ে এক্ষুনি এসে পড়বে!'

সন্তু বলল, 'নরেনকাকা? তিনি কি করে জানবেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'তাকে বলা আছে, আমাকে ধরে নিয়ে আসার পর ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে যেন না আসে। এদের পালের গোদাটা কে, তা জানা দরকার। আধঘন্টার মধ্যেই ভার্মা আসবে।'

প্রকাশ সরকার বলল, 'কিন্তু, আপনি এতবড় ঝুঁকি নিলেন? এরা অতি সাংঘাতিক লোক। আগেই যদি আপনাকে মেরে ফেলত?'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমাকে ওরা মারবে কেন? আমি মরে গেলেই তো ওদের দারুণ ক্ষতি! জঙ্গলগড়ের চাবি কোথায় আছে জান? আর কোথাও নেই, আছে আমার মাথার মধ্যে। আমাকে মারলে ওদের এত কাণ্ড করা সব ব্যর্থ হয়ে যেত। জঙ্গলগড়ের সন্ধান আর কেউ পেত না!'

দরজায় আবার জোরে জোরে ধাক্কা পড়ল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'এই রাজকুমার কে? ওকে আপনি আগে চিনতেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'রাজকুমার না ছাই! এখানে এরকম গণ্ডায় গণ্ডায় রাজকুমার আছে। অনেক রাম-শ্যাম-যদুও নিজেকে রাজকুমার বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ-ও ঠিক পালের গোদা নয়। আর একজন কেউ আছে। আমারই ভুল হল, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলুম না।'

দরজায় দমাস দমাস শব্দ হচ্ছে। ওরা কোনও ভারি জিনিস দিয়ে দরজায় আঘাত করছে। কিন্তু পুরনো আমলের শক্ত কাঠের উঁচু দরজা। ভাঙা সহজ নয়।

কাকাবাবু বললেন, 'ওই লোকটিকে টেনে আমার কাছে নিয়ে এস।'

সন্তু আর প্রকাশ সরকার লোকটিকে ধরাধরি করে কাকাবাবুর পায়ের কাছে নিয়ে আসতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে তার চুলের মুঠি ধরে অন্য হাতে রিভলভারের ডগাটা তার ঘাড়ে ঠেকালেন। তারপর বললেন, 'এই যে রাজকুমার ঘুম ভেঙেছে?'

লোকটি হাত তুলে নিজের গলায় বুলোতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, 'উঁহু, নড়াচড়া একদম চলবে না। পট্ করে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। আমি দেখে নিয়েছি, ছ'খানা গুলি ভরা আছে।'

লোকটি বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী, তা হলে তুমি পাগল হওনি! যাক, সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু তুমি কি এরকমভাবে জিততে পারবে? আমার লোক এক্ষুনি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আসুক না, তাতে কোনও চিন্তা নেই। শোন, আমি সিগারেট খাই না। না হলে তোমার হাতে আমারও সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া উচিত ছিল।'

প্রকাশ সরকার বলল, 'স্যার, আমার কাছে সিগারেট আছে। ধরাব?'

লোকটি কটমট করে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার আমি সর্বনাশ করে দেব।'

প্রকাশ সরকার বলল, 'আপনি যা খুশি করতে পারেন, আর আমি ভয় পাই না!'

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে কাঁচুমাচুভাবে বলল, 'দেখুন, আমি কিন্তু ওদের দলের নই। সেদিন সকালবেলা আমার এক বন্ধুর নাম করে এদের লোক আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর এখানে ধরে নিয়ে আসে। আমার একটা গোপন ব্যাপার এরা জানে, সে কথা বলে ওরা ভয় দেখিয়েছে। সব কথা আপনাকে আমি পরে বলব।'

দরজার খিলটা এবার মড়মড় করে খানিকটা ভেঙে গেল। এবার ওরা ভেতরে ঢুকে আসবে।

সন্তু বলল, 'আমি আর প্রকাশদা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াব?'

কাকাবাবু বললেন, 'কোনও দরকার নেই তোরা দুজনে বরং দেওয়ালের দিকে সরে দাঁড়া! হঠাৎ গুলি ছুঁড়লে তোদের গায়ে লাগতে পারে।'

দরজা ভেঙে প্রথমেই এক হাতে ছুরি আর অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে ঢুকল 'কর্ণেল', তারপর আরও চার-পাঁচজন লোক!'

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আর এক পা-ও এগিও না। তাহলে

এই যে রাজকুমার ঘুম ভেঙেছে

তোমাদের রাজকুমারের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ওহে রাজকুমার, তোমার লোকদের বল পিছিয়ে যেতে!'

'রাজকুমার নামের লোকটি হেসে উঠল হো-হো করে! তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী, তুমি আমার গলা টিপে অজ্ঞান করে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছ বলেই জিততে পারবে? কর্ণেল, এগিয়ে এস!'

কাকাবাবু বললেন, 'সাবধান! আমি সত্যি গুলি করব। প্রথমে তোমাকে, তারপর ওদের!'

রাজকুমার অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'মিথ্যে ভয় দেখালেই আমি ভয় পাব? রাজা 'রায়চৌধুরীকে আমি ভাল করেই জানি, সে কখনো কোনও মানুষ খুন করতে পারবে না। তুমি আমায় কেমন মারতে পার দেখি তো। কর্ণেল, এ যদি আমায় মেরেও ফেলে, তবু তোমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের ধরে ফেল!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি ঠিক তিন গুনব। তারপর...'

রাজকুমার বলল, 'কর্ণেল, ওর কথায় বিশ্বাস কোর না! ও গুলি করে আমায় কিছুতেই মারবে না আমি জানি। তোমরা এগিয়ে এস!

।। পনের।।

সন্তুর বুকের মধ্যে যেন কালবৈশাখীর ঝড় বইছে! এখুনি একটা কিছু সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। কাকাবাবু কি ঠাণ্ডা মাথায় একটা লোককে সত্যিই গুলি করে মেরে ফেলতে পারবেন? কাকাবাবু যে ভয় দেখাচ্ছেন, তা কি ওই 'কর্ণেল' নামের লোকটা বিশ্বাস করবে?'

একবার সে চট করে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকাল। প্রকাশ সরকারও সন্তুর মতন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে একটু একটু সরে যাবার চেষ্টা করছে পাশের বারান্দার দিকে। বারান্দার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে প্রকাশ সরকারের। সন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে সন্তুকে ইশারা করল এদিকে সরে আসার জন্য।

কর্ণেল আর তার পেছনে তিনজন লোক একটু ঝুঁকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন যে-কোন সময় তাঁরা বাঘের মতন কাকাবাবুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাজকুমারের ঘাড়ে রিভলভারের নলটা ঠুসে ধরে কাকাবাবু বললেন, 'আমি শেষবার বলছি, আর এক পা-ও এগোবে না। আমি ঠিক তিন পর্যন্ত গুনব তারপরই গুলি করব!'

রাজকুমার বলল, 'ওর কথা গ্রাহ্য কোর না কর্ণেল। এগিয়ে এসে ওকে ধর!'

কাকাবাবু বললেন, 'এক!'

কর্ণেল তবু এক পা এগিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, 'দুই।'

রাজকুমার বলল, 'কর্ণেল, তুমি শুধু শুধু দেরি করছ কেন? ভয় পাচ্ছ নাকি? আমি তো বলছি, ভয় নেই!'

কাকাবাবু বললেন, তোমরা আমায় চেন না! আমি কখনও স্বেচ্ছায় ধরা দিই না। আর আমার ওপর কেউ অত্যাচার করলে তার প্রতিশোধ আমি না নিয়ে ছাড়ি না। রাজকুমার, তুমি আমার গালে চড় মেরেছ, আমার হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছ। এর শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। শাস্তি আমি নিজে হাতে দিতে চাই না, পুলিশের হাতে তোমায় তুলে দেব। তোমার ভালর জন্যই বলছি, এই লোকগুলোকে চলে যেতে বল! ওরা যদি আর এগিয়ে আসে, তা হলে তোমাকে আমি শেষ করে দিতে বাধ্য হব।'

এবার কর্ণেল বলল, শুনুন মশাই। আপনি তো অনেক কথা বললেন, এবারে আমি একটা কথা বলি। আপনি যদি বাইচান্স রাজকুমারকে গুলি করেন, তা হলে আপনাকে তো মারবোই, এই বাচ্চা ছোঁড়াটাকে আর ডাক্তারটাকেও গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব! আমি মশাই এক কথার মানুষ। রাজকুমারকে আপনি ছেড়ে দিন। তা হলে আপনাদেরও আমি মারব না। কাটান কুটিন হয়ে যাবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আগে তোমরা সবাই ঘরের বাইরে চলে যাও—হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখ, তারপর—!'

রাজকুমার চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার এর কথা বিশ্বাস করবে না। বলছি তো, এ লোকটা ফাঁকা আওয়াজ করছে। আমাকে মারবার হিম্মত ওর নেই! এরা মিড্‌ল ক্লাস ভদ্দরলোক, এরা গুলি করে মানুষ মারতে পারে না! তোরা সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড় আমার ওপরে—।

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে।

রাজকুমার নিজেকে ছাড়াবার জন্য শরীর মোচড়াতেই কাকাবাবু এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিলেন 'কর্ণেল'-এর পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা তুলে ঠেকালেন নিজের কপালে।

অন্যরা রাজকুমারকে চটপট তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। একজনের হাত থেকে একটা রিভলবার নিয়ে রাজকুমার এদিকে ফিরতেই দেখল কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

কাকাবাবু বললেন, 'এবার? অন্য লোককে গুলি করতে পারি না বটে, কিন্তু নিজেকে গুলি করতে আমার একটুও হাত কাঁপবে না। আমাকে ধরবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। আর আমি যদি এখন মরে যাই তা হলে, রাজকুমার, তোমার কি অবস্থা হবে বুঝতেই পারছ? যে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে সে তোমায় আর আস্ত রাখবে? জঙ্গলগড়ের চাবি আছে আমার মাথার মধ্যে। তোমার হাতে ধরা দেবার আগে আমি আমার এই মাথাটাই উড়িয়ে দেব। জঙ্গলগড়ের চাবি চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে।'

রাজকুমার ঝট করে মুখ ফিরিয়ে দেখল সন্তুকে।

কাকাবাবু বললেন, 'শোন! আমি মরলে তোমার কোনও লাভ নেই, ক্ষতিই বেশি। আমারও আপাতত মরবার ইচ্ছে নেই। সুতরাং, এস একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। জঙ্গলগড়ের সন্ধান যদি আমি দিই, তাহলে তোমরা তার বদলে আমায় কত টাকা দেবে?'

রাজকুমার বলল, 'টাকা? এর আগে তোমাকে দশ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল।'

'উঁহু! অত কমে হবে না। তোমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

'আমায় কেউ পাঠায়নি! কে পাঠাবে? জঙ্গলগড়ের যা কিছু সবই আমার পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি এর ওপর সব দাবি আমার। যা কিছু বলার সব আমার সঙ্গেই বলতে হবে।'

বেশ তো! ঠাণ্ডা মাথায় অনেক কিছু আলোচনা করা দরকার। তোমার এখানে চা কিংবা কফির কিছুর ব্যবস্থা নেই? এখন সন্তু আর প্রকাশকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দাও। ওরা বিশ্রাম নিক।

রাজকুমার এবারে হা-হা করে হেসে উঠল। যেন কয়েক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল কাকাবাবুর দিকে। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী, তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাব, তাই না? আর আমরা সব বোকা, কিছু বুঝি না?'

লম্বা হাত বাড়িয়ে সে সন্তুর কাঁধটা ধরে এক ঝটকায় টেনে আনল নিজের কাছে। তারপর সন্তুর ডান দিকের কানের ফুটোর মধ্যে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বলল, নাউ হোয়াট? তুমি নিজে মরতে ভয় পাও না জানি, কিন্তু তোমার ভাইপোকে যদি মেরে ফেলি? এই জন্যই তুমি ওকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিতে চাইছিলে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আর, এসব নাটকের কি দরকার? বললুম তো তোমার সঙ্গে আমি আলোচনায় বসতে রাজি আছি। আমি কত কষ্ট করে জঙ্গলগড়ের সন্ধান বার করেছি, সে জন্য কিছু পাব না?'

রাজকুমার বলল, 'তোমায় কিছু দেব না! তুমি আমাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছ! এবারে তুমি এক্ষুনি জঙ্গলগড়ের সব সন্ধান দিয়ে দাও, নইলে এই ছেলেটাকে এক্ষুনি শেষ করব!

এর মধ্যে টকাং করে একটা শব্দ হল। প্রকাশ সরকার এই সব কথাবার্তার সুযোগে বারান্দার দরজার ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছে।

কিছু একটা করবার জন্য কর্নেল-এর হাত নিশপিশ করছিল। এবারে সে লাফিয়ে গিয়ে তার রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারল প্রকাশ সরকারের মাথায়। প্রকাশ সরকার একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে ঢলে পড়ল।

সেদিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল রাজকুমার। এমন একটা ভাব করল যেন কিছুই হয়নি।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এবার চটপট বলে ফেল। শোন রায়চৌধুরী, আমরা রাজ পরিবারের লোক। দরকার হলে দু-চারটে লোক মেরে ফেলতে আমাদের একটুও ভুরু কাঁপে না।

সন্তু বলল, 'আপনি আমায় মেরে ফেললেও কাকাবাবু কোনও অন্যায় মেনে নেবেন না!'

রাজকুমার বলল, 'চোপ্!'

কাকাবাবু বললেন, 'ওকে তুমি মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছ, রাজকুমার। তোমাদের চেষ্টাই পণ্ডশ্রম। জঙ্গলগড়ে আসলে কিছু নেই। হয়তো কিছু ছিল এক সময় ঠিকই, কিন্তু আগেই কেউ তা সাফ করে নিয়ে গেছে!'

'সেটা আমরা বুঝব কিছু আছে কি নেই। আমরা সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখতে চাই!'

'ওকে ছেড়ে না দিলে আমি কিছুই বলব না!'

'বলবে না? তবে দ্যাখ, আমি প্রথমে এক গুলিতে এর পা খোঁড়া করে দিচ্ছি। তারপর এক এক করে...'

এমন সময় একটা লোক দৌড়ে এসে বলল, 'রাজকুমার! রাজকুমার! এক দল লোক আসছে এদিকে। বোধহয় মিলিটারি!'

অমনি 'কর্নেল' আর অন্যরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

রাজকুমার জিজ্ঞেস করল, 'কটা গাড়ি?'

লোকটি বলল, 'গাড়ি নেই, দৌড়ে দৌড়ে আসছে।'

রাজকুমার কাকাবাবুর দিকে ফিরে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'মিলিটারি এলেও তুমি নিস্তার পাবে না রায়চৌধুরী। আমরা তোমার ভাইপোকে নিয়ে চললুম। যদি একে প্রাণে বাঁচাতে চাও, তাহলে আমাদের

কাছে তোমাকে নিজে থেকেই আসতে হবে। কর্ণেল ওকে কভার করে থাক!'

সন্তুকে নিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল রাজকুমার। কাকাবাবু কিছুই করতে পারলেন না। অসহায়ভাবে বসে রইলেন।

।। ষোল।।

হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলেন প্রকাশ সরকারের কাছে। মাথার এক জায়গা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, প্রকাশ সরকার অজ্ঞান। কাকাবাবু পরে আছেন রাত-পোশাক, সঙ্গে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই। ফ্যাঁস করে তিনি নিজের জামাটা ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর সেটা দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধলেন ওর মাথাটা। নাকের কাছে হাত নিয়ে নিঃশ্বাসটা অনুভব করে দেখলেন। এখন আর কিছু করার নেই তার।

লাফিয়ে লাফিয়ে দরজার কাছে চলে এলেন কাকাবাবু। রাগে-দুঃখে তাঁর মুখটা অদ্ভুত হয়ে গেছে। তাঁর হাতে রিভলভার, অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না, ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে চলে গেল!

এবারে বাড়ির বাইরে শোনা গেল ভারি ভারি জুতোর শব্দ। কারা যেন ছুটে ছুটে আসছে।

সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ইউ সেইফ, রায়চৌধুরী? নো হার্ম ডান?'

কাকাবাবু একেবারে ফেটে পড়লেন।

অপদার্থ! ওয়ার্থলেস! তোমাদের সামান্য সেন্স অফ রেসপনসিবিলিটি নেই!'

'আরে শুনো, শুনো! পহ্‌লে তো শুনো?'

'কি শুনব, আমার মাথা আর মুণ্ডু। যা হবার তা তো হয়েই গেছে! তোমাদের আরও আধঘন্টা আগে আসবার কথা ছিল—'

গাড়ির অ্যাকসিলেটরের তার কেটে গেল যে! এমন বেওকুফ, সঙ্গে একটা একস্ট্রা তার পর্যন্ত রাখে না। ব্যস গাড়ি বন্ধ!'

'গাড়ি বন্ধ? সি আর পি'র গাড়ি খারাপ? এমন গাড়ি রাখে কেন?

বাইরে তো দেখতে নতুন, ভিতরে একদম ঝরঝরে। নদীর ধারে গাড়ী নষ্ট হয়ে গেল, সেখান থেকে আমরা ডাবল্ মার্চ করে চলে এলাম!'

'আর এসে লাভটা কি হল? ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে গেছে!'

'কোন দিকে গেল?'

'এখন তুমি দৌড়ে দৌড়ে ওদের পেছনে তাড়া করবে? ওদের সঙ্গে ভাল গাড়ি আছে। শোন, এই লোকটি আহত হয়েছে, ওর এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার।'

প্রকাশ সরকারের জ্ঞান ফিরে এসেছে এর মধ্যে। আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, 'কি হল? সবাই পালিয়ে গেল?'

কাকাবাবু আবার বললেন, 'ওরা সন্তুকে নিয়ে গেছে। ডেঞ্জারাস লোক ওরা, সন্তু ওদের কাছে একটু চালাকি করতে গেলেই মহাবিপদ হবে। ওদের দয়ামায়া নেই।'

নরেন্দ্র ভার্মা খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু রাজা। তোমার হাতে রিভলভার, তবু ওই লোকগুলো সন্তুকে ধরে নিল কি করে? তুমি রেজিস্ট্রি করলে না?'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি কি করব? লোকগুলোকে গুলি করে মারব! আজ খুব একটা শিক্ষা হল। সাধারণ গুন্ডা-বদমাশরা অনায়াসে মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু আমরা পারি না। আমরা কি ঠান্ডা মাথায় গুলি করতে পারি?'

'ওদের কাছেও আর্মস ছিল?'

'এটাও তো ওদেরই। আমি এটা কেড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা দলে ভারি, তাই কোনও লাভ হল না। আমি কথা দিয়ে ওদের ভুলিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করলাম, খালি ভাবছি তোমরা এসে পড়বে, আর তোমাদের পাত্তাই নেই!'

'গাড়িটা যে এমন বিট্রে করবে তা কি করে বুঝব বল! আই অ্যাম ভেরি সরি! ওদের সর্দার কে? চিনতে পারলে?'

সে সব কথা পরে হবে। এখন এখান থেকে যাব কি করে? পায়ে হেঁটে?

একজনকে ফেরত পাঠিয়েছি। আর একটা গাড়ি নিয়ে আসছে।

'সে গাড়ি আসতে আসতে রাত ভোর হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমি হাঁটব কি করে? আমার ক্র্যাচ্ নেই তোমাকে ক্র্যাচ আনতে বলেছিলাম, এনেছ?'

সেও তো, গাড়িতে রয়ে গেছে।

'বাঃ!'

'রাজা, আর দিমাগ খারাপ কোর না। কোনও উপায় তো নেই। একটু ঠাণ্ডা মাথা করে বোস!'

এমন সময় নিচ থেকে উঠে এলেন দেববর্মন। কাকাবাবুকে দেখে দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'মিঃ রায়চোধুরী আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন?'

কাকাবাবু বললেন, আপনাদের যা ব্যবস্থার ধাক্কা, তাতে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ব মনে হচ্ছে।'

'আপনার মাথার গোলমাল মানে সেটা সত্যি নয়? একবারও বুঝতে পারিনি।'

'আমার আবার মাথার গোলমাল শুরু হবে এক্ষুনি। সন্তুকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে! আপনারা ওই ছেলেটাকে চেনেন না, ওর দারুণ সাহস। কিন্তু মুশকিল হচ্চে, এখানে বেশি সাহস দেখাতে গেলে কি যে হবে ঠিক নেই। ওদের মধ্যে কর্ণেল বলে একটা লোক আছে সে দারুণ গোঁয়ার। ওই দেখুন না, প্রকাশ সরকারের মাথা কি রকম জখম করে দিয়েছে।

দেববর্মন বললেন, 'কর্ণেল? একজন তো কর্ণেল আছে নাম করা ক্রিমিন্যাল! জেল ভেঙে পালিয়েছে?'

'আর রাজকুমার বলে কারুকে চেনেন?'

'দেখুন, আমাদের এখানে অনেকেই রাজকুমার। আমি নিজেই তো অন্তত কুড়িজন রাজকুমারকে চিনি।'

নরেন্দ্র ভার্মা চেয়ারটা নিয়ে এসে কাকাবাবুর কাছে রেখে বললেন, 'রাজা তুমি এখানে বোস। আর কতক্ষণ এক ঠ্যাঙা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

কাকাবাবু বললেন, 'একটা গাড়ি। একটা গাড়ির জন্য সব নষ্ট হয়ে গেল।'

দেববর্মন বললেন, আমাদের আর একটু তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল। দুটো গাড়ি আনলে কোনও গন্ডগোল ছিল না। ওদের সঙ্গে দুটো গাড়ি ছিল। চাকার দাগ দেখে বুঝতে পারছি। ওরা ডান দিকে গেছে। জঙ্গলের দিকে।'

কাকাবাবু বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগরতলায় ফিরে যাওয়া দরকার। কাল সকালেই একটা মিটিং ডাকতে হবে।'

এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। নরেন্দ্র ভার্মা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ওই তো আমাদের গাড়ি এসে গেল বোধহয়।'

দেববর্মন বললেন, আমাদের গাড়ি? এত তাড়াতাড়ি কি করে আসবে? একজন লোক আগরতলায় যাবে আবার ফিরে আসবে, এত কম টাইমে তো হবার কথা নয়?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'তা হলে কি ওরাই আবার ফিরে আসছে? ওদের দলে কতজন লোক আছে?'

নরেন্দ্র তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

॥ সতের ॥

একটা গাড়ি এসে থামল বাড়িটার সামনে। তার থেকে নামলেন পুলিশের কর্তা শিশির দাশগুপ্ত।

নরেন্দ্র ভার্মা দোতলার সিঁড়ির কাছে রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শিশির দত্তগুপ্তকে দেখে বললেন, 'আমাদেরই লোক! কী আশ্চর্য আপনি?'

টকটক করে জুতোর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে শিশিরবাবু বললেন, 'আপনাদের গাড়িটা মাঝরাস্তায় খারাপ হয়ে আছে দেখলাম। আপনারা ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলেন? ওরা ধরা পড়েছে তো?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'না' আমরা বহুত দেরী করে ফেলেছি। সব ব্যাটারা ভেগেছে। সন্তুকে পাকাড়কে লিয়ে গেছে। কিন্তু আপনার তো শরীর খুব খারাপ। একশো পাঁচ ফিভার হয়েছে শুনলাম।'

দেববর্মন বললেন, আপনার স্ত্রী বললেন, আপনার ম্যালেরিয়া হয়েছে—'

শিশিরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমার হাই ফিভার হয়েছিল, তাই আপনাদের সঙ্গে আসতে পারিনি। কিন্তু থাকতে পারলাম না। এখনও জ্বর আছে, যাক গে, সে এমন কিছু নয়, এখানে কি হল বলুন।

কাকাবাবু দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'সেসব কথা পরে হবে। এখানে একজন ইনজিওরড হয়ে আছে, আগে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।'

শিশির দত্তগুপ্তও কাকাবাবুকে সুস্থ মানুষের মতন কথা বলতে শুনে দেববর্মনের মতন খুব অবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি তা হলে—

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, এখন সুস্থ হয়ে গেছি। চলুন আগরতলায় ফেরা যাক্।'

প্রকাশ সরকার এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার ইনজুরি মারাত্মক কিছু না।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখানে আর থাকবার কোনও দরকার নেই।'

কাকাবাবু সিঁড়ির রেলিং ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে শুরু করলেন। শিশিরবাবু তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললেন, 'আমি ধরছি। আপনি আমার কাঁধে ভর দিন।'

কাকাবাবু বললেন, 'কোন দরকার নেই। আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ভাইপোকে ধরে নিয়ে গেল? ওরা কতজন এসেছিল বলুন তো?'

'পাঁচ-ছ'জন হবে। তার মধ্যে একজনের নাম রাজকুমার, বেশ লম্বা মজবুত স্বাস্থ্য, নস্যিরঙের স্যুট পরা। আর একজনকে ওরা কর্ণেল বলে ডাকছিল।'

'কর্ণেল? ওর চেহারাটা কি রকম বলুন তো? মুখখানা বুলডগের মতন?'

'তা খানিকটা মিল আছে বটে। নাকটা থ্যাবড়া। মনে হয় নাকের ওপর দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেছে!'

'সে তো একজন সাংঘাতিক খুনি। টাকা নিয়ে মানুষ খুন করে। কিন্তু ওই রকম একজন ভাড়াটে খুনি আপনাকে মারতে আসবে কেন? আপনার ওপর কার এত রাগ থাকতে পারে?'

'কার রাগ আছে, তা আমি জানি না। তবে মনে হচ্ছে কারুর কারুর কাছে আমি খুব দামি হয়ে গেছি! যে-কোনও উপায়ে তারা আমার মাথাটা চায়।'

'আপনার মাথা?'

'হ্যাঁ! কাটা মুণ্ড নয়। জ্যান্ত মাথা। কেন জানেন। আমি কিছুদিন আগে ত্রিপুরায় এসে এক জায়গায় একটা খুব পুরনো মুদ্রা খুঁজে পেয়েছিলাম। রাজা মুকুট-মাণিক্যের মুদ্রা, তাতে একটা ঈগল পাখির ছবি আঁকা। ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রায় সিংহের মূর্তি থাকত, শুধু ওই একজনের মুদ্রাতেই ঈগলের ছবি। সেই জন্যই ওই মুদ্রা খুব দুর্লভ আর দামি!'

'হ্যাঁ এরকম একটা মুদ্রা আবিষ্কারের কথা কাগজে বেরিয়েছিল বটে। আপনি সেই লোক? আপনি আগে ত্রিপুরায় এসেছিলেন?'

'অনেকবার। তবে বেসরকারিভাবে। সেই জন্যই আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি কি ত্রিপুরার লোক?'

'আমাদের পূর্বপুরুষরা ত্রিপুরাতেই ছিলেন বটে, তবে আমার জন্ম কুমিল্লায়। সেইখানেই পড়াশুনা করেছি।'

'অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের কথা শুনেছেন?'

'রাজা অমরমাণিক্যের গুপ্তধন? সে তো একটা গুজব! সে-রকম কিছু আবার আছে নাকি?'

'আছে কি না তা আমিও জানি না। না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে কারুর কারুর বোধহয় ধারণা হয়েছে, আমি অমর মাণিক্যের জঙ্গলগড়ের সন্ধান জেনে ফেলেছি।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'গুপ্তধন, মানে হিড়ন ট্রেজার' এই যুগে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

শিশিরবাবুও হেসে বললেন, 'আমারও ধারণা, এসব একেবারে বাজে

কথা। ওই গুপ্তধনের গুজব এখানে অনেকদিন ধরেই চালু আছে! এ-সম্পর্কে দেববর্মন ভাল বলতে পারবেন।'

দেববর্মন বললেন, 'রাজা অমরমাণিক্য সম্পর্কে অনেক রকম গল্প আছে, গান আছে। তাঁর ওই গুপ্তধনের কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করে। এখনও কেউ কেউ ওই গুপ্তধনের খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।'

প্রকাশ সরকার বললেন, ত্রিপুরায় আমার মামার বাড়ি! ছোটবেলায় আমিও এই গুজবের কথা শুনেছি।'

কথা বলতে বলতে বাড়ির বাইরে চলে এসেছেন ওঁরা। শিশিরবাবুর জিপগাড়িটার হেডলাইট দুটো জ্বালানো হয়েছে। রাত্রির অন্ধকার চিরে সেই আলোর রেখা চলে গেছে অনেক দূরে।

দেববর্মন শিশিরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ড্রাইভার কোথায়?' শিশিরবাবু বললেন, 'ড্রাইভার আনিনি! আমার অসুখ বলে আমার ড্রাইভার রাত্রে বাড়ি চলে গিয়েছিল! আমি নিজেই চালিয়ে নিয়ে এলাম।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এত হাই ফিভার নিয়ে, এই রাত্তিরে জঙ্গলের রাস্তায় একা একা এলেন, না না, এটা আপনার বিলকুল অন্যায় হয়েছে!'

শিশিরবাবু বললেন, 'কি করব! মিঃ রায়চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেছে শুনে বিছানায় ছটফট করছিলাম। আমারই এরিয়ার মধ্যে এই রকম কান্ড। তাই আর থাকতে পারলাম না।'

কাকাবাবুর দিকে ফিরে দৃঢ়স্বরে শিশিরবাবু বললেন, 'আপনার ভাইপো-কে আমি কালকের মধ্যেই খুঁজে বার করব। ত্রিপুরা ছোট জায়গা। যাবে কোথায়!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এই কোঠিটা কার? জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম ফাঁকা কোঠি পড়ে আছে?'

দেববর্মন বললেন, 'সেটা জানা শক্ত হবে না। সকালেই বার করে ফেলব। তবে ত্রিপুরায় এ-রকম বাড়ি অনেক পাবেন। রাজপরিবারের লোকেরা জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম বাড়ি বানিয়ে রেখেছেন অনেক জায়গায়।

কাকাবাবু বললেন, 'আমাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করতে হবে।'

নরেন্দ্র ভার্মা আর দেববর্মন দু'দিক থেকে ধরে কাকাবাবুকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

সবাই গাড়িতে ওঠবার পর স্টার্ট দিলেন শিশিরবাবু।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'আমি ত্রিপুরার হিস্ট্রি ঠিক জানি না। এই রাজা অমরমাণিক কোন্ টাইমের? ইনি কোথায় গুপ্তধন রেখেছিলেন?'

দেববর্মন বললেন, 'অমরমাণিক নয়, অমরমাণিক্য! ত্রিপুরায় সব

রাজাদের নামই মাণিক্য দিয়ে হত। এমন কি অন্য কোনও লোক রাজাকে হত্যা করে রাজা হয়ে বসলেও তিনি কিছু একটা মাণিক্য হয়ে যেতেন।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'রাজা' এই অমরমাণিক্যের হিস্ট্রিটা আমায় শোনাবে?'

কাকাবাবু বললেন, 'আজ নয় কাল। এখন আমি একটু ঘুমোতে চাই। সারারাত জেগে থাকলে সকালে আর কিছু চিন্তা করতে পারব না।'

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'কি জানি সন্তুকে নিয়ে ওরা কি করছে!'

।। আঠার।।

চায়ে চুমুক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'গুপ্তধনে আমার আগ্রহ নেই। এই বিংশ শতাব্দীতেও কোথাও কোথাও হঠাৎ গুপ্তধন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু সে সবই গভর্নমেণ্টের সম্পত্তি হওয়া উচিত। আমি ত্রিপুরায় কয়েকবার এসেছি মুদ্রার খোঁজে! আপনারা সবাই জানেন, 'ইতিহাস চর্চার জন্য প্রাচীনকালের মুদ্রার দাম। এই দাম মানে বাজারের দাম নয়। ইতিহাসের দাম। ত্রিপুরার ইতিহাসে রাজা রত্নমাণিক্যের আগেকার কোনও রাজার নামের কয়েন পাওয়া যায়নি। আমি খুঁজছিলাম তাঁর আগেকার কোনও রাজার, অর্থাৎ ফিফটিনথ্ সেঞ্চুরির আগেকার কোনও রাজার কয়েন উদ্ধার করতে।'

কাকাবাবুর ঘরে সকালবেলাতেই এসে উপস্থিত হয়েছেন নরেন্দ্র ভার্মা আর শিশির দত্তগুপ্ত। শিশিরবাবুর চোখ লাল, গায়ে এখনো জ্বর আছে, তবু তিনি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেননি।

শিশিরবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনি যে ঈগল আঁকা মুদ্রা খুঁজে পেয়েছেন। সেটা কোন সময়কার?'

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক ঈগল কি না বলা যায় না। তবে ওই রকমই একটা পাখি আঁকা। সেটা মুকুটমাণিক্য নামে রাজার সময়কার। তাঁর মুদ্রায় সিংহের বদলে ঈগলপাখির ছবি, সেটা একটা রহস্য। অবশ্য সেই সময় ত্রিপুরার ইতিহাসে খুব খুনোখুনি পালা চলেছিল। প্রায়ই একজন রাজাকে সেনাপতি খুন করে নিজে রাজা হয়ে বসত। আবার আগেকার সেই রাজার কোনও ভাই বা ছেলে সেই সেনাপতিকে খুন করে সিংহাসন ফিরিয়ে আনত। ঈগল পাখি আঁকা মুদ্রা ছাড়া আমি আরও কয়েকটা মুদ্রা পেয়েছি। সেগুলো কোন্ সময়কার তা এখন জানা যায়নি। যাই হোক, আমার ওই

মুদ্রা আবিষ্কারের কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যায়! যদিও এ কথা প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার ছিল না। সেই খবর পড়েই কাদের ধারণা হয়েছে যে, আমি অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছি।'

শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই মুদ্রা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'পেয়েছিলাম জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়িতে! লোকে সেটাকেই জঙ্গলগড় বলে।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের কাহিনীটা আমি একটু শুনতে চাই।'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে একটু আগে থেকে শুরু করি। দিল্লীতে যখন আকবর বাদশা রাজত্ব করছেন, তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন বিজয়-মাণিক্য। তাঁর ছেলেন নাম অনন্তমাণিক্য। রাজা বিজয়মাণিক্য তাঁর বিশ্বাসী সেনাপতি গোপীপ্রসাদের মেয়ে রত্নাবতীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। বিশ্বাসী সেনাপতিটি কিন্তু চমৎকার বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন। অনন্তমাণিক্য রাজা হবার দু'বছরের মধ্যেই গোপীপ্রসাদ তাকে খুন করে নিজে রাজা হয়ে বসল।'

শিশিরবাবু বললেন, 'সেনাপতিকে আপনি দোষ দিতে পারেন না! জোর যার সিংহাসন তার, এই ছিল তখনকার নিয়ম।'

কাকাবাবু বললেন, 'তা বলে নিজের জামাইকে খুন করে, নিজের মেয়েকে বিধবা করে রাজা হওয়াটাকে ভাল বলব? বলুন?'

শিশিরবাবু আর কিছু না বলে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, এই গোপীপ্রসাদ রাজা হয়েই নাম নিয়ে নিল উদয়মাণিক্য। তার রাজধানী রাঙামাটির নাম বদলে দিয়ে নিজের নামে নাম রাখল উদয়পুর। এই উদয়মাণিক্য আর তার রাণী হিরা দাপটে রাজত্ব করতে লাগল কিছুদিন। কিন্তু বেশিদিন সুখ ভোগ করতে পারল না। কোনও একটি মেয়ে ওই রাজা উদয়মাণিক্যকে বিষ খাইয়ে দেয়। অনেকে বলে তার বিধবা মেয়েই নাকি বাবাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। তখন রাজা হল উদয়মাণিক্যের ছেলে জয়মাণিক্য!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন 'তা হলে রয়াল থ্রোন সেনাপতিদের ফ্যামিলিতেই চলে গেল?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তবে বেশিদিনের জন্য নয়। আগেকার রাজা বিজয়মাণিক্যের এক ভাই ছিলেন অমরমাণিক্য নামে। গোপীপ্রসাদের অত্যাচারে তিনি রাজবাড়ি ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। জয়মাণিক্য রাজা হবার পর সেই অমরমাণিক্য এসে চ্যালেঞ্জ

জানালেন তাকে। লড়াইতে তিনি জয়মাণিক্যকে পরাজিত ও নিহত করলেন। আবার সিংহাসন এসে গেল রাজপরিবারে। এই অমরমাণিক্য ছিলেন সেকালের ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, লেকিন রাজা হয়ে তিনি গুপ্তধন রাখলেন কেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'বলছি, সে কথা বলছি। রাজা অমরমাণিক্য গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন, প্রজাদের খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যেও সুখ সইল না বেশি দিন।

'নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার সেনাপতি এসে মারল তাঁকে?'

কাকাবাবু বললেন, 'না না, তা নয়। অমরমাণিক্য সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সেনাপতিকে বেশি বিশ্বাস করতেন না, তাকে বেশি ক্ষমতাও দেননি। কিন্তু তার ফলও ভাল হয়নি। হঠাৎ আরাকানের রাজা সিকন্দার শাহ্ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল ত্রিপুরা। অমরমাণিক্য এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সৈন্যবাহিনী তেমন শক্তিশালী ছিল না তখন। তিনি যুদ্ধে হারতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আরাকানের মগ সৈন্যরা যখন এসে পড়ল রাজধানী উদয়পুরের দোরগোড়ায়, তখন অমরমাণিক্য ধরা না দিয়ে পালিয়ে গেলেন সপরিবারে। মগ সৈন্য এসে উদয়পুরে লুঠতরাজ করে একেবারে তছনছ করে দিল।'

নরেন্দ্র ভার্মা শুনতে শুনতে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। এবার বললেন, তারপর? রাজা ধরা পড়ে গেল?

কাকাবাবু বললেন, না। রাজা অমরমাণিক্য লুকিয়ে রইলেন তিতাইয়ার জঙ্গলে। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচরও গিয়েছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যে চারিদিকে দেওয়াল গেঁথে একটা ছোট দুর্গের মতনও বানিয়ে ফেললেন।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'ওহি হ্যায় জঙ্গলগড়?'

'লোকে তাই বলে। এখন আর গড়ের চিহ্ন বিশেষ নেই, কয়েকটা দেওয়াল আর দু'একটা ভাঙা ঘর মাত্র রয়েছে। আরাকান রাজার সৈন্যরা ওদের সন্ধান পায়নি, কিন্তু রাজা অমরমাণিক্য হঠাৎ একটা কাণ্ড করে ফেললেন।'

শিশির দত্তগুপ্ত মুখ তুলে বললেন, 'রাজা কাপুরুষের মতন আত্মহত্যা করে বসলেন!

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি এই ইতিহাস জানেন দেখছি।'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'এই ঘটনা সবাই জানে। রাজা অমরমাণিক্য বিষ খেয়েছিলেন। ত্রিপুরার আর কোনও রাজা এরকম কাপুরুষের মতন আত্মহত্যা করেননি।'

কাকাবাবু বললেন, 'এটা ঠিক কাপুরুষতা বলা যায় না। রাজা অমরমাণিক্যের আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল খুব বেশি। তিনি তো দুর্বল রাজা ছিলেন না। নিজের ক্ষমতায় সিংহাসন দখল করেছিলেন। আরাকান রাজার কাছে হেরে গিয়ে তাঁকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, এই অপমান তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই হঠাৎ একদিন আত্মহত্যা করলেন।'

'ওর ধনসম্পদ সব ওই জঙ্গলগড়েই রয়ে গেল?'

'অনেকে তাই বিশ্বাস করে। রাজধানী থেকে পালিয়ে আসবার সময় তিনি নিশ্চয়ই অনেক ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। সেসব গেল কোথায়? অমরমাণিক্য হঠাৎ মারা যান, তাঁর ধনসম্পদ কোথায় লুকনো আছে, সেকথা কারুকে বলে যাননি। সেই থেকেই গুপ্তধনের গুজবের জন্ম। এই গুপ্তধনের দাবিদার শুধু রাজপরিবার নয়। সেনাপতি গোপীপ্রসাদের বংশধররাও মনে করে সেই গুপ্তধনে তাদেরও ভাগ আছে। এ নিয়ে দুই পরিবারের মারামারিও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ কিছু খুঁজে পায়নি।'

নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন, 'আভি তো কই রাজাও নেই, সেনাপতিও নেই। এখন আর কে লড়ালড়ি করবে?'

কাকাবাবু বললেন, 'রাজা নেই, সেনাপতি নেই বটে, কিন্তু তাদের বংশধররা আছেন। সে সব বংশের অনেক শাখা-প্রশাখা হয়েছে। তাদের মধ্যেকার মনের ভাব কি তা কে জানে? যে লোকটি কাল রাতে নিজেকে রাজকুমার বলে পরিচয় দিচ্ছিল! সে তো বলল, ওই গুপ্তধনের ওপরে তারই সম্পূর্ণ অধিকার।'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'ওইরকম রাজকুমার অনেক আছে। সত্যিকারের রাজবংশের কোনও ছেলে কি সাধারণ গুণ্ডার মতন ব্যবহার করতে পারে? কক্ষণও না!'

কাকাবাবু বললেন, 'আর একটা ব্যাপার আছে। কাল নরেন্দ্র ভার্মায় আসতে যখন দেরি হচ্ছিল, তখন সময় নেবার জন্য আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে, জঙ্গলগড়ের সন্ধান আমি দিতে পারি, কিন্তু আমায় কত টাকা বখরা দেবে বল। তখন রাজকুমার বললে, 'রায়চৌধুরী, তোমাকে আগেই অনেক টাকা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, তুমি রাজি হওনি!' কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই এর আগে ত আমায় কেউ এ ব্যাপারে কোনও টাকা দেবার প্রস্তাব করেনি! তার মানে, ওই রাজকুমার ঠিক জানে না। সে প্রধান দলপতি নয়। আর কে আছে।

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'ধরে ফেলব, সবাইকেই ধরে ফেলব! ওই

রাজকুমার আর কর্ণেল ওদের সবাইকেই কালকের মধ্যে আপনার সামনে হাজির করে দেব!'

কাকাবাবু বললেন, 'তার আগে সন্তুকে উদ্ধার করার কি ব্যবস্থা করবেন?'

এই সময় সিঁড়িতে একটা গোলমাল শোনা গেল। শিশির দত্তগুপ্ত আর নরেন্দ্র ভার্মা সেই শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াতেই সাদা পোশাকের পুলিশ দুজন একটা লোককে টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।

ওদের একজন বলল, 'স্যার, এই লোকটা একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। ওকে আমরা ছাড়িনি।'

।। উনিশ।।

রাজকুমার বজ্রমুষ্টিতে সন্তুর ঘাড় চেপে ধরে প্রায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে এনে তুলল একটা জিপ গাড়িতে। নিজে ড্রাইভারের সিটে বসে মাঝখানে বসাল সন্তুকে। আর পাশে খোলা রিভলবার হাতে নিয়ে কর্ণেল।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার পর রাজকুমার বলল, 'কেউ আমাদের ফলো করলে সোজা গুলি চালাবে। আমরা কিছুতেই ধরা দেব না।'

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কোনও রকম চালাকির চেষ্টা কোর না খোকা। প্রথমেই প্রাণে মারব না তোমায়! আমার লোকদের বলা আছে, তুমি পালাবার চেষ্টা করলেই তোমার একটা পা খোঁড়া করে দেবে, দ্বিতীয়বার একটা হাত কেটে দেবে। সারা জীবন ল্যাংড়া আর নুলো হয়ে থাকতে হবে, মনে রেখ!'

সন্তু কোনও কথা বলল না। কাকাবাবু যে পাগল হয়ে যায়নি, এমনকি তাঁর যে পক্ষাঘাতও হয়নি, এই আনন্দেই সে আর কোনও বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। এই ডাকাতরা কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এরা যে সন্তুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেজন্য সন্তুর একটুও ভয় নেই।

অন্য লোকগুলো আসছে পেছনের একটা গাড়িতে। হেডলাইটের আলোয় সন্তু দেখতে পাচ্ছে, সামনে কোনও রাস্তা নেই। এখানে জঙ্গল সে-রকম ঘন নয়। আলাদা আলাদা বড় বড় গাছ, জিপটা চলছে এরই ফাঁক দিয়ে এঁকে-বেঁকে।

আন্দাজ প্রায় আধঘন্টা চলার পর সন্তু দেখল সামনে একটা নদী। প্রথমে মনে হয়েছিল জিপটা একেবারে নদীতেই নেমে পড়বে। কিন্তু খ্যাচ করে ব্রেক কষে রাজকুমার সেটা থামাল একেবারে জলের কিনারে!

রাজকুমার বজ্রমুষ্টিতে সন্তুর ঘাড় চেপে ধরে প্রায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টেনে এনে তুলল একটা জীপ গাড়িতে

রাজকুমার বলল, 'কর্ণেল, ওকে, তোমরা ঘোড়ায় তোল!'

সত্যি সেখানে গোটা পাঁচেক ঘোড়া বাঁধা আছে। বড় ঘোড়া নয়, ছোট ছোট পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়ার মতন। সন্তু দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে এই রকম ঘোড়া দেখেছে।

কর্ণেল প্রথমে সন্তুকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপাল। তারপর নিজেও সেই ঘোড়াটায় চেপে বসল। রাজকুমার বসল তার পাশের ঘোড়ায়। তারপর অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল, 'তোমাদের মধ্যে দু'জন জিপ দুটো নিয়ে চলে যাও। বাকিরা এস আমাদের সঙ্গে।'

সন্তুদের ঘোড়াটা প্রথমে কিছুতেই জলে নামতে চায় না। কর্ণেল তার দুপায়ের গোড়ালি দিয়ে বারবার খোঁচা মারতে লাগল তার তলপেটে। তারপর ঘোড়াটা হঠাৎ হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

সন্তু আগে কখনো এভাবে নদী পার হয়নি। সিনেমাতে সে এরকম দৃশ্য কয়েকবার দেখেছে। সে সব ওয়েস্টার্ন ছবি। এই দেশেও কেউ ঘোড়ার পিঠে নদী পার হয়, তা তার ধারণাতেই ছিল না। তার দারুণ উত্তেজনা লাগছে।

নদীটাতে জল বেশি নয়, তবে বেশ স্রোত আছে।

সন্তুর কোমর পর্যন্ত জলে ভিজে গেল। সন্তু খুব ভাল সাঁতার জানে। একবার তার লোভ হয় কর্ণেলকে এক ধাক্কা দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ডুব সাঁতার দিয়ে সে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারবে। জলের মধ্যে ওরা গুলি করলেও তার গায়ে লাগবে না।

কিন্তু সন্তু সেই লোভ সংবরণ করল। সে ভাবল, দেখাই যাক না এরা কোথায় তাকে নিয়ে যায়। এদের আস্তানাটা তার চেনা দরকার।

নদী পেরিয়ে অন্য পারে পৌঁছবার পর ঘোড়া চলতে লাগল দুলকি চালে। মাঝে মাঝে ঘোড়াটা গা ঝাড়া দিচ্ছে আর তখন তার গা থেকে বৃষ্টির মতন জলের কণা উড়ছে। সেই সময় ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাই মুশকিল।

সন্তুর সারা শরীর জবজবে ভিজে। তার একটু একটু শীত করছে। আকাশে এখন পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে, তাতে চারিদিকটা বেশ দেখা যায়! এদিকে আর জঙ্গল প্রায় নেই। উঁচু-নিচু পাহাড়ি জায়গা। সন্তুর মনে হ'ল, ঠিক যেন টেক্সাস কিংবা আরিজোনার কোনও প্রান্তর দিয়ে চলেছে তাদের ঘোড়া!

একটা ছোট টিলার ওপর উঠে একটা পাথরের বাড়ির সামনে থামল ঘোড়াগুলো। টপাটপ নেমে পড়ল সবাই। রাজকুমার সেই বাড়িটার

সামনের লোহার গেট ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ভেতর থেকে কেউ একজন বলল, 'আসছি আসছি!'

বাড়িটা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, এবারে তার একটা ঘর জ্বলে উঠল একটা লণ্ঠনের আলো। তারপর সেই লণ্ঠনটা দোলাতে দোলাতে একজন লোক এল গেটের কাছে। লণ্ঠনটা উঁচু করতেই দেখা গেল তার মুখ। ঠিক যেন একটা গেরিলা।

লোকটি বলল, 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?'

রাজকুমার বলল, 'মেজর, এই একটা ছোঁড়াকে এনেছি, একে কিছুদিন তোমার জিম্মায় রাখতে হবে।'

'মেজর' লণ্ঠনটা সন্তুর মুখের কাছে এনে বলল, 'এত দেখছি একটা দুধের ছেলে। একে এনে কি লাভ হল? ধাড়িটা কোথায়?'

রাজকুমার বলল, 'আসবে, আসবে, সেও আসবে। 'কান টানলেই মাথা আসে। এই ছোঁড়াটাকে এখন দোতলার কোণের ঘরে রাখ। দুধের ছেলে বলে হেলাফেলা কোর না। এ মহা বিচ্ছু। একটু আলগা দিলেই পালাবার চেষ্টা করবে।'

কর্ণেল বলল, 'রাজকুমার, এবার তা হলে আমি যাই?'

রাজকুমার অবাক হয়ে বলল, 'যাবে মানে? কোথায় যাবে?

কর্ণেল বলল, আমি আর থেকে কি করব? আমার তো এক রাত্তির ফ্রি সার্ভিস দেবার কথা ছিল। হাওয়া খুব গরম আর ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।'

রাজকুমার কর্ণেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাল। তারপর বলল, 'তোমার নামে যে কেস ঝুলছে, তাতে তোমার নির্ঘাৎ ফাঁসি হবে তা জান?'

কর্ণেল বলল, সেই জন্যেই তো আর আমি একদিনও ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।'

রাজকুমার বলল, তুমি না চাইলেই কি ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে পারবে? তাছাড়া যাবেই বা কোথায়? আসাম, পশ্চিমবাংলা এই দু'জায়গাতেই তোমার নামে হুলিয়া ঝুলছে।'

কর্ণেল বলল, 'সে কোথায় যাব,-তা আমি ঠিক বুঝে নেব!'

রাজকুমার বলল, তোমার মাথায় যা ঘিলু আছে, তাতে তুমি কিছুই বুঝবে না।'

কর্ণেল এবার রেগে উঠে বলল, 'কেন আমায় আবার এসব ঝুট-ঝামেলায় জড়াচ্ছেন। এমনিতেই আমি মরছি নিজের জ্বালায়...আজ রাত্তিরে

আমি সার্ভিস দিয়েছি, আর কিছু পারব না!'

রাজকুমার বলল, 'ওরে গাধা! একমাত্র ত্রিপুরাতেই তুই নিরাপদ। এখানে আর কেউ তোর টিকি ছুঁতে পারবে না! তোমার নামে এখানে যে কেস ছিল, তা আমি তুলে নেবার ব্যবস্থা করেছি!'

কর্ণেল খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'সত্যি বলছেন? নাকি আমায় চুপকি দিচ্ছেন?'

মেজর এবার বলল, 'ও কর্ণেলদা, রাজকুমারের সঙ্গে তর্ক কোর না, উনি যা বলছেন, মেনে নাও? ত্রিপুরা পুলিশ তোমায় আর কিছু বলবে না।'

রাজকুমার এবার মেজরের দিকে ফিরে বলল, এ কি, তুমি এখনও যাওনি? ছোঁড়াটাকে নিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে আছ, ও সব শুনছে? যাও।'

মেজর এবার সন্তুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। যেতে যেতে সন্তু শুনল, কর্ণেলের একজন সঙ্গী বলছে, 'রাজকুমার, তা হলে আমার কেসটাও তুলে নেওয়া হবে তো?'

সন্তু অবশ্য এসব কথার মানে ঠিক বুঝতে পারল না। কেস কি? এদের নামে কিসের কেস? রাজকুমার নিজেই তো একটা ডাকাত, সে ওদের নামে পুলিশ কেস তুলে দেবে কি করে?'

ঘোরান একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসে 'মেজর' থামল একটা ঘরের সামনে। দরজাটা খুলে সে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, কিছু খেয়েটেয়ে এয়েছ তো, নাকি এত রাত্তিরে খাবার দিতে হবে?'

সন্তু বলল, 'না, খাবার চাই না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তোমার নাম মেজর কেন? তুমি কি মিলিটারির লোক?'

লোকটি হা হা করে হেসে উঠে বলল, 'ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, বুঝলে খোকা? সাধ করে এই বিপদের মধ্যে এসেছ কেন? তোমার ইস্কুল খোলা নেই এখন?'

সন্তু বলল, 'আমি কলেজে পড়ি।'

মেজর বলল, 'বাঃ! তবে তো আর এক কাঠি! পড়াশুনো ছেড়ে এখানে মরতে এসেছ কেন?

সন্তু বেশ স্মার্টলি বলল, 'আর বেশিদিন থাকব না, কাল-পরশুই ফিরে যাব ভাবছি!'

মেজর ভুরু তুলে বলল, 'তাই নাকি? কাল পরশু? এত তাড়াতাড়ি? হা-হা-হা-হা!'

লোকটির মুখের চেহারা গেরিলার মতন হলেও কথাবার্তা কিংবা

হাসিটা তেমন নিষ্ঠুর নয়। বরং বেশ যেন মজাদার লোক বলে মনে হয় হাসির সময় তার মস্ত গোঁফটা নাচে।'

ঘরের মধ্যে এক পা দিয়ে সে বলল, 'এস খোকাবাবু, দ্যাখ, আমাদের অতিথিশালাটি তোমার পছন্দ হয় কি না! এস এস বাইরে দাঁড়িয়ে থেক না।'

লোকটি সন্তুর হাত ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। ওর হাতে কোনও অস্ত্রও নেই। গোটা বাড়িটা অন্ধকার, এখন ইচ্ছা করলেই সন্তু এক ছুটে কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সন্তু বুঝতে পারল, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নিচে অন্য সবাই রয়েছে, শিকারী কুকুরের মতন তাড়া করে ওকে ঠিক খুঁজে বার করবে।

সন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। এ ঘরে কোনও খাট, চেয়ার টেবিল নেই। মেঝেতে একটা বিছানা পাতা। বিছানা মানে শুধু একটা কম্বল আর বালিস। আর একটা জলের কুঁজো।

মেজর বলল, কাল সকালে তোমায় গরম দুধ খাওয়াব। দেখ এখানকার দুধের স্বাদ কত ভাল। তুমি খরগোশ খেতে ভালবাস? আজ একটা খরগোশ ধরেছি, সেটাকে রান্না করব কাল। তুমি রুটি খাও, না ভাত খাও?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি হোটেল?'

মেজর অকারণে আবার হেসে উঠল। তারপর গোঁফ মুছে বলল, 'শোন বাপু আগে ভাগে তোমায় একটা কথা বলে রাখি। তুমি অনেক অ্যাডভেঞ্চা-রের বই পড়েছ নিশ্চয়ই? আমিও অনেক পড়েছি। সব বইতেই দেখেছি, তোমার বয়েসি ছেলেরা একবার না একবার পালাবার চেষ্টা করেই। তুমিও করবে নিশ্চয়ই। তোমার সবে ডানা গজাচ্ছে, এই তো পালাবার বয়েস! কিন্তু তুমি যদি পালাও, তাহলে আমার যে গর্দান যাবে। সুতরাং তুমি পালাবার চেষ্টা করলে আমিও তোমাকে ধরতে বাধ্য। তারপর ধরা যখন পড়বে, তখন তোমায় শাস্তিও দিতে হবে। প্রথম শাস্তি হচ্ছে খেতে না দেওয়া। তুমি যদি কাল দুপুরের মধ্যে পালাবার চেষ্টা কর, তা হলে কিন্তু খরগোশের মাংস তোমায় দেব না, বুঝলে?

সন্তু বলল, 'আমি খরগোশের মাংস খেতে চাই না।'

মেজর বলল, 'যাক গে, ওসব কথা পরে হবে। আজ রাতে অনেক ধকল গেছে, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘুমিয়ে পড়।'

দরজার সামনে থেকে রাজকুমার ঠিক তক্ষুনি বলল, 'দাঁড়াও, এখন ঘুমোবে কি, ওকে এখন চিঠি লিখতে হবে।'

।। কুড়ি।।

ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজকুমার মেজরকে বলল, 'যাও, জলদি কাগজ আর কলম নিয়ে এস।

মেজর যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বড় বড় করে বলল, কাগজ? কলম? সে আমি পাব কোথায়?'

রাজকুমার বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন, তোমার কাছে কাগজ কলম নেই? জোগাড় করে রাখনি কেন?'

মেজর হে-হে করে হেসে বলল, 'কি যে বলেন, রাজকুমার! আমরা যে কাজ করি তাতে কি কখনও কলমের দরকার হয়? আপনি আগে জোগাড় করে রাখার কথা বলেও যাননি?'

রাজকুমার তখন দরজার কাছে দাঁড়ান কর্ণেল আর অন্য দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কাছে কলম আছে?

কর্ণেল কোনও উত্তর দেবার বদলে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। যেন কলম কথাটি সে আগে কখনও শোনেই নি। অন্যরাও কেউ কথা বলল না।

রাজকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তুমি অন্য ঘরগুলিতে দেখে এস!'

মেজর বলল, আমি তিনদিন ধরে এ-বাড়িতে আছি। সব ঘরগুলিতে ঘুরে দেখেছি। এক টুকরো কাগজও দেখিনি, কলমও দেখিনি!'

রাজকুমার নিজের বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মেরে বলল, সামান্য কাগজ-কলমের জন্য সময় নষ্ট করতে হবে? এখন সময়ের কত দাম জান? যা হোক, একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে কালকের মধ্যে! একটা চিঠি লেখার ব্যবস্থা রাখতে পারোনি?'

মেজর বলল, 'পাশের একটা ঘরে একটা পুরনো ক্যালেণ্ডার আছে, তার একটা পাতা ছিঁড়ে উল্টো পিঠে লেখা যেতে পারে। কিন্তু কলম কোথায় পাওয়া যাবে?'

কর্ণেল বলল, আমি গাছের ডাল কেটে কলম বানিয়ে দিতে পারি।' এই বলে সে কোটের পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বার করল। রাজকুমার ভেংচিয়ে বলল, গাছের ডাল কেটে কলম বানালেই চলবে? শুধু কলম দিয়ে লেখা যায়? কালি কোথায় পাওয়া যাবে?'

কর্ণেল বলল, 'কাঠকয়লা নেই বাড়িতে? কাঠকয়লা গুঁড়ো করে কালি বানানো যায়।'

রাজকুমার এবার একটা হুংকার দিয়ে বলল, তবে যাও! শিগগির কালি আর কলম বানিয়ে নিয়ে এস!'

মেজর আর কর্ণেল দৌড়ে বেরিয়ে গেল। রাজকুমার দুই কোমরে হাত দিয়ে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে রইল সন্তুর দিকে।

'সন্তুর বেশ মজা লাগছে। এতগুলো লোক, কারুর কাছে একটা ডট্‌পেন পর্যন্ত নেই। এই যে রাজকুমার এত চেঁচামেচি করছে, সেও তো খুব সেজেগুজে রয়েছে, সেও পকেটে একটা কলম রাখে না? এতেই বোঝা যায়, এরা কি রকম ধরনের মানুষ!

রাজকুমার এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে জানালাটা খুলে দিল। তারপর জানালার শিকগুলো টেনে টেনে দেখল, সেগুলো ঠিক শক্ত আছে কিনা।

সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার কথা আমি জানি। নেপালে আর আন্দামানে তুমি অনেক রকম খেল্ দেখিয়েছ! এখানে যেন সে রকম কিছু করতে যেও না। এটা শক্ত ঠাঁই!'

সন্তু কোনও উত্তর দিল না। এই রাজকুমারকে গোড়া থেকেই তার খুব গোঁয়ার বলে মনে হয়েছে। এই রকম লোকের পক্ষে ফট্ করে গুলি চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু না।

একটু বাদেই মেজর আর কর্ণেল ফিরে এল। একটা চায়ের কাপে কালি গুলে এনেছে, আর গাছের ডাল কেটে একটা কলমও বানিয়েছে। মেজর নিয়ে এসেছে পুরনো ক্যালেণ্ডারটা।

তার একটা পাতা ছিঁড়ে সন্তুর সামনে ফেলে দিয়ে রাজকুমার বলল, 'নাও, এবারে লেখ।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'কাকে লিখতে হবে? প্রধানমন্ত্রীকে?'

রাজকুমার চোখ পাকিয়ে বলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? তোমার কাকাবাবুকে চিঠি লেখ। আমি যা বলছি তাই লিখবে!'

সন্তু প্রথমে লিখল। পূজনীয় কাকাবাবু! তারপর রাজকুমারের মুখের দিকে তাকাল।'

রাজকুমার বলল, 'লেখ। আমি বেশ ভাল আছি।'

সেই ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ার সময় সন্তু ডিকটেশান লিখেছে, তারপর আর কারুর কথা শুনে তাকে চিঠি লিখতে হয়নি। যাইহোক, রাজকুমারের এই কথাটায় আপত্তির কিছু নেই বলে সে লিখে ফেলল।

রাজকুমার বলল, 'তারপর লেখ, এখনও পর্যন্ত ইহারা আমার উপর কোনও অত্যাচার করে নাই।'

সন্তু বলল 'আমি সাধুভাষা লিখি না। আমি চলতি ভাষায় চিঠি লিখি।'

রাজকুমার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, 'যা বলছি, তাই লেখ!'

সন্তু লিখল. 'এখনও পর্যন্ত এরা আমার ওপর কোনও অত্যাচার করেনি।'

কর্ণেল, মেজর ও অন্য দু'জন সন্তুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখল সন্তুর চিঠি লেখা।

রাজকুমার বলল, 'হয়েছে? এবারে লেখ, তবে আপনার উপরেই আমার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের সন্ধান ইহাদের না দিলে ইহারা আর আমায় জীবন্ত ফিরিয়া যাইতে দিবে না!'

'সন্তু বলল, একথা আমি লিখব না!'

রাজকুমার বলল, লিখব না মানে? তোর ঘাড় ধরে লেখাব। হতচ্ছাড়া, যা বলছি তাই লেখ্ শিগগির!'

সন্তু বলল, 'আমায় দিয়ে জোর করে কেউ কিছু লেখাতে পারবে না।'

রাজকুমার বলল, তবে রে? আচ্ছা দ্যাখ্ একটুখানি নমুনা। কর্ণেল, এর বাঁ হাতে একটু অপারেশান করে দাও তো।'

কর্ণেল অমনি খপ্ করে সন্তুর বাঁ হাতটা চেপে ধরে টেনে নিল নিজের কাছে। তারপর তার ছুরিটা সন্তুর কনুইয়ের খানিকটা নিচে একবার ছুঁইয়ে দিল শুধু। মনে হল ঠিক যেন পালক বুলিয়ে গেল একটা। তবু সেই জায়গাটার একটা লম্বা রেখায় ফুটে উঠল রক্ত! টপ্ করে একটা ফোঁটা রক্ত পড়ল ক্যালেণ্ডারের পাতাটার ওপর।

রাজকুমার নিষ্ঠুরভাবে হেসে বলল, 'এইবার দেখ্লি? লেখ যে, এই রক্তের ফোঁটাটা আমার। কাকাবাবু আপনি আমার কথা না শুনিলে ইহারা আমার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবে। তারপর সেই রক্তে আমার জামাকাপড় চুবাইয়া তাহা আপনার নিকট পাঠাইবে।'

সন্তু বলল, 'এরকম বিচ্ছিরি ভাষায় আমি কিছুতেই লিখব না। আমাকে মেরে ফেললেও না।'

রাজকুমার পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে উল্টো করে ধরল। ওর বাঁট দিয়ে সন্তুর মাথায় মারতে চায়।'

কিন্তু সে মারবার আগেই মেজর হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'রাজকুমার একটা কথা বলব? আমি একটু একটু লেখাপড়া করেছি। গুমখুনের কিছু বইও পড়েছি। এই রকম সময় কি রকম চিঠি লিখতে হয়, তা খানিকটা জানি। আমি ওকে বলে দেব?'

রাজকুমার বলল, 'তুমি কি রকম লেখাতে চাও শুনি।'

মেজর বলল, যেটুকু লেখা হয়েছে, তারপর লিখুক, কাকাবাবু, আপনি

জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের জায়গাটার একটা নকশা এঁকে যদি এদের কাছে পাঠান, তবেই এরা আমাকে ছাড়বে বলেছে। তবে এ সম্পর্কে আপনি যা ভাল বুঝবেন, তা-ই করবেন। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—'

সন্তুর দিকে ফিরে মেজর বলল, দ্যাখ ভাই, চিঠিতো তোমায় একটা লিখতেই হবে। নইলে আমরা তোমায় ছাড়ব না। শুধু শুধু কেন মারধোর খাবে? 'আমি যা বললুম, তা লিখতে তোমার কি আপত্তি আছে?'

কথা বলতে বলতে সকলের অলক্ষিতে মেজর সন্তুর দিকে একবার চোখ টিপে দিল। যেন সে বলতে চাইল, এই কথাগুলো লিখতে রাজি হয়ে যাও, তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।

গাছের ডালের কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে সন্তু লিখে দিল এই কথাগুলো।

রাজকুমার কাগজটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী তোমার এই হাতের লেখা দেখে চিনতে পারবে?

সন্তু বলল, 'হ্যাঁ, আমার লেখা দেখে ঠিক চিনবেন!'

রাজকুমার বলল, 'পুনশ্চ দিয়ে আবার লেখ, ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর চাই।'

সন্তু বলল, 'আর আমি কিছু লিখতে পারব না।'

মেজর বলল, 'দিন, সেটা আমি লিখে দিচ্ছি। আমার হাতের লেখা কেউ চিনতে পারবে না, আমি সাত-আট রকমভাবে লিখতে পারি।'

মেজর সন্তুর চিঠির নিচে লিখল, 'চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এর উত্তর আর নকশা না পেলে সব শেষ। তোমার ভাইপোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুলিশে খবর দিলে কোনও লাভ হবে না।'

এর নিচে সে আবার একটা মড়ার মাথার খুলি এঁকে দিল।

রাজকুমার আবার চিঠিখানা নিয়ে একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল। তারপর বলল 'ঠিক আছে এটাই পাঠিয়ে দাও! কর্ণেল তোমার একজন লোককে বল ঘোড়া নিয়ে আগরতলায় চলে যেতে, ভোরের আগেই যেন পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জেনারেলই চিঠি ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করবেন।'

কর্ণেল বলল, 'কিন্তু আমার লোক যদি রাস্তায় ধরা পড়ে যায়?'

রাজকুমার হুংকার দিয়ে বলল, কে ধরবে? কেউ ধরবে না, যাও! ধরা পড়লেও চিঠি পৌঁছে যাবে ঠিক জায়গায়। আর যে ধরা পড়বে, তাকে আমি একদিন পরেই ছাড়িয়ে আনব। আমি রাজকুমার, ভুলে যেও না!'

এরপর রাজকুমার সদলবলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সন্তুকে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। সন্তু আর দরজা টানাটানির চেষ্টা করল না।'

সে এসে দাঁড়াল খোলা জানালার ধারে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গেটের কাছে ঘোড়ার ক্ষুর ঠোকার আর বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। একটু দূরে দেখা যাবে এক ঝাঁক জোনাকি। টি ট্রি টি ট্রি করে দূরে একটা রাত পাখি ডাকছে। এরই মধ্যে, কপাকপ্ শব্দ তুলে একটা ঘোড়া ছুটে চলে গেল।

যদিও কাছেই বিছানা পাতা, কিন্তু সন্তু বসে পড়ল এই জানালার পাশেই। তারপর জানালার শিকে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

সকাল হয়ে রোদ এসে তার মুখে পড়াতেও তার ঘুম ভাঙল না।

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতেই সন্তু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

॥ একুশ ॥

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেজর। তার এক হাতে একটা কাঁচের গেলাশ ভর্তি দুধ, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে! আর এক হাতে কয়েকখানা হাতে গড়া রুটি! সে পা দিয়ে দরজাটা ঠেলেছে বলেই এত জোরে শব্দ হয়েছে।

মেজর চোখ বড় বড় করে বলল, 'বাপ্‌রে! তোমাকে দেখে ধরে প্রাণ এল! জান তো, কি কান্ড? কাল তোমার দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গেছি। এখন এসে তা দেখে ভাবলুম পাখি বোধহয় উড়ে গেছে! কি ব্যাপার, তুমি এত লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেলে যে, পালাবার চেষ্টা করনি?'

সন্তু হাসল। তারপর বলল, দরজায় যে তালা লাগাননি, সে কথা বলে যাবেন তো! আমি জানব কি করে যে ডাকাতরাও তালা দিতে ভুলে যায়!'

মেজর বলল, 'ভাগ্যিস তুমি পালাওনি! তা হলে রাজকুমার আর আমায় আস্ত রাখত না! রিভলভারের ছ'টা গুলিই পুরে দিত আমার মাথার খুলিতে! তুমি আমায় খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছ। তারপর, কি খিদেটিদে পায়নি? এই নাও, দুধ আর রুটি এনেছি।'

সন্তু বলল, আমি দাঁত না মেজে কিছু খাই না।

মেজর বলল, এই রে! তাহলে তো তোমায় নিচে নিয়ে যেতে হয়! নিচে কুয়ো আছে। কিন্তু তোমায় তো ঘর থেকে বার করার হুকুম নেই, তা বাপু একদিন দাঁত না মেজেই খেয়ে নাও বরং!'

সন্তু বলল, 'না তা পারব না। আমার ঘেন্না করে।'

'তোমার জন্য কি আমি বিপদে পড়ব নাকি? তোমাকে আমি নিচে নিয়ে যাই, তারপর তুমি যদি একটা দৌড় লাগাও? এই পাহাড়ি জায়গায় তোমার পিছু পিছু আমি ছুটতে পারব না।'

'সকালবেলা ছোটাছুটি করার ইচ্ছে আমার নেই।'

অতসব আমি শুনতে চাই না। এই তোমার খাবার রইল। খেতে হয় খাবে, না হলে যা ইচ্ছে কর!'

লোকটি ঘরের মধ্যে গেলাসটা নামিয়ে তার ওপরেই রুটি রেখে দিল। তারপর দরজাটা খোলা রেখেই চলে গেল।

যখন অন্য কোনও কাজ থাকে না, তখন খুব খিদে পায়। গরম দুধ দেখেই সন্তুর পেট জ্বলতে শুরু করেছে। সে জানে, হাতের কাছে খাবার দেখলে কখনও অবহেলা করতে নেই। বিশেষত, এই রকম বিপদের অবস্থায় কখন কি হয় তার ঠিক নেই, ইচ্ছে করলেই এরা তাকে শাস্তি দেবার জন্য খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে! সেইজন্য খেয়ে নেওয়াই উচিত।'

কিন্তু ওই মেজরকে যে সে বলল, দাঁত না মেজে খেতে তার ঘেন্না করে। এখন সে খেয়ে নিলে লোকটা নিশ্চয়ই তাকে হ্যাংলা ভাববে। লোকটা দরজা খোলা রেখে গেছে। কি ব্যাপার, এবারেও ভুলে গেছে নাকি?

তক্ষুনি মেজর আবার ফিরে এল। তার এক হাতে এক মগ জল!

সে গজগজ করে বলল, 'এই নাও, জল এনেছি। এখানেই মুখ ধুয়ে নাও।'

সন্তু বলল, 'দাঁত মাজব কি দিয়ে? একটা নিমগাছের ডাল ভেঙে আনতে পারলে না?

ইস্ তোমার শখ তো কম নয়! এর পরে বলবে, শুধু রুটি খাব না। আলুর দম চাই। হালুয়া চাই! এই জলেই আঙুল দিয়ে দাঁত মেজে নাও!'

সন্তু দেখল কালকের রাত্তিরেই সেই গাছের ডাল কেটে বানানো কলমটা তখনও সেখানে পড়ে আছে!

সেটাকেই সে তুলে নিল। কোন্ গাছের ডাল তা কে জানে! সেই কলমটারই উল্টো দিকটা চিবিয়ে দাঁতন বানিয়ে সে দাঁত মাজল। বেশ মজা লাগল তার।

দুধটা এখনও বেশ গরম আছে। তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সে রুটি তিনটে খেয়ে ফেলল। কাছেই মেজর বসে রইল উবু হয়ে। তার পরনে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি। মস্ত ঝোলা গোঁফের জন্য তার মুখখানা সিন্ধু-ঘোটকের মতন দেখায়।

খেতে খেতে সন্তু ভাবল, এই মেজর লোকটি কিন্তু ঠিক ডাকাতদের

মতন নয়। প্রথম থেকেই সে সন্তুর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করেছে। কাল রাত্তিরে চিঠি লেখার সময় সন্তুর দিকে তাকিয়ে ও একবার যেন চোখ টিপেছিল না? কেন কিছু কি বলতে চায়? সন্তু জিজ্ঞেস করবে, না ও নিজের থেকেই বলবে?

এই যে সন্তুর মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দিল লোকটা, এটাও কম কথা নয়। গেলাস প্রায় ভর্তি করে দুধ এনেছে। আধ গেলাসও তো দিতে পারত?

সন্তুর খাওয়া শেষ হতে মেজর বলল, 'হ্যাঁ, বেশ খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারছি। আর দু'খানা রুটি খাবে?'

সন্তু বলল, 'না।'

'আচ্ছা, এবারে তা হলে শুয়ে পড়। তোমার তো এখন কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই! যতক্ষণ তোমার কাকাবাবু নক্‌শাটা না দিচ্ছেন, ততক্ষণ তোমাকে, এইভাবেই থাকতে হবে!'

'আচ্ছা, জঙ্গলগড়ে আপনারা কি খুঁজছেন বলুন তো?'

'তুমি জানো না?'

'না। কাকাবাবু আমায় কিছুই বলেন নি!'

ও-হো-হো-হো! তুমিও জান না। আমিও জানি না।'

'আপনি জানেন না? তা হলে আপনি এই ডাকাতের দলে রয়েছেন কেন?'

'ডাকাতের দল আবার কোথায়? আমি তো কোনও ডাকাতের দলে নেই!'

'আপনি এদের দলে নন? তা হলে....মানে, এরা যে আমায় এখানে আটকে রেখেছে আপনিও তো তাতে সাহায্য করছেন।'

'সে হল অন্য ব্যাপার। আসল ব্যাপারটা কি জান? তোমায় বলছি, আর কারুকে জানিও না! আমি একটা বাড়িতে ঢুকে লোভ সামলাতে পারিনি। কয়েকখানা হিরে চুরি করেছিলুম। তারপর অবশ্য পুলিশ আমার বাড়ি সার্চ করে সে হিরে সব কটাই উদ্ধার করে নিয়ে গেছে! আমায় জেলেও দিয়েছিল। তা চুরি করার জন্য না হয় খাটতুম দু-তিন বছর। কিন্তু যে-বাড়ি থেকে আমি হিরে চুরি করেছিলুম, সেই বাড়ির একজন দারোয়ান খুন হয়েছে। পুলিশ এখন সেই খুনের দায়ে আমাকে জড়াতে চায়। কি অন্যায় বল তো! আমি খুন করিনি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর। খুনটুন করার সাহস আমার নেই। শুধু শুধু আমি খুনের দায়ে ফাঁসি যাব?'

'আপনি জেল থেকে পালিয়েছেন?'

'আমি একলা নয়। সব শুদ্ধ ন'জন। কাগজে পড়নি, আগরতলা জেল ভেঙে আসামীদের পালানোর খবর? অন্যরা পালাচ্ছিল, আমিও তাদের দলে ভিড়ে পড়লুম।'

'তারপর?'

'তারপর এই তো দেখছ এখানে!'

'জেল থেকে পালিয়ে এখানে আছেন! এটা আপনার নিজের বাড়ি?'

'এটা আমার বাড়ি? আমার এতবড় বাড়ি থাকলে কি আমি ফিরে চুরি করি? এটা আগেকার কোনও রাজা-টাজাদের বাড়ি হবে বোধহয়? কেউ থাকত না! আমিই তো এসে পরিষ্কার করেছি।'

'এটা ওই রাজকুমারের বাড়ি?'

'হতেও পারে, না-ও হতে পারে। সে সব আমি জানতে চাইনি। আমার কাজ উদ্ধার হলেই হল।'

'কাজ মানে?'

'জেল থেকে পালালে তো সারাজীবন পালিয়েই থাকতে হয়। কোনদিন নিজের বাড়িতে ফিরতে পারব না। আমরা যারা এই জেল থেকে বেরিয়েছি, তাদের কয়েকজনকে এই রাজকুমার বলেছে, যে আমরা যদি ওর কাজ উদ্ধার করে দিই, তাহলে উনি আমাদের নামে কেস তুলিয়ে নেবেন। পুলিশ আর আমাদের কিছু বলবে না। জঙ্গলগড়ে কি আছে না আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি রাজকুমারকে সাহায্য করব, রাজকুমার আমায় সাহায্য করবে, ব্যস।'

'রাজকুমার যদি মানুষ খুন করতে বলে, তাও করবেন?'

'মাথা খারাপ। আমি অত বোকা নই। খুন করে আবার পুলিশের ফাঁদে পড়ব। খুন করিনি, তাতে প্রায় ফাঁসি হয়ে যাচ্ছিল!'

'কিন্তু এই রাজকুমার তো সাংঘাতিক লোক!'

'সে যেমন থাকে থাক না, তাতে আমার কি? আমি ওসব সাতে-পাঁচে নেই। এখন তোমার ওপর আর তোমার কাকাবাবুর ওপরে আমার সব কিছু নির্ভর করছে। তোমরা যদি মানে মানে জঙ্গলগড়ের জিনিস-পত্তর সব রাজকুমারকে দিয়ে দাও, তাহলেই আমরা ছাড়া পাই। রাজকুমার বলেছে, পুরো কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিষ্কৃতি নেই।'

'ওই কর্ণেলও সেই দলে?'

'হ্যাঁ, ও-ওতো আমারই মত জেল-পালানো।'

'ওর নাম কর্ণেল কেন?'

'কাজ হিসেবে এক একজনের এক একটা নাম দেওয়া হয়েছে। আসল

নাম ধরে ডাকা নিষেধ। এই যাঃ, তোমাকে অনেক কথা বলে ফেললুম। আসলে, সকালের দিকটায় আমার মনটা খুব নরম থাকে। আর ঠিক তোমার মতন বয়েসি আমার একটা ভাই আছে তো! আমি যে তোমাকে এত সব কথা বলেছি, তা যেন রাজকুমারকে আবার বলে দিও না! কি বলবে না তো?'

'না, হঠাৎ রাজকুমারকে আমি এসব বলতে যাব কেন?

'তবে তুমি এখানে থাক। আমি যাই, চায়ের জল-টল বসাই গিয়ে। বাবুরা সব এখন ঘুমোচ্ছেন। তোমার চিঠি তোমার কাকাবাবুর কাছে এতক্ষণ পৌঁছে গেছে বোধহয়।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে মেজর চলে গেল।

সন্তু গিয়ে দাঁড়াল জানালার কাছে। এখানে সময় কাটবে কি করে? সকালবেলা তার যে কোনও ধরনের বই পড়া অভ্যেস। কিংবা একা একা বেড়াতেও তার ভাল লাগে! বাইরে দেখা যাচ্ছে বেশ ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গল, গেটের বাইরে দু'তিনটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। একটাও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না।

এইভাবে তাকে ঘরের মধ্যে সারাদিন বন্দী থাকতে হবে। কাকাবাবুকে সে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনতে চায়নি। কাকাবাবু নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, সন্তু কেন ওই রকম চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছে।

কাকাবাবু যে কখন, কীভাবে এখানে এসে পড়বেন, তা কিছুই বলা যায় না। যদি এই মুহূর্তে কাকাবাবু পেছন থেকে 'সন্তু' বলে ডেকে ওঠেন, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কী খেয়াল হল, সন্তু জানালার কাছ থেকে সরে এসে বন্ধ দরজাটা ধরে টান মারল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। এবারেও দরজায় তালা লাগায়নি, এবারও ভুলে গেছে? তা কখনো হতে পারে? এটা কোনও ফাঁদ নয় তো।

যা হয় হোক ভেবে সন্তু দরজার বাইরে পা বাড়াল।

॥ বাইশ ॥

সামনে একটা টানা বারান্দা। কোথাও কেউ নেই। তবে কিসের একটা শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল মেঘের গর্জন। কিন্তু একটু আগেই সন্তু জানালা দিয়ে দেখেছে যে আকাশ একেবারে নীল, কোথাও

মেঘের চিহ্ন নেই। তারপর মনে হল, কেউ যেন পাথরের ওপর একটা পাথর ঘষছে। আরও একটু মন দিয়ে শোনবার পর সন্তু বুঝতে পারল, আসলে ওটা কারুর নাক ডাকার আওয়াজ।

আওয়াজটা পাশের একটা ঘর থেকে আসছে। সন্তু পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল! সে ঘরের দরজা বন্ধ। সন্তু হাত দিয়ে একটু ঠেলল, তবু সেটা খুলল না।

সন্তু আর একটু এগিয়ে গিয়ে আর একটা ঘর দেখতে পেল। এ ঘরের দরজা খোলা। কোনো বিছানা-টিছানা নেই, খালি মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে কর্নেল আর দুজন লোক। কর্নেল এর মাথার কাছে রয়েছে রিভলবার। বোধহয় ওদের পাহারা দেবার কথা ছিল।

সন্তুর একবার লোভ হল চুপিচুপি গিয়ে টপ্ করে রিভলভারটা তুলে নেয়। তারপর নিজেকে সামলে নিল। যদি হঠাৎ জেগে ওঠে ওরা কেউ, তা হলে মুশকিল আছে। কর্নেল লোকটা বড্ড নিষ্ঠুর ধরনের।

সন্তু এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তার বুকের ভেতরটা ছম্‌ছম্ করছে। তাকে যে কেউ বাধা দিচ্ছে না এটাতেই ভয় লাগছে বেশি। খালি মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ যেন তাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একতলাতেও কারুকে দেখা গেল না। সেই মেজর-ই বা গেল কোথায়? একতলার সবকটা ঘর তালাবন্ধ। অনেক দিন সেই সব তালা খোলা হয়নি মনে হয়। মাঝখানে একটা উঠোন। তার এক পাশে ছোট দরজা, সেটা দিয়ে বোধহয় বাড়ির পেছনটায় যাওয়া যায়।

সন্তু সেই দরজার কাছে এসে উঁকি মারল। কাছেই একটা কুয়ো। বেশ উঁচু করে পাড় বাঁধান। দুটো খরগোশ সেখানে ঘুরঘুর করছে। সন্তু কোনও শব্দ করেনি, শুধু তার ছায়া পড়তেই ওরা টের পেয়ে গেল! দু'এক পলক কান খাড়া করে খরগোশ দুটো দেখল সন্তুকে। তারপরই পেছন দিকটা উঁচু করে মারল লাফ। প্রায় চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

সন্তু কুয়োটার কাছে এসে এদিক ওদিক তাকাল। খরগোশ দুটোর গায়ের রং পুরো সাদা নয়, খয়েরি খয়েরি, তার মানে ওরা বুনো খরগোশ। একটু দূরে একটা করমচা গাছের নিচে আর একটা খরগোশ বসে আছে। এবারেও এর সঙ্গে চোখাচোখি হতে দৌড় মারল। বেশ মজা লাগল সন্তুর। এখানে তো অনেক খরগোশ। সেই জন্যেই কাল রাত্রে মেজর লোভ দেখাচ্ছিল খরগোশের মাংস খাওয়াবার।

বাড়ির পেছন দিকটায় এক সময় নিশ্চয়ই বেশ বাগান ছিল। এখন

ফুলগাছ-টাছ নেই, আগাছাই বেশি। বাউন্ডারি দেওয়ালের পাশে পাশে রয়েছে অনেকগুলো কাঁঠাল। তাতে কত যে কাঁঠাল ফলে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেকগুলো পাকা কাঁঠাল মাটিতেও পড়ে আছে কেউ খায় না বোধহয়। সন্তুও কাঁঠাল খেতে ভালবাসে না। কিন্তু এঁচোড়ের তরকারি তার ভাল লাগে। এত কাঁঠালে কত এঁচোড়ের তরকারিই না হতে পারে!

শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্তু যেন হঠাৎ ডাকাত-ফাকাত, গুপ্তধন মারামারির কথা সব ভুলে গেল। মাথার ওপর নীল আকাশ, ঝকঝকে রোদ উঠেছে বাতাসও ঠান্ডা ঠান্ডা। সন্তুর মনে হল সে যেন কোথাও বেড়াতে এসেছে। টিলার ওপর এই রকম একটা বাড়ি, কাছাকাছি মানুষজন নেই। এই রকম জায়গা বেড়াবার পক্ষে খুব চমৎকার। মা-বাবা মানুষজন সবাই মিলে এলে কি ভাল হত।

হাঁটতে হাঁটতে সন্তু বাড়িটার সামনের দিকে চলে এল। গেটের কাছে তিনটে ঘোড়া এখনও বাঁধা আছে। ঘোড়াগুলোকে দেখে সন্তুর কালকের রাতের কথা মনে পড়ল। বাব্বাঃ এত রাতের মধ্যে কত কি কান্ডই না ঘটেছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এই ডাকাতরা সন্তুকে ধরে আনলেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই যে, কাকাবাবুর আর অসুখ নেই, তিনি ভাল আছেন।

কাকাবাবু কি তার চিঠিটা পেয়ে গেছেন এতক্ষণে?

সন্তু একবার মুখ ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল। কই কেউ তো জাগেনি। কেউ তার ওপর নজর রাখছে না। সন্তু এখন স্রেফ একটা দৌড় মেরে পালিয়ে গেলে কে তাকে ধরবে?

ঘোড়াগুলোর কাছে এসে সন্তু দাঁড়াল। এগুলো বেশি বড় ঘোড়া নয়! পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়া। এই একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে পালালে কেমন হয়?

সন্তু কখনও ঘোড়ায় চড়া শেখেনি। তবুও তার ধারণা হল টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চাপা সহজ। যে কেউ পারে। একটা ঘোড়ার পিঠে হাত রাখল সন্তু, ঘোড়াটা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল, সন্তুকে লাথি-টাথি কিছু মারার চেষ্টা করল না।

ঘোড়ায় চাপার ইচ্ছাটা সন্তুর একেবারে অদম্য হয়ে উঠল। একটা ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে লাগামটা হাতে নিল সে। পিঠে কিন্তু জিন নেই। লাফিয়ে কি করে পিঠে উঠবে ভাবতে ভাবতে সন্তুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। লোহার গেট বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপা যেতে পারে।

সেইভাবে ঘোড়াটায় উঠে সন্তু বলল, হ্যাট হ্যাট।

কিন্তু ঘোড়াটা নট নড়ন-চড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সন্তু তার হাঁটু দিয়ে কয়েকটা গোত্তা দিলেও কোনও লাভ হল না।

'কিন্তু একবার ঘোড়ায় চেপে পালাবার প্ল্যান করে আবার সেটা বদলাবার কোনও মানে হয় না। এখন যদি কেউ এসে পড়ে তা হলে সন্তুকে দেখে নিশ্চয়ই হাসবে। ঘোড়ায় চড়া বীরপুরুষ, অথচ ঘোড়া ছোটাতে জানে না।

মরিয়া হয়ে সন্তু হাঁটু দিয়ে গোত্তাও মারতে লাগল, আর লাগামটা ধরেও টানতে লাগল খুব জোরে।

তাতে ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ-হি-হি আওয়াজ করে শূন্যে দু'পা উঁচু করল একবার। তারপর ছুটতে লাগল।

প্রথমে ঝাঁকুনিতে সন্তু প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনও রকমে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু বল্গাটা খসে গেল তার হাত থেকে। মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে সে বল্‌গাটা আর ধরতে পারল না কিছুতেই।

ঘোড়াটা যখন বেশ জোরে টিলার নিচের দিকে নামতে লাগল, তখন সন্তুর মনে হল সে আর কিছুতেই ব্যালান্স রাখতে পারবে না। এই অবস্থায় ছিট্‌কে পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে নিশ্চয়ই। আর কোনও উপায় না দেখে সন্তু ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে।

ঘোড়াটাও বেশ অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই। কারণ সে মাঝে মাঝেই চিঁ-হি-হি-হি করে ডাক ছাড়ছে। সে ছুটছেও এলোমেলোভাবে। টিলাটার নিচেই জঙ্গল, সেখানে ঢুকে ঘোড়াটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে বড় বড় গাছের ধার ঘেঁষে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে সন্তুর গা ঘষটে যাচ্ছে। এক একবার সে ভাবছে কোনও গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়বে কি না। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

কোন্‌দিকে যে ঘোড়াটা যাচ্ছে তাই বা কে জানে! জঙ্গল ক্রমেই ঘন হচ্ছে। কাল রাত্তিরে এই পথ দিয়েই গিয়েছিল কি না তা সন্তুর মনে নেই। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু দেখতেই তো পায়নি সে।

প্রায় আধঘন্টা বাদে ঘোড়াটা একটা নদীর সামনে থামল। কাল রাতেও সন্তুরা একটা নদী পার হয়েছিল। এটা কি সেই নদী? তাই বা কে জানে।

যা থাকে কপালে ভেবে সন্তু লাফিয়ে নেমে পড়ল নদীর ধারের নরম মাটিতে। আসলে ওইভাবে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওরকমভাবে আর যাওয়া যাবে না।

যাই হোক, সন্তু মোটামুটি তার সার্থকতায় বেশ খুশি হয়েছে। বিনা বাধাতেই সে পালিয়ে আসতে পেরেছে। এখন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে

কোন রকমে সামলে নিল নিজেকে

তার কোনও আপত্তি নেই। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক কোন এক সময় সে একটা কোন শহরে পৌঁছে যাবে।

এতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে কোন মানুষজন দেখেনি। এবারে নদীর ধারে সে যেন কাদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল।

একটা কী যেন বড় গাছ নদীর ওপরে অনেকখানি ঝুঁকে আছে। কথা শোনা যাচ্ছে তার ওধার থেকেই। সন্তু আস্তে আস্তে গিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াল। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল দু'জন জেলে মাছ ধরছে। একজন বয়স্ক লোক, একজন প্রায় সন্তুর সমান।

সন্তু ভাবল, যাক, ভয়ের কিছু নেই। তবে এক্ষুনি সে লোকগুলোর কাছে গেল না। এদিকেই একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ওদের কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে। একটু পরেই ওদের কয়েকটা কথা শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বয়স্ক ছেলেটি ছোট ছেলেটিকে বলছে, সবই কপাল বুঝলি? আমিও মাছ ধরি আর তোর সুবলকাকাও মাছ ধরত। সেই ছোটবেলা থেকে আমরা সমানে এই কাজ করেছি। মাছ ধরা ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না। অথচ, আজ আমি কোথায় আর তোর সুবলকাকু কোথায়!'

ছেলেটি বলল, 'সুবলকাকাকে তো সাপে কামড়েছে!'

জেলেটি বলল, 'সাপে কি আর এমনি এমনি কামড়েছে। নিয়তি যে ওকে টেনে নিয়ে গেছে। আমি বারণ করেছিলুম।

ছেলেটি বলল, 'মাছ ধরা ছেড়ে সুবলকাকু জঙ্গলে খরগোশ মারতে গিয়েছিল।'

'খরগোশ না হাতি। আমরা জলের মাছ মারতে জানি, ডাঙার শিকারের কী জানি। আসল কথা কী জানিস, একদিন হাট থেকে সুবল আর আমি ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরতে ছিলাম, এমন সময় কী যেন একটা জিনিস চকচক করে উঠল। একটুখানি মাটি খুঁড়ে সুবলই সেটা টেনে তুলল। সেটা একটা সোনার টাকা। আগেকার রাজা মহারাজাদের আমলে ওই রকম টাকার চল ছিল। তা সেই টাকাটা পেয়ে সুবলের কী আহ্লাদ। লাফাতে লাগল একেবারে। আমি বললুম, ওরে সুবল, এসব বড় মানুষদের জিনিস, গরিবের ঘরে রাখতে নেই। ও টাকাটা তুই থানায় জমা দিয়ে দে। তা সে কথা সে কিছুতেই শুনবে না। সোনার টাকা পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেল। অন্য কাজকম্ম সব ছেড়েছুড়ে দিনরাত জঙ্গলে পড়ে থাকত। লোককে বলত খরগোশ মারতে যায়, কিন্তু আমি তো জানি! ও সেখানে যত গর্ত

আছে আর পাথরের ফোকর আছে সব জায়গায় হাত ভরে ভরে খুঁজত। সেইরকম একটা গর্তে হাত ঢুকিয়েই তো সাপের কামড় খেলে।'

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'জঙ্গলের মধ্যে একখানা সোনার টাকা এল কি করে?'

বয়স্ক লোকটি বলল, 'ও জায়গাটারে কয় জঙ্গলগড়। এককালে ওখানে ত্রিপুরার এক মহারাজা এসে লুকিয়েছিলেন। তাই লোকে এখন বলে, ওখানকার মাটির নিচে অনেক সোনাদানা পোঁতা আছে।'

জঙ্গলগড়ের নাম শুনেই সন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে। এই বয়স্ক লোকটি তা হলে জানে, জঙ্গলগড় কোথায়? তা হলে তো এক্ষুনি ওর সঙ্গে ভাব করা দরকার।

কিন্তু সন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগেই অন্য একটা শব্দ শুনতে পেল। টগ্‌বগ্ করে ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন এদিকেই আসছে।

।। তেইশ।।

পুলিশরা যে লোকটিকে ধরে নিয়ে এসেছে, কাকাবাবু তার আপাদমস্তক দেখলেন কয়েকবার। ধুতি আর নীল রঙের শার্ট-পরা সাদামাটা চেহারার একজন মানুষ। মুখে একটা ভয়ের ছাপ।

কাকাবাবু বললেন, 'ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক। এ লোকটাকে ধরে রেখে কোন লাভ নেই। কই, চিঠিটা কই?'

শিশির দত্তগুপ্ত উঠে লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কট্‌মট করে তাকিয়ে বললেন, 'এই তুই এই চিঠি কোথায় পেয়েছিস?'

লোকটি বলল, আমি বাজারের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম, একজন লোক এসে বলল, এই চিঠিটা রাজার অতিথিশালায় পৌঁছে দিলে আমায় ইয়ে মানে একটা টাকা দেবে, তাই আমি—'

শিশির দত্তগুপ্ত ধমক দিয়ে বললেন, 'সবাই এই এক গল্প বলে! যদি জেলে যেতে না চাস তো সত্যি কথা বল!'

লোকটি বলল, 'এক টাকা নয়, ইয়ে মানে, পাঁচ টাকা!'

'অ্যাঁ?'

'সত্যি কথা বলছি স্যার, দশ টাকা দিয়েছে। আমি দিব্যি কেটে বলছি তার বেশি দেয়নি।'

'একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য দশ টাকা দিল?'

'হ্যাঁ, স্যার। ফস্ করে টাকাটা আমার পকেটে গুঁজে দিল! আমি ভাবলুম,

ডাকে চিঠি যেতে পঁয়তিরিশ পয়সা লাগে, আমি পাচ্ছি দশ টাকা। মোটে তো দু' পা রাস্তা। তাই ওদের কথায় রাজি হয়ে গেলুম।

'ওদের মানে? এই যে বললি একটা লোক? ফের মিথ্যে কথা।'

মানে, একজন লোক আমার সঙ্গে কথা বলছিল। আর একটা লোক পাশে দাঁড়িয়েছিল।'

'তারা তোর চেনা?'

'না স্যার কোনদিন দেখিনি।'

'অচেনা লোক এসে তোকেই চিঠি দেবার কথা বলল কেন?'

'আমি এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলুম কি না, পকেটে একটাও পয়সা নেই ভাবছিলুম কি করে কিছু রোজগার করা যায়, তাই বোধহয় ওরা ঠিক বুঝেছে!'

'লোক দুটোকে দেখতে কেমন?'

'খুব ভাল দেখতেও নয়, আবার খুব খারাপ দেখতেও বলা যায় না!'

'ভাল খারাপের কথা হচ্ছে না। লোক দুটোকে দেখলে কি মনে হয়, চোর-ডাকাতের মতন?'

একটু চিন্তা করে লোকটি বলল, 'আজ্ঞে না।'

'তবে কি ভদ্রলোকের মতন?'

'আজ্ঞে না।'

'চোর ডাকাতের মতনও না। ভদ্রলোকের মতনও না। তবে কিসের মতন?'

'আজ্ঞে, পুলিশের মতন।'

'অ্যাঁ?'

'খুব গাঁট্টাগোট্টা চেহারা আর লম্বা গোঁপ আছে।'

'তুই যে বাজারের সামনে একলা দাঁড়িয়েছিলি, তার কোন সাক্ষী আছে?'

'স্যার, সাক্ষী রেখে কি একলা দাঁড়িয়ে থাকা যায়?'

'ফের মুখে মুখে কথা বলছিস? যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দে।'

'পান্নাদার পাশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, পান্নাদা নিশ্চয়ই দেখেছে আমাকে!'

শিশির দত্তগুপ্ত একজন পুলিশকে বললেন, 'অবিনাশ, একে বাজারের কাছে নিয়ে যাও! লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ, এ সত্যি কথা বলছে কি না।'

পুলিশ দু'জন লোকটিকে নিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল!

কাকাবাবু সন্তুর চিঠিটা দু'তিনবার পড়লেন, কাগজটা উল্টে-পাল্টে দেখলেন ভাল করে। তারপর সেটা এগিয়ে দিলেন নরেন্দ্র ভার্মার দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা সন্তুর হ্যাণ্ডরাইটিং ঠিক আছে তো?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে-জায়গায় সন্তুকে আটকে রেখেছে, সেখানে তো কাগজ-কালি-কলম কিছু পাওয়া যায় না। জঙ্গলের মধ্যে কোন গোপন আস্তানা মনে হচ্ছে।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এরা কুইক কাজ-কাম করে তো! বহোত জলদি চিঠি চলে এল! তার মানে খুব বেশি দূরে নেই! ঠিক কি না? এখন কি করা যাবে?'

শিশির দত্তগুপ্ত চিঠিটা নিয়ে দু'বার পড়লেন। তারপর বললেন, এবারে সব কটাকে জালে ফেলা যাবে! আপনি ওদের সঙ্গে একলা দেখা করবেন। আমি পুলিশ ফোর্স নিয়ে দূরে অপেক্ষা করব। আপনার হাত থেকে ওরা জঙ্গলগড়ের ম্যাপটা যেই নিতে যাবে, অমনি আমরা ক্যাঁক করে চেপে ধরব ওদের!'

কাকাবাবু বললেন, 'দেখা করব মানে? কোথায় দেখা করব? সে রকম কোন জায়গার কথা তো লেখেনি?'

'তাই তো! আসল কথাটাই লিখতে ভুলে গেছে।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'সন্তু তো জঙ্গলগড়ের প্ল্যান এঁকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে!

কাকাবাবু বললেন, 'সেটাই বা পাঠাব কোথায়?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, সন্তু ছোকরা বহোত দুষ্টু আছে। ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট চিঠি লিখেছে, যাতে কিনা আরও টাইম পাওয়া যায়।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু তো আর নিজের ইচ্ছেতে এই চিঠি লেখেনি, ওকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়েছে। এই দ্যাখ কাগজের ওপর এক ফোঁটা রক্ত। এ কার রক্ত বলে মনে হয়?'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'ইস! একটা ছোট ছেলের ওপর অত্যাচার করেছে ওরা। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। একদিন সব কটাকে ধরে চাব্‌কাব!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমার খালি ভয় হচ্ছে, সন্তু আবার পালাবার চেষ্টা না করে! ও যা ছটফটে ছেলে। চুপচাপ বন্দী হয়ে থাকবে না নিশ্চয়ই। পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে আরও বিপদ হবে। ওরা সাংঘাতিক লোক।'

শিশিরবাবু উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, 'আমি একটা জিনিস ভাবছি, ওদের কাছে একটা টোপ দিলে কেমন হয়?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, টোপ? টোপ কী?'

শিশিরবাবু বললেন, 'বেইট! কিংবা ডিকয়। ধরুন, আমরা আর একটা লোককে অবিকল মিস্টার রায়চৌধুরীর মতন সাজিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল। ওরা নিশ্চয়ই তাকে ফলো করবে। তারপর তাকে ধরবে। তখন পেছন পেছন গিয়ে আমরা ওদের সব কটাকে ধরব!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমার মতন একজনকে সাজাবেন? তা আবার হয় নাকি? সে তো ওরা চিনে ফেলবে!'

শিশিরবাবু বললেন, না না, অত সহজ নয়। আমাদের পুলিশ লাইনে ছদ্মবেশের এক্সপার্ট আছে। দেখবেন একজনকে এমন আপনার মতন সাজিয়ে আনব যে, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না। একেবারে ক্রাচ-ট্রাচ সব থাকবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমার একজোড়া ক্রাচ চাই, আজ দুপুরের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবেন। আমার মতন একজনকে সাজাবার দরকার কি, আমি নিজেই তো জঙ্গলে একা যেতে পারি।'

শিশিরবাবু বললেন, 'না না, আপনাকে আর আমরা বিপদের মধ্যে পাঠাতে চাই না। আপনার শরীর খারাপ, তার ওপর অনেক ধকল গেছে এর মধ্যেই!'

নরেন্দ্র ভার্মার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনিই বলুন মিঃ ভার্মা মিঃ রায়চৌধুরীকে কি আবার বিপদের মধ্যে পাঠানো উচিত?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'রায়চৌধুরীকে ত্রিপুরায় পাঠাবার যে এরকম রেজাল্ট হবে, তা তো বুঝিনি আগে বিলকুল সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল কিনা! আমাদের প্ল্যান সব গড়বড় হয়ে গেল!'

শিশিরবাবু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা মিঃ রায়চৌধুরীকে প্ল্যান করে ত্রিপুরায় পাঠিয়েছেন কেন?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, হাঁ হাঁ, এটা কি দিল্লী থেকে প্ল্যান করা হয়েছিল। আমার বস্ মিঃ রাজেন্দ্র ভার্গবের মাথা থেকে এটা বেরিয়েছে। আপনি যেমন বললেন না, সেইরকম আগেই আমরা রাজা রায়চৌধুরীকে এখানে টোপ ফেলেছি।'

বলেই নরেন্দ্র ভার্মা হাসতে লাগলেন। কাকাবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, 'বাঃ বেশ মজা! আমাকে তোমরা ফেলবে, আমার জীবনের বুঝি কোন দাম নেই? গৌহাটি এয়ারপোর্ট থেকে যখন আমায় আবার প্লেনে

তোলা হল, তখনই আমি বুঝেছি আমাকে আগরতলা নিয়ে আসা হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেইজন্যই তো আমি তখন থেকে পাগল সেজে গেলাম!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'তোমার জীবনের দাম? তোমাকে মারতে পারে, এমন বুকের পাটা হোল্ ইণ্ডিয়াতে কিসিকো নেহি হ্যায়। বন্দুকের গুলি খেয়েও তুমি মরো না!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি সত্যিকারের বন্দুকের গুলি কখনো খাইনি! খেলে ঠিকই মরে যাব! খেয়েছি তো ঘুমপাড়ান গুলি!'

শিশির দত্তগুপ্ত তখন কিছুই বুঝতে পারছেন না দেখে কাকাবাবু বললেন, ব্যাপারটা কী জানেন, কলকাতার পার্কে আমায় ঘুম পাড়াবার গুলি মারা হয়েছিল তো! এরকম গুলি তো বাজারে বিক্রি হয় না! তা হলে যে আমাকে মেরেছে, সে এই গুলি পেল কোথায়? আপনি পুলিশের লোক, আপনি জানবেন নিশ্চয়ই, কয়েক মাস আগে একটা হিংস্র ভাল্লুককে ধরবার জন্য দিল্লি থেকে ওইরকম ছ'টা গুলি আনা হয়েছিল ত্রিপুরায়। ভাল্লুকটাকে দুটো গুলিতেই বশ করা গিয়েছিল। তারপর বাকি চারটে গুলি আর পাওয়া যায় নি!'

শিশিরবাবুর মুখে একটা লজ্জার ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সে গুলি চারটে কিভাবে হারাল তা কিছুতেই বোঝা গেল না। অনেক খোঁজ করা হয়েছিল।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'রায়চৌধুরীকে ত্রিপুরায় পাঠানো হল একটা কারণে। সে অনেক বড় ব্যাপার। একটা ইন্টারন্যাশ্নাল গ্যাংকে পাকড়াতে চেয়েছিলাম। এখন এখানে এসে শুনেছি, জঙ্গলগড়, গুপ্তধন, ফলানো সব লোকাল ব্যাপার! ধুত! চল কালই ফিরে যাই!'

কাকাবাবু বললেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ, সন্তুকে এখনো একদল সাঙ্ঘাতিক হিংস্র লোক আটকে রেখেছে। দশটা ইন্টারন্যাশ্নাল গ্যাঙের চেয়েও সন্তুর জীবনের দাম আমার কাছে অনেক বেশি।'

শিশিরবাবু বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার ভাইপোকে ঠিক আমি উদ্ধার করে দেব!'

এই সময় একজন পুলিশ এসে খবর দিল শিশির দত্তগুপ্তের ফোন এসেছে নিচে।

শিশিরবাবু ফোন ধরতে চলে গেলেন আর কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগলেন।

শিশির দত্তগুপ্ত ফিরে এলেন দারুণ উত্তেজিত ভাবে। দরজার কাছ থেকে বেরিয়ে বললেন, 'ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে!'

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, 'কে?'

ওদের তিনজন। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিল, কাল রাতে যারা আপনাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এই তিনজন ছিল সেই দলে। নিজেরাই স্বীকার করেছে। এখন ওদের চাপ দিলে বাকি সব কটার সন্ধান পাওয়া যাবে!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'গুড ওয়ার্ক!'

শিশিরবাবু বললেন, 'বলেছিলুম না পালাতে পারবে না। জাল ছড়িয়ে রেখেছি। ওটা ঠিক ধরা পড়বে। লোক তিনটে লক্ আপে আছে। এখন ওদের জেরা করব, চলুন আমার সঙ্গে!'

নরেন্দ্র ভার্মা যাবার জন্য পা বাড়ালেও কাকাবাবু বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, 'আপনারা ঘুরে আসুন, আমার আর যাবার দরকার নেই! আমি ততক্ষণ বরং জঙ্গলগড়ের ম্যাপটা এঁকে ফেলি।'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'ঠিক আছে। সেই ভাল। চলুন, মিঃ ভার্মা!'

ওরা দরজার বাইরে যেতেই কাকাবাবু আবার ডেকে বললেন, শিশিরবাবু, আমার জন্য দুটো ক্রাচ পাঠাতে ভুলবেন না। আমি একটু নিজে নিজে হাঁটতে চাই!

।। চব্বিশ।।

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনেই সন্তু তরতর করে সেই ঝাঁকড়া গাছটায় চড়তে শুরু করে দিল। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে লুকিয়ে রইল পাতার আড়ালে। তার শরীরে সমস্ত শিরা যেন টানটান হয়ে গেছে। সে আবার ধরা পড়তে চায় না। কিছুতেই।

প্রথমে মনে হয়েছিল অনেকগুলো ঘোড়া আসছে। তারপর বোঝা গেল একটাই ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঘোড়াটা ঠিক এই দিকেই আসছে। সন্তু যে-ঘোড়াটার পিঠে এসেছিল, সেটা শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে আছে।

একটু বাদেই দেখা গেল একটা ঘোড়া এসে দাঁড়াল সন্তুর ঘোড়াটার পাশে। তার পিঠে যে বসে আছে, তাকে চিনতে সন্তুর প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিল। খাকি প্যান্ট আর একটা ছাই-রঙের হাফশার্ট পরা গাট্টাগোট্টা লোক! ঘোড়া থেকে নেমে লোকটি এই গাছের দিকে মুখ ফেরাতেই তার সিন্ধুঘোটকের মতন ঝোলা গোঁফ দেখেই সন্তু চিনতে পারল এ তো সেই 'মেজর'।

একটু দূরে জেলে দু'জনের কথাবার্তা তখনও শোনা যাচ্ছে। 'মেজর' নদীর ধারে এসে উঁকি দিয়ে দেখল একবার। তারপর মুখ উঁচু করে বলল কই হে সন্তুবাবু, কোথায় লুকোলে? চলে এস, ভয় নেই!'

সন্তু একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে রইল, যাতে কোন শব্দ না হয়। কিন্তু পাতার আড়ালে তার সম্পূর্ণ শরীরটা আড়াল পড়েনি। এখানে বেশিক্ষণ আত্মগোপন করে থাকা যাবে না।

মেজর আবার বলল, 'কোন্ গাছে উঠে বসে আছ? ও সন্তুবাবু, শিগগির নেমে এস! সময় নষ্ট করে লাভ নেই!'

সন্তু বুঝতে পারল, সত্যিই সময় নষ্ট হচ্ছে। মেজর সবকটা গাছ ভাল করে দেখতে শুরু করলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে ওঠার সময় তার একপাটি চটি পড়ে আছে গাছের নীচে।

সন্তু ডালপালা সরিয়ে বলল, 'আসছি!'

তারপর সরসরিয়ে নেমে পড়ল। মেজর তার সামনে এসে দাঁড়াতেই সন্তু একটুও অবাক হবার কিংবা ভয় পাবার ভয় না দেখিয়ে খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমায় কি করে খুঁজে পেলেন?'

মেজর সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এ তো খুব সহজ! তুমি আমাদের এই সব ঘোড়া চালাতে পারবে না তা জানি! ঘোড়া তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই তোমায় যেতে হবে! এই ঘোড়াগুলো নদীর ওপারের একটা গ্রামে থাকে। সেইজন্য ছাড়া পেলে ওরা সেই দিকেই যায়!'

সন্তু বলল, 'বিচ্ছিরি ঘোড়া। আমি নেপালে এর চেয়ে অনেক ভাল ঘোড়ায় চেপেছি।'

মেজর বলল, সে যাই হোক। শেষ পর্যন্ত সেই পালালে তা হলে? এখন কি হবে? তুমি আমায় ফাঁসাবার ব্যবস্থা করে এসেছ। রাজকুমার ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে যে, তুমি নেই, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটে একটা গুলি চালাবে না? এখন তোমায় যদি আমি আবার ধরে নিয়ে যাই, তাহলে আমি হয়তো বকশিস পাব, কিন্তু তোমার কি অবস্থা করে ছাড়বে বল তো?'

সন্তু বলল, 'দোষ তো আপনারই। আপনি ভাল করে পাহারা দেননি! কেন? দরজা সবসময় খোলা। 'আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়লুম। কেউ আমায় দেখতেই পেল না।'

মেজর মুচকি হেসে বলল, 'আমি কিন্তু দেখেছি। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সব লক্ষ্য করছিলুম।'

সন্তু এবার লোকটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। কাল রাত্তির থেকেই এ লোকটির ব্যবহার সে ঠিক বুঝতে পারছে না! লোকটা কি ভাল মানুষ, না মিচকে শয়তান?

লোকটি বলল, 'শোন সন্তুবাবু, তোমায় সব কথা খুলে বলি। আমার নাম নরহরি কর্মকার। একটা গভর্নমেন্ট অফিসে সিকিউরিটির ডিউটি

করতুম। একবার লোভের বশে হিরে চুরি করেছি। সেজন্য আজ আমার বড় লজ্জা। কিন্তু নিজের দোষে তারপর আমি ক্রমশই চোর-ডাকাতের দলে জড়িয়ে পড়েছি। এ আমি চাই না। শেষে দাগী আসামী হয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে? তাই আমি ইচ্ছে করে তোমার পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এস, তোমাতে আমাতে দু'জনেই এখন পালাই, তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের চেনা আছে, তাঁকে বলে আমার একটু ব্যবস্থা করে দিও। আমি দু'এক বছর জেল খাটতে রাজি আছি, তার বেশি শাস্তি যেন না হয়।'

সন্তু কথাগুলো শুনে গেল, বিশ্বাস করবে কি করবে না, তা এখন ঠিক করতে পারল না।

নরহরি কর্মকার বলল, 'এখানে আর থাকা ঠিক না। ওরা খুঁজতে শুরু করলে প্রথমে এখানেই আসবে! চল, এক্ষুনি আগরতলা যাই। তুমি আমার সঙ্গে এক-ঘোড়ায় চেপে যেতে পারবে?'

সন্তু বলল, 'আমি এখন আগরতলায় যাব না?'

নরহরি কর্মকার চোখ প্রায় কপালে তুলে বলল, 'আগরতলায় যাবে না? তোমার কাকাবাবু তো সেখানেই আছেন?'

সন্তু বলল, 'তা হোক। এখানে কাছেই জঙ্গলগড়। আমি সেখানে যেতে চাই।'

নরহরি বলল, 'এখানে জঙ্গলগড়? কে বলল তোমাকে?'

সন্তু দূরের জেলে দু'জনের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'ওই ওরা জানে। ওরা বলাবলি করছিল!'

নরহরি অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, 'দূর! ওসব বাজে কথা! ওরকম কত জঙ্গলগড় আছে! কোথাও জঙ্গলের মধ্যে দু'একটা ভাঙা বাড়ি-টাড়ি থাকলেই লোকে তার নাম দেয় জঙ্গলগড়! সেরকম জায়গার তো অভাব নেই এ দেশে!'

সন্তু বলল, 'তবু আমি এই জঙ্গলগড়ে যেতে চাই!'

নরহরি বলল, 'কী ছেলেমানুষি করছ! আসল জঙ্গলগড়ের খবর তোমার কাকাবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। এই রাজকুমার আর অন্যরা কি রকম খোঁজাখুঁজি করেছে!'

সন্তু বলল, 'ওরা যে জঙ্গলগড়ের কথা বলছে, সেখানে একটা সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে!'

নরহরি চমকে উঠে বলল, 'মুদ্রা, মানে টাকা? সোনার টাকা? চলতো!

দু'পা গিয়েই নরহরি আবার থেমে গেল। মুখে ফুটে উঠল একটা

অসহায়ভাব। ডান হাত দিয়ে গোঁফ চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'না, না সন্তুবাবু, আমায় আর লোভ দেখিও না। সোনার টাকা শুনেই আমার মনটা চমকে উঠেছিল! একবার হীরে চুরি করে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি যে আমাদের মতন লোকদের হীরে মুক্তো সোনাদানা সহ্য হয় না! ওসবে একবার হাত দিলেই বিপদ! জঙ্গলগড়ের সোনায় যদি আমি হাত দিই, তা হলেই রাজকুমারের দলবল আমায় একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!'

সন্তু আর কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল জেলে দু'জনের দিকে। নরহরি তার পেছন পেছন এসে কাতরভাবে বলল, কোথায় যাচ্ছ সন্তুবাবু! আমি ভাল কথা বলছি, আগরতলায় চল!

সন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না!

জেলে দু'জন এখন কথা থামিয়ে মন দিয়ে মাছ ধরছে। একটা জাল ফেলে সেটা টেনে তুলছে খুব আস্তে আস্তে। জাল টেনে তোলার সময় তারা একেবারে চুপ করে থাকে।

সন্তু আর নরহরি ওদের কাছে যখন পৌঁছল, তখনও জালটা পুরো টেনে তোলা হয়নি। বড় জেলেটি ওদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শুধু, কোনও কথা বলল না!

জালটা তোলার পর দেখা গেল তার গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট মাছ লেগে আছে চকচকে রূপোলি রঙের।

ছোট জেলেটি জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খালুইতে রাখতে লাগল। বড় জেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, 'এ মাছ বিক্কিরি নেই, মহাজনকে দিতে হবে।'

নরহরি লোকটার ঘাড় চেপে ধরে হুংকার দিয়ে বলল, 'তোর মাছ কে চাইছে? জঙ্গলগড়ের সোনার টাকা কে নিয়েছে, আগে বল্?

লোকটি ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, 'সোনার টাকা। আমি তো সোনার টাকা নিইনি! মা কালীর দিব্যি বলছি!'

'তবে কে নিয়েছে?'

'সে তো সুবল!'

'কোথায় সেই সুবল? এক্ষুনি আমাদের নিয়ে চল তার কাছে?'

ছোট ছেলেটি এবারে বলল, 'সুবলকাকা তো মরে গেছে! তাকে সাপে কামড়েছে।'

নরহরি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, 'মরে গেছে? মিথ্যে কথা বলছিস আমার কাছে? এক্ষুনি থানায় নিয়ে যাব।'

সন্তু বলল, 'ওরা আগেই বলছিল সুবলকে সাপে কামড়েছে। ঠিক আছে, সেই জঙ্গলগড় জায়গাটা কোথায়, আমাদের একটু দেখিয়ে দেবে চল তো।'

নরহরি বলল, 'যেখানে সোনার টাকা পাওয়া গেছে, সেই জায়গাটা আর কে দেখেছে? তুই দেখেছিস?'

বড় জেলেটি বলল, 'বাবু, সেখানে যেও না। সেখানে খুব সাপখোপের উপদ্রব। জায়গাটা ভাল না।'

নরহরি বলল, 'সাপ থাক আর যাই থাক, সে আমরা বুঝব। শিগগির সেখানে আমাদের নিয়ে চল।'

বড় জেলেটি কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, 'সে যে অনেক দূরের পথ। সেখানে তোমাদের নিয়ে গেলে আমার যে আজকের দিনটার রোজগার নষ্ট হয়ে যাবে।'

নরহরি বলল, 'মনে কর, তোর জ্বর হয়েছে। তা হলেও কি মাছ ধরে রোজগার করতে পারবি?'

জেলেটি বলল, 'আমার জ্বর হয়নি, তবু শুধু শুধু মনে করতে যাব কেন? মনে কর, তুমি রাজা, তা হলেই কি তুমি রাজা হয়ে যাবে?'

সন্তু বলল 'ঠিক আছে, সবটা পথ তোমায় যেতে হবে না। খানিকটা দূর গিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দাও ঠিক কোন দিকে যেতে হবে।'

ছোট জেলেটিকে সেখানেই বসিয়ে রেখে ওরা তিনজন চলল, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। তার আগে নরহরি ঘোড়া দুটোকে ঠেলে ঠেলে নদীতে নামিয়ে দিয়ে এল। ঘোড়া দুটো সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল নদীর ওপারে।

খানিকটা দূরে গিয়েও নরহরি থেমে গিয়ে ফিসফিসিয়ে সন্তুকে বলল, 'উহুঃ ওই ছোড়াটাকে ওখানে বসিয়ে রেখে আসা ঠিক হল না। কেউ আমাদের খুঁজতে এলে ওর কাছ থেকে সব কথা জেনে যাবে।'

সে বড় জেলেটিকে বলল, 'এর পর সারাদিন মাছ ধরলে তোর আর কত রোজগার হত?'

জেলেটি বলল, 'মাছ ধরতে পারি না পারি, রোজ মহাজনকে দশ টাকা শোধ দিতে হয়। এখন তো মাছ ওঠেই না!'

নরহরি তার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, 'এই নে। এখন ওই ছেলেটাকেও ডাক। ছেলেটাও আমাদের সঙ্গে চলুক। আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে তোরা আজ গাঁয়ে ফিরে যাবি। খবরদ্দার কাউকে কিছু বলবি না! এসব পুলিশের কাজ, খুব গোপন রাখতে হয়।'

প্রায় এক ঘন্টা চলার পর ওরা নদীর ওপর একটা সাঁকো দেখতে পেল।

খুব লড়বড়ে বাঁশের সাঁকো! সেটার ওপর দিয়ে খুব সাবধানে ওরা এক এক করে চলে এল অন্য ধারে।

আবার নদীর ধার দিয়েই হাঁটতে হল প্রায় দেড় ঘন্টা। এদিকটায় বেশ ঘন জঙ্গল। অনেক গাছের ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে নদীর জলে।

আসবার পথে গোটা দুয়েক গ্রাম চোখে পড়েছে, কিন্তু এই জায়গাটা একেবারে জনমানবশূন্য। কয়েকটা পাখির তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। নদীটাও ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। সামনেই পাহাড় আছে মনে হয়।

এক জায়গায় বড় ছেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'এবার আপনারা যান, আমরা আর যাব না!'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, জঙ্গলগড় আর কতদূর?'

সামনে আর একটুখানি গেলেই দেখতে পাবেন। একেবারে নদীর ধারেই।'

নরহরি জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের গাঁ ছেড়ে এত দূরের জঙ্গলে এসে-ছিলে কেন শুনি? তোমাদের নিশ্চয়ই কোন মতলব ছিল।'

বড় জেলেটি বলল, 'নিয়তি, বাবু নিয়তি! এইদিকে এক গাঁয়ে সুবলের শ্বশুরবাড়ি। একটু আগের ফাঁকা মাঠ দিয়েও যাওয়া যায়, আর এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়েও যাওয়া যায়। তা সুবলের কী দুর্বুদ্ধি হল। বলল, এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যাই, যদি দু'একটা খরগোশ মারতে পারি সেই লোভই তার কাল হল।'

নরহরি বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা এবারে ফিরে যেতে পার!'

বড় জেলেটি বলল, অনেক বেলা হয়ে গেল, আপনারা এখন জঙ্গলে যাবেন, তারপর ফিরবেন কখন? জায়গাটা ভাল না! তাছাড়া দুপুরে খাওয়া-দাওয়াই বা করবেন কোথায়?'

নরহরি বলল, 'সে আমরা বুঝব। তোমরা এখন যাও তো!'

ওরা চলে যাবার পর সন্তু আর নরহরি খুব সাবধানে এগোতে লাগল। একটু বাদেই তাদের চোখে পড়ল, মাটিতে নানারকম গর্ত আর এখানে-সেখানে পাথর আর কাঠের টুকরো ছড়িয়ে আছে!

তারপর দেখা গেল একটা লম্বা পাথরের দেওয়াল। তার মধ্যে কয়েকখানা পাথরের ঘর, কিন্তু কোনোটারই ছাদ নেই। একটা কারুকার্য করা কাঠের দরজাও পড়ে আছে মাটিতে।

পাথরের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সন্তু ভাবল, এই কি তবে সেই জঙ্গলগড়?

।। পঁচিশ ।।

কাকাবাবু একা একাই দুপুরের খাওয়া শেষ করলেন। নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা শিশির দত্তগুপ্তর দেখা নেই। ওঁরা কোন খবরও পাঠাননি। তবে একটু আগে শিশির দত্তগুপ্তর একজন আর্দালি এসে এক জোড়া ক্রাচ্ দিয়ে গেছে।

খেয়ে উঠে কাকাবাবু নিজের আঁকা ম্যাপগুলো দেখলেন কিছুক্ষণ ধরে! মোট পাঁচটা ম্যাপ। তার মধ্যে চারখানা ছিঁড়ে ফেলে একখানা রাখলেন তিনি। সেটাকে আবার নতুন করে আঁকলেন। তারপর সেটাকে পকেটে ভরে রেখে তিনি ক্রাচ বগলে দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার কাছে। অনেকদিন বাদে তিনি নিজে নিজে হাঁটছেন, কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে।

আকাশটা মেঘলা মেঘলা। চারিদিকে কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। বেশ একটা বেড়াবার মতন দিন কাকাবাবু ভাবলেন, এখন সন্তু কোথায়? কি করছে? ছেলেটাকে ওরা ঠিকমতন খেতে-টেতে দিয়েছে তো?

এবারে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দা পার হয়ে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। ক্রাচ্ দিয়ে হাঁটার অসুবিধে এই যে খট্ খট্ শব্দ হয়। কাকাবাবুর নিজস্ব ক্রাচের তলায় রবার লাগানো আছে! কিন্তু সে দুটো তো সঙ্গে আনেন নি।

নিচতলায় যে দু'জন পুলিশের পাহারা দেবার কথা, তারা এখন রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত। কাকাবাবু যে বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তা তারা লক্ষ্যও করল না। কাকাবাবু একটু মুচকি হাসলেন।

সামনের লোহার গেটটা অবশ্য বন্ধ। তালা দেওয়া। অগত্যা কাকাবাবু নিজেই গেটের গায়ে দু'বার থাবড়া মারলেন! সেই আওয়াজ শুনে পুলিশ বেরিয়ে এল আর কাকাবাবুকে দেখে প্রায় ভূত দেখার মতন মুখের ভাব হয়ে গেল তার!

একটু তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, 'এ-এ-এ কি স্যার! আ-অ-আ-প্‌নি!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি একটু বাইরে বেড়াতে যাব, গেটটা খুলে দাও।'

পুলিশটি বলল, 'আ-আ-প্-নি বেড়াতে যা-যা যাবেন? আপনার তো অসুখ! আপনি নিজে নিজে হাঁটছেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'অসুখ ঠিক হয়ে গেছে। খেয়ে ওঠার পর আমার একটু হাঁটাহাঁটি করা অভ্যেস।'

'তবে একটু অপেক্ষা করুন স্যার। আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।' আমরা ততক্ষণে একটু খেয়ে নিই। উনুনে তরকারি ফুটছে।'

'আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব।'

'না স্যার তা হয় না। আমাদের বড় সাহেব বলেছেন।'

'তোমাদের বড় সাহেব কি আমায় আটকে রাখতে বলেছেন? যাও, শিগগির চাবি নিয়ে এস।'

কাকাবাবুর ধমক খেয়ে লোকটি আর তর্ক করতে সাহস করল না। চাবি এনে গেট খুলে দিল।

কাকাবাবু বললেন তোমাদের সাহেব এলে বসতে বোল। আমি ফিরে আসব। আর দিল্লি থেকে যে সাহেব এসেছিলেন, তিনি ফিরলে বোল, আমার যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গেছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন স্যার, বলে যাবেন না?'

'বললুম তো, একটু বেড়াতে যাচ্ছি। অনেকদিন হাঁটা হয়নি ভাল করে।'

গেট থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু কিন্তু বেশিক্ষণ হাঁটলেন না। একটা সাইকেল রিকসা পেয়ে তাতে চেপে বসলেন।

রিকশওয়ালা জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে যাব বাবু?'

কাকাবাবু বললেন, 'চল, যেদিকে খুশি। বেশ মেঘলা মেঘলা দিন, আমায় কোন ভাল জায়গায় একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এস। তুমি দশটা টাকা পাবে।'

রিকশা চলতে শুরু করতেই কাকাবাবু চোখ বুজলেন। যেন তাঁর দুশ্চিন্তাই নেই! সত্যিই তিনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

দু'জন সাইকেল-আরোহী একটু বাদেই কাকাবাবুর দু'পাশ দিয়ে চলে গেল তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতে তাকাতে। খানিক দূর গিয়ে লোক দুটি আবার ফিরে এল। কাকাবাবুকে আবার ভাল করে লক্ষ্য করে তারা চলে গেল খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে। কাকাবাবু এসব কিছুই দেখলেন না। যেন তিনি ঘুমোচ্ছেন।

সাইকেল রিকশাটা শহরের ভিড় ছাড়িয়ে চলে এল একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনেই একটা ছোট পাহাড়। আকাশে মেঘ আরও গাঢ় হয়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

রিকশাওয়ালা থেমে গিয়ে বলল, 'ও বাবু! বৃষ্টি আসতেছে। এবার কোথায় যাবেন?'

কাকাবাবু চোখ মেলে উঠে বসে বললেন, এ কোথায় এসেছ? বাঃ, বেশ জায়গাটা তো।

রিকশাওয়ালা বলল, 'এ দিকটা তো বাবু কুঞ্জবন। কাছেই পুরনো রাজবাড়ি আছে।'

কাকাবাবু বললেন, রাজবাড়ি আছে থাক, সেদিকে, যাবার দরকার নেই, আরও ফাঁকার দিকে চল।'

'জোরে বৃষ্টি এসে যাবে যে বাবু।'

'ও, বৃষ্টি আসবে বলছ! তা হলে তো আর তোমার সাইকেল রিকশায় চলবে না।'

কাকাবাবু রিকশা থেকে নেমে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। যেন তিনি কোন চেনা লোককে খুঁজছেন। কিন্তু কাছাকাছি মানুষ জন কেউ নেই তবে দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসতে দেখা যাচ্ছে।

রিকশা চালককে দশ টাকার নোট দিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'তুমি এবারে যেতে পার।'

রিকশাচালক তবু চিন্তিতভাবে বলল, 'জোর বর্ষা আসছে, আপনি এখান থেকে ফিরবেন কি করে?'

কাকাবাবু বললেন, 'সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। আমি এখন ফিরব না।'

মোষের গাড়িটা কাছে আসতেই কাকাবাবু হাত তুলে সেটাকে থামালেন। গাড়োয়ান ছাড়া সে গাড়িতে আর কেউ নেই। মাঝখানের ছাউনিতে রয়েছে কয়েকটা বস্তা।

কাকাবাবু সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ দিকে যাচ্ছ গো কর্তা?'

গাড়োয়ান বলল, 'যাচ্ছি তো বাবু, অনেক দূর। সেই কমলপুর।

কাকাবাবু সন্তুষ্টভাবে বললেন, 'বাঃ বেশ! আমিও ওই দিকেই যাব। আমায় নিয়ে যাবে? চিন্তা কোর না, যা ভাড়া লাগে তা আমি দেব। তুমি গাড়িটা একটু নিচু কর, নইলে তো আমি উঠতে পারব না!'

কাকাবাবু উঠে বসার পর মোষের গাড়িটা চলতে লাগল ঢিমেতালে। কাকাবাবু ছাউনির তলে বসে গাড়োয়ানের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়তে লাগল জোরে।

সেই বৃষ্টিতে ভিজেই দু'জন সাইকেল-আরোহী আবার আস্তে আস্তে যেতে লাগল মোষের গাড়িটার পাশে পাশে। কাকাবাবুর দিকে তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। কাকাবাবুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই তারা পালিয়ে গেল শাঁ শাঁ করে।

কাকাবাবু বললেন, 'আরেঃ!'

লোক দুটি কিন্তু বেশি দূর গেল না। খানিকটা এগিয়েই আবার

সাইকেল ঘুরিয়ে এদিকে আসতে লাগল। তারা কাছাকাছি এসে পড়তেই কাকাবাবু হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, 'এই যে, শোন, শোন!'

এবার তারা উল্টোদিক থেকে আসছে বলে গাড়ির পাশে পাশে চলতে পারে না। একজন থেমে পড়ল। কাকাবাবু মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে শোন, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?'

লোকটি যেন কিছুই জানে না এইরকমভাবে শুকনো মুখে বলল, 'রাজকুমার? কোন্ রাজকুমার?'

কাকাবাবু কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'আমি যে রাজকুমারের কথা জিজ্ঞেস করছি, তাকে তুমি চেন না?'

লোকটি বলল, 'কই, না তো!'

কাকাবাবু বললেন, 'তবে এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? যাও, ভাগো।' ঠিক তক্ষুনি একটা জিপগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সাইকেল আরোহী আর কাকাবাবু দু'জনেই তাকালেন সেদিকে।

জিপটিও এসে থামল মোষের গাড়ির পাশে। কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরা লম্বা মতন একজন লোক মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

কাকাবাবু লোকটির আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে তুমি জান না কি, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, জানি। আমি রাজকুমারের কাছেই যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?'

কাকাবাবু বললে, 'নিশ্চয়ই। বাঃ, বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

মোষের গাড়ির গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ওহে, জিপগাড়ি পেলে কে আর মোষের গাড়িতে যেতে চায় বল। তোমার গাড়িটা নিচু কর, আমি নেমে পড়ি। এই নাও, তুমি দশটা টাকা নাও।'

কাকাবাবু জিপগাড়িতে বসলেন সামনের সিটে। পেছন দিকে তিনজন গুন্ডামতন চোহারার লোক বসে আছে গম্ভীরভাবে।

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, ব্যবস্থা বেশ ভালই। আমি নিজে থেকে যেতে না চাইলে তোমরা কি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে?'

কালো শার্ট পরা লোকটি বলল, 'আপনি কী করে জানলেন যে আমরা এই রাস্তায় আসব।'

কাকাবাবু আবার কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'বাঘ জঙ্গলে বেরুলেই তার পেছনে ফেউ লাগে। আমি জানতুম, আমি যে-দিকেই যাই না কেন, তোমরা ঠিক আমার পেছন পেছন আসবে।'

কালো শার্টপরা লোকটাও অকারণে হেসে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে পৌঁছতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে?'

লোকটি বলল, 'অন্তত তিন ঘন্টা তো বটেই। সন্ধ্যে হয়ে যাবে!

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে আমি এই সময়টা ঘুমিয়ে নিচ্ছি। কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। পৌঁছে গেলে আমায় ডেকে দিও।'

তারপর কাকাবাবু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন মনে হল। গাড়ির লোকগুলো এই এতটা সময় কোন কথা বলল না। তবে তারা কেউ ঘুমোল না।

জিপটা শেষ পর্যন্ত থামতে কাকাবাবু জেগে উঠলেন নিজে থেকেই।

সন্তুকে যে-বাড়ীতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়ির গেটের সামনে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের হাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। সেই আলোতে কাকাবাবু চিনতে পারলেন রাজকুমারকে।

গাড়ি থেকে নেমে এসে কাকাবাবু রাজকুমারের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তা হলে আবার দেখা হল! এত শিগগিরই যে দেখা হবে তা ভাবিনি। আশা করি এবারে আর মারামারি করার দরকার হবে না। সন্তুর চিঠি আমি পেয়েছি। আমি জঙ্গলগড়ের ম্যাপ দিলে তোমরা সন্তুকে ছেড়ে দেবে। আশা করি ভদ্রলোকের মতন তোমরা কথা রাখবে। এই নাও জঙ্গলগড়ের ম্যাপ।

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু ম্যাপটা বার করে এগিয়ে দিলেন রাজকুমারের দিকে।

॥ ছাব্বিশ ॥

রাজকুমারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছ'সাত জন লোক। আজ আর এদের ছদ্মবেশ ধরার কোন চেষ্টা নেই। মুখ দেখলেই বোঝা যায় এরা বেশ হিংস্র ধরনের মানুষ। ওদের পেছনে দেখা যাচ্ছে তিনটে ঘোড়া। সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে, আকাশ এখনো পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। মশালের আগুনে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

রাজকুমারের মুখখানা গম্ভীর, থমথমে। সে ম্যাপটা নেবার জন্য হাত বাড়াতেই কাকাবাবু নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'উহুঁ।' আগে সন্তুকে ডাকো। তুমি সন্তুকে ফেরত দেবে, তারপর আমি তোমার ম্যাপটা দেব, এইরকমই তো কথা ছিল!'

রাজকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রায়চৌধুরী, তোমার সাহস

আছে বটে! এ-কথা মানতেই হবে! ভেবেছিলুম, তোমাকে তুলে আনবার জন্য আবার অনেক ঝামেলা করতে হবে। কিন্তু তুমি নিজেই এসে ধরা দিয়েছ। তুমি খোঁড়া মানুষ, তাও একা আমরা এখানে এতজন আছি। এবারে কিন্তু তোমাকে আর কেউ এখানে বাঁচাতে আসবে না! সে ব্যবস্থা করা আছে।'

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, বাঁচাবার প্রশ্ন উঠছে কি করে? তোমরা আমাকে মারবে কেন? তোমরা যা চেয়েছিলে, তা তো দিয়েই দিচ্ছি। ম্যাপ নাও। সন্তুকে ফেরত দাও!

'বাঃ! তুমি কি আমাদের এতই বোকা পেয়েছ? ওই ম্যাপটা যদি জাল হয়? সন্তুকে আমরা এ বাড়িতে আটকে রেখেছি। সে ভাল আছে। এই ম্যাপ অনুযায়ী তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে! আমাদের কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে তারপর সন্তুকে তুমি ফেরত পাবে।'

'আমাকে আবার কতদূর নিয়ে যাবে? তার চেয়ে এক কাজ কর না। আমিও এখানে সন্তুর সঙ্গে থাকছি। তোমরা এই ম্যাপ নিয়ে চলে যাও। গেলেই বুঝতে পারবে আমি ঠিক ম্যাপ দিয়েছি, না ভুল দিয়েছি।'

'দেখি ম্যাপটা।'

'বললুম না, আগে সন্তুকে দেখাও, তারপর ম্যাপ পাবে?'

'কেন পাগলামি করছ, রায়চৌধুরী? আমরা তোমার কাছ থেকে ওটা জোর করে কেড়ে নিতে পারি না? দেরি করে লাভ নেই। চল রওনা হয়ে পড়া যাক।'

'আমাকে যেতেই হবে বলছ? তবে সন্তুকে ডাকো। সে ও আমাদের সঙ্গে যাবে।' 'না! সে ছেলেমানুষ, তাকে নিয়ে যাবার দরকার নেই!

একটু আগে থেকেই চলন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এই সময় দু'জন অশ্বারোহী সেখানে এসে পৌঁছল। ঘোড়া থেকে নেমে তারা ছুটে এল রাজকুমারের কাছে। একজন ফিসফিস করে বলল, 'কোথাও পাওয়া গেল না। সব জায়গায় তল্লাশ করেছি—'

রাজকুমার সেই লোকটির ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলা মেরে ছিটকে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, অপদার্থ। উল্লুক।'

তারপর রাজকুমার চোখ ফেরাতেই দেখল কাকাবাবু তার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন।

রাজকুমার বলল, 'তোমার কাছে গোপন করে আর লাভ নেই। তোমার গুণধর ভাইপোটি পালিয়েছে। মহা বিচ্ছু ছেলে।'

কাকাবাবু বললেন, 'পালিয়েছে? এটা কি সত্যি কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। ভোরবেলা সে চম্পট দিয়েছে। সারা দিন ধরে খোঁজা হচ্ছে তাকে। শুধু শুধু পালিয়ে তার কি লাভ হল? এই জঙ্গলের মধ্যে না খেয়ে থাকবে। বেশি দূর তো যেতে পারবে না।'

'এই জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই?'

'প্রায়ই ভল্লুকের উপদ্রব হয়! বুঝতেই পারছ, আমাদের কোন দায়িত্ব নেই! আমরা তাকে ভালভাবেই রেখেছিলাম এখানে, কোন অত্যাচার করিনি!'

'ওর চিঠিতে এক ফোঁটা রক্ত দেখেছি। সেটা কার?'

রাজকুমারের পাশ থেকে 'কর্ণেল' বলল, রাজকুমার, শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ আছে? এই বুড়োটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলুন না!

রাজকুমার বলল, রায়চৌধুরী, ঘোড়ায় ওঠ। ঘোড়া চালাতে জান নিশ্চয়ই। এক পায়ে পারবে?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, পারব। চল তা হলে! কিন্তু তারা কথা রাখতে পারলো না!

মোট পাঁচটা ঘোড়া। সেগুলোর পিঠে চড়ে পাঁচজন যাত্রা শুরু করল, আর বাকিরা রয়ে গেল সেখানেই।

কাকাবাবু ম্যাপটা রাজকুমারের হাতে দিয়ে বললেন, 'এ সব রাস্তা তোমরাই ভাল চিনবে। তোমরাই পথ ঠিক কর। আসল জায়গায় পৌঁছে তারপর আমি দেখব।'

রাজকুমার আবার ম্যাপটা কর্ণেল-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এটা দেখে আগে চল।'

কর্ণেল পকেট থেকে একটা টর্চ বার করে সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'এ জায়গাটাতো আমার চেনা।'

রাজকুমার বলল, জায়গাটা তো আমিও আগে দেখেছি। কিন্তু সেখানে গোপন একটা দরজা আছে। তার সন্ধান শুধু এই রায়চৌধুরীই জানে।

তারপর শুরু হল অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাত্রা। মশালগুলো ওরা নিবিয়ে ফেলেছে। আকাশে অল্প জ্যোৎস্না আছে। জঙ্গলটাকে মনে হচ্ছে ছায়ার রাজ্য।

কর্ণেল চলেছে আগে আগে। কাকাবাবুকে মাঝখানে রেখে ঠিক তার পেছনেই রয়েছে রাজকুমার। তার হাতে রিভলভার।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ কর্ণেল-এর ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক তুলে সামনের দু-পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। কর্ণেল টর্চের আলো ফেলল

সামনে। কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু ঘোড়াটা আর যেতে চায় না।

রাজকুমার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল?'

কর্ণেল বলল, 'মনে হচ্ছে সামনে কোন বড় জানোয়ার আছে। ঘোড়া ভয় পেয়েছে।'

রাজকুমার বলল, 'গুলি চালাও! যাই থাক না কেন, সরে যাবে!'

কর্ণেল বলল, যদি হাতির পাল থাকে? তা হলে গুলি চালালে তো আরও বিপদ হবে!'

রাজকুমার বলল, 'না, না, এ জঙ্গলে হাতির পাল নেই, আমি জানি। চালাও গুলি!'

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পর পর দু'বার গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ হল! অনেক দূরে যেন একটা হুড়মুড় শব্দ শোনা গেল! আর কিছু না।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার এগোতে লাগল ওরা। এক জায়গায় নদী পার হতে হল। কর্ণেল মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে ম্যাপ দেখে নিচ্ছে। প্রায় তিন ঘন্টা পরে তারা পৌঁছে গেল জঙ্গলগড়ে। সবাই ঘোড়া থেকে নামবার পর আবার জ্বালানো হল মশাল।

রাজকুমার বলল, এ জায়গাটায় আমি আগে অন্তত তিনবার এসেছি। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাইনি। রায়চৌধুরী, তুমি ধোঁকা দিচ্ছ না তো? এটাই আসল জঙ্গলগড়? উদয়পুরের কাছে যেটা সেটা নয়?

কাকাবাবু বললেন, 'এক সময়ে এখানেই আমি তাঁবু গেড়ে ছিলাম কয়েকদিন।'

রাজকুমার বলল, 'সে খবর আমরা রাখি। কিন্তু তুমি আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছ। স্বর্ণমুদ্রা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'এখানেই!'

'তবে গুপ্তধন কোথায় আছে, চটপট দেখিয়ে দাও।'

'গুপ্তধনের সন্ধান আমি জানতে পারলে এখানে ফেলে রেখে যাব কেন? সেবারেই তো নিয়ে যেতে পারতুম।'

'গুপ্তধনের সন্ধান তুমি পেয়েছিলে ঠিকই। তুমি চেয়েছিলে একলা তা উদ্ধার করবে। তোমার সঙ্গে যারা ছিল, তাদের জানতে দিতে চাওনি। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে—'

এই সময় কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে দপ্ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। তারপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। ঠিক আগেকার দিনের সৈন্যের মতন সাজ পোশাক পরা দু'জন লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

তাদের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা। আর তাদের পেছনে দেখা গেল আর একজন লোককে। এর গায়ে মখমল আর জরির পোশাক। মাথায় মুকুট অনেকটা যাত্রাদলের রাজা কিংবা সেনাপতির মতন দেখতে। হাতে খোলা তলোয়ার।

সেই লোকটিকে দেখেই রাজকুমারের সঙ্গীরা সম্মান দেখিয়ে মাথা নিচু করল। রাজকুমার বলল, 'আসুন স্যার।'

কাছে আসার পর লোকটিকে চিনতে পেরে কাকাবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, শিশির দত্তগুপ্ত!'

পুলিশের বড়সাহেব শিশির দত্তগুপ্ত এই রকম পোশাক পরার পর তাঁর চেহারা যেন বদলে গেছে। মুখের হাসিটাও অন্যরকম। এক দিকের ঠোঁট বেকিয়ে হেসে তিনি বললেন, 'আমি সেনাপতি দেবেন্দ্র বর্মার বংশধর। রাজা অমরমাণিক্যের লুকনো ধনসম্পদের আমিই উত্তরাধিকারী।'

কাকাবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। যেন এমন মজা তিনি বহুদিন পাননি।

রাজকুমার কাকাবাবুর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বলল, চুপ কর, বেয়াদব। ওঁর সামনে তুই হাসছিস।'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'এই। ওঁর গায়ে হাত তুলো না। উনি ভদ্দরলোক। উনি নিজেই সব দেখিয়ে দেবেন। মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি বিদেশী! আমাদের ধনসম্পদের ওপর আপনার কোনও অধিকার নেই। আপনি জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিন। তারপর আপনাকে আমরা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

কাকাবাবু বললেন, 'তাই নাকি? আপনার পরিচয় আমি জেনে ফেলেছি, তারপরও আপনি আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন? আপনি এত বোকা? আপনি পুলিশের বড়কর্তা, তাই এইসব গুণ্ডা বদমাইশগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। সেইজন্যই এরা এত বেপরোয়া!'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'আমরা বনেদি বংশের লোক। কথা দিলে আমরা কথা রাখি। আমি ত্রিপুরেশ্বরীর নামে শপথ করছি, আপনার কোন ক্ষতি করা হবে না। আমাদের কাজ উদ্ধার হলেই আপনাকে আমরা সসম্মানে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, 'আর যদি কাজ উদ্ধার না হয়?'

শিশির দত্তগুপ্ত এবার তাঁর তলোয়ারটা কাকাবাবুর বুকের কাছে তুলে কর্কশভাবে বললেন, তা হলে এক কোপে আপনার মুণ্ডুটা ধড় থেকে নামিয়ে দেব। তারপর আমার কপালে যা-ই থাক!'

।। সাতাশ ।।

কাকাবাবু হঠাৎ ক্র্যাচটা তুলে খুব জোরে মারতেই তলোয়ারটা শিশির দত্তগুপ্তর হাত থেকে উড়ে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে!

রাজকুমার আর অন্যরা দৌড়ে এসে কাকাবাবুকে চেপে ধরল। কর্ণেল কাকাবাবুকে মারবার জন্য ঘুঁসি তুলতেই কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, দাঁড়াও! আমি তোমাদের গুপ্তধনের গুহা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

রাজকুমারের দিকে ফিরে তিনি ধমকের সুরে বললেন, তোমরা কথা রাখতে শেখনি। সন্তুকে ফেরত দেবার কথা ছিল তোমাদের।'

শিশির দত্তগুপ্তর দিকে ফিরে তিনি বললেন, আপনি সেনাপতি বংশের ছেলে। সেনাপতির মতন পোষাক পরলেই সেনাপতি হওয়া যায় না। তলোয়ারটা শক্ত করে ধরতেও শেখোনি?'

রাজকুমার বলল, 'তোমার চালাকি অনেক দেখেছি। আর বেশি বকবক করতে হবে না! এবারে ভালয় ভালয় জায়গাটা দেখাও।'

শিশির দত্তগুপ্ত হুকুম দিল, 'ক্রাচ দুটো কেড়ে নাও ওর কাছ থেকে।'

কাকাবাবু বললেন, তার দরকার নেই। আমি শুধু আপনাকে দেখিয়ে দিলাম যে তলোয়ার ঠিক মতন ধরতে না শিখলে ও জিনিস নিয়ে ছেলে খেলা করতে নেই। এখান থেকে আরও খানিকটা দূরে যেতে হবে।'

একটা ভাঙা দেওয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন কাকাবাবু। একজন মশালধারী চলল তাঁর আগে আগে আর বাকি সবাই পেছনে। দত্তগুপ্ত তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিয়ে খাপে ভরে নিয়েছে! এখন তার হাতে একটা রিভলবার। সেই রিভলভারের নল কাকাবাবুর পিঠে ঠেকান।

কাকাবাবু বললেন, 'সেই গুপ্তধন পেলে কে নেবে? আপনি, শিশিরবাবু, সেনাপতির বংশ। আর, রাজকুমার বলেছে, সে রাজবংশের ছেলে। তা হলে?'

শিশির দত্তগুপ্ত বলল, 'সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না।'

কাকাবাবু বললেন, 'রাজা অমরমাণিক্য বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি তাঁর জিনিসপত্র এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে কেউ তার সন্ধান না পায়। সকলেই ভাবে যে, দেয়ালের গায়ে বা পাথরের ওপরে। কোথাও কোন বোতাম-টোতাম থাকবে, সেটা টিপলেই দরজা খুলে যাবে। সেইরকমভাবে গুপ্তধন খুঁজতে এসে বহুলোক এখানকার বাড়িঘর সব ভেঙেই ফেলেছে। এই যে ডানদিকের বড় পাথরটা, এর গায়েও গাঁইতির দাগ। আসলে এখানে সেরকম কিছুই নেই। যা কিছু আছে সবই মাটির

তলোয়ারটা শিশির দত্তগুপ্তর হাত থেকে উড়ে গিয়ে
পড়ল অনেক দূরে

নিচে! মশালটা নিচের দিকে দেখাও এখানে কোথাও একটা ঈগল আঁকা আছে!'

অমনি দু'দুটো মশাল নিচে নেমে এল, সবাই এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু সেখানে কোন পাখিটাখির ছবি পাওয়া গেল না!

কাকাবাবু চারদিক ভাল করে দেখে নিলেন। মশালের আলোতে যে টুকু দেখা যায়, তা ছাড়া আর সব দিকেই ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার। আকাশ মেঘে ঢাকা পড়েছে।

কাকাবাবু বললেন, 'পেলে না? তাহলে কি ছবিটা মুছে গেল? না তাতো হতে পারে না! ভাল করে দেখ তো এখানে একটা বড় তেঁতুল গাছও আছে কিনা?'

কিন্তু সেখানে কোন তেঁতুলগাছও নেই।

কাকাবাবু বললেন, এমনও হতে পারে, গাছটা কেউ কেটে নিয়ে গেছে। জঙ্গলের গাছ তো অনবরতই লোকেরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে! তা হলে চলো তো পাথরটার ওদিকে।'

কাছাকাছি কোনো পাহাড় না থাকলেও সেখানে একটা বেশ বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে।

সেই পাথরের ওদিকটায় যেতেই মশালের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল একটা সাদা রুমাল।

একটা লোক দৌড়ে গিয়ে রুমালটা তুলে নিল। শিশির দত্তগুপ্তর কাছে এনে সে বলল, 'স্যার, এই রুমালটা টাটকা। আজই কেউ ফেলে গেছে!'

শিশির দত্তগুপ্ত রুমালটা মেলে ধরল। আর এক কোণে ইংরেজি অক্ষরে 'ভি' লেখা।

কাকাবাবু বললেন, 'তার মানে আরও কেউ আজ এখানে গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিল। দ্যাখ, সে আবার কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে কি না।'

চারিদিকে মশাল ঘুরিয়ে দেখা হল, মানুষ জনের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু একদিকে একটা তেঁতুলগাছ আছে। রুমালটা পড়ে ছিল সেই গাছটার কাছেই।

কাকাবাবু সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে গাছটার গোড়ার কাছে বসে পড়ে বললেন, এই তো ঈগলপাখির ছবি!'

সবাই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাকাবাবুর ওপরে।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে শিশির দত্তগুপ্তকে বললেন, 'দেখি আপনার তলোয়ারটা'।

শিশির দত্তগুপ্ত তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে দিতেই কাকাবাবু সেটা, তুলে ধরে বললেন, আপনারা জঙ্গলগড়ের চাবি খুঁজছিলেন, এই দেখুন এটাই জঙ্গলগড়ের চাবি। দেখবেন?

শুধু মটির ওপরই বেশ বড় একটা ঈগলপাখি আঁকা। মাটি কেটে কেটে তার ওপর চুন বা ঐ জাতীয় কিছু ছড়িয়ে ছবি আঁকা হয়েছিল, বৃষ্টির জলে রং ধুয়ে মুছে গেলেও এখনও পাখির আকারটা বোঝা যায়। পাখির চোখ দুটো পাথরের।

কাকাবাবুর তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে পাখিটার ডান চোখটা তোলার চেষ্টা করলেন। সেটা সহজেই উঠে এল। সেই ফুটো দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে কাকাবাবু গর্তটাকে বড় করতে লাগলেন! তাতেও বিশেষ অসুবিধে হল না। গর্তটা হাত ঢোকাবার মতন বড় হতেই কাকাবাবু তার ভেতর থেকে একটা তামার নল টেনে বার করলেন।

তারপর বললেন, 'সেই অতদিন আগেও কী রকম চমৎকার কপিকল ব্যবস্থা ছিল দেখ! এটা দিয়ে কাজ সারতে বেশী গায়ের জোর লাগে না। একটা বাচ্চা ছেলেও পারবে।

কাকাবাবু সেই তামার নলটা ধরে ঘোরাতে লাগলেন। কয়েক পাক ঘুরিয়েই বললেন, 'কাজ হয়ে গেছে। এবারে দ্যাখো।'

সবাই হাঁ করে ঈগলপাখির ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সেখানে কিছুই ঘটল না।

শিশির দত্তগুপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'ওই পাথরটার কাছে আলো নিয়ে দেখুন! এখানে কি দেখছেন?'

মশালের আলো সেদিকে নিতেই দেখা গেল যে, পাথরের চাঁইটা খানিকটা সরে গেছে, সেখানে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই ছুটে গেল সেদিকে। গর্তটার ভেতরে অন্ধকার। ভেতরে কিছুই দেখা যায় না।

কাকাবাবু সেখানে গিয়ে বললেন, 'এটা হল সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ। সুড়ঙ্গটা সোজা নয়। এখান থেকে নিচে নামলেই সামনের দিকে আসল সুড়ঙ্গটা দেখা যাবে।

সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে সেই গর্ত দিয়ে নামতে যাচ্ছিল, শিশির দত্তগুপ্ত রিভলবার তুলে বলল, 'খবরদার! আর কেউ যাবে না। প্রথমে শুধু আমি যাব!'

কর্ণেল বলল, 'স্যার, প্রথমেই আপনি যাবেন? ভেতরে যদি সাপখোপ থাকে?'

শিশির দত্তগুপ্ত বলল, 'যাই থাকুক, প্রথমে আমি গিয়ে দেখব। দরকার হলে তোমাদের ডাকব। কারুর কাছে টর্চ আছে?

কেউ টর্চ আনেনি। কাকাবাবু নিজেই তার পকেট থেকে একটা সরু টর্চ বার করে বললেন, এটা দিতে পারি। এবারে আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

শিশির দত্তগুপ্ত কাকাবাবুর কাছ থেকে টর্চটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে কঠোরভাবে বলল, 'একে ধরে রাখ। পালাবার যেন চেষ্টা না করে। ফিরে এসে এর ব্যবস্থা করব। আমি ভেতর থেকে যদি ডাকি, তাহলে তোমরা কেউ যাবে।'

টর্চের আলোয় দেখা গেল, সেই গর্তটা এক মানুষের চেয়ে কিছুটা বেশি গভীর! ওপর থেকেই সবাই দেখতে পেল, শিশির দত্তগুপ্ত সেই গর্তের মধ্যে নেমে আবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সেই কুড়িয়ে পাওয়া রুমালটা দিয়ে কাকাবাবু হাওয়া খেতে লাগলেন। তার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল, এখন মুখখানা বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছে ভীষণ লম্বা। তবু প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, শিশির দত্তগুপ্তর কোন সাড়াশব্দ নেই।

গর্তটার মুখের কাছে মুখ দিয়ে রাজকুমার চিৎকার করে ডাকল, স্যার। স্যার।'

কোনও উত্তর এল না।

রাজকুমার এইরকম ডেকে চলল অনেকবার। তার ডাকেরই খানিকটা প্রতিধ্বনি শোনা গেল কিন্তু আর কোন শব্দ নেই।

রাজকুমার বলল, 'কি হল? স্যার কোনও উত্তর দিচ্ছেন না কেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি কি জানি! সে তোমাদের স্যারের ব্যাপার।

কর্ণেল বলল, আর একজন কারুর ভেতরে গিয়ে দেখা দরকার।'

রাজকুমারও গর্তে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে। ওপর থেকে কর্ণেল জিজ্ঞেস করল, 'কি হল, কিছু দেখতে পাচ্ছেন, রাজকুমার?

ভেতর থেকে শোনা গেল, 'বড্ড অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' কর্ণেল বলল, 'আমরা ডাকলে সাড়া দেবেন। স্যারের টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন না?'

রাজকুমারের কাছ থেকে আর কোনও উত্তর এল না! এবার কর্ণেল শুরু করল ডাকাডাকি। রাজকুমার একেবারে নিশ্চুপ।

কর্ণেল মুখ তুলে বলল, 'কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছে। সেইজন্য সাড়া দিচ্ছে না। সাপটাপ থাকলেও সঙ্গে-সঙ্গেই তো কিছু একটা হয়ে যায় না।'

কাকাবাবু বললেন, 'এবারে তুমি নেমে দেখবে নাকি?'

কর্ণেল বলল, নিশ্চয়ই। আমি কি ভয় পাই?'

কর্ণেল-এর কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল, সেটা খুলে নামিয়ে রেখে সে গর্তটার মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিল। তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ে প্রথমেই সুড়ঙ্গে না ঢুকে সেখান থেকেই ডাকতে লাগল, 'স্যার! রাজকুমার। আপনারা কোথায়?'

কোনও উত্তর না পেয়ে সে সুড়ঙ্গে মাথা ঢোকাতেই কেউ যেন হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে ঢুকিয়ে নিল ভেতরে।

অন্য যারা ছিল, তারা দারুণ ভয় পেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কাকাবাবু তাদের বললেন, 'ওহে, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তো পালাও! ভেতরে জুজু আছে মনে হচ্ছে।

লোকগুলো কি করবে ঠিক করতে পারছে না। তখুনি দেখা গেল গর্তটার ভেতর থেকে কার মাথা বেরিয়ে আসছে। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, হাতটা দাও, আমি টেনে তুলছি।'

গর্ত থেকে উঠে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। তাঁকে দেখেই কর্ণেল-এর দলবল দৌড় মারল।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'যাক, ওগুলো যাক। আস্‌লি চাঁইগুলো ধরা পড়ে গেছে। খুব বুদ্ধি বার করেছিলে তুমি, রাজা।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি যে, শিশির দত্তগুপ্তই নাটের গুরু! পুলিশের কর্তা বলেই ও বড় বড় সব ক্রিমিনালকে নিজের কাজে লাগিয়েছে। তোমার রুমালটা প্রথমে না দেখতে পেয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলুম।'

নরেন্দ্র ভার্মা গর্তের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'কেয়া হুয়া?' উলোগকো বাঁধকে উপারে লে আও।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ভেতরে থাকতে তোমার কষ্ট হয়নি তো? দুটো বেশ বড় ঘর।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তোমাকে এবারে সারপ্রাইজ দেব, রাজা। বল তো ভিতরমে কে কে আছে?

কাকাবাবু বললেন, তার মানে?'

নরেন্দ্র ভার্মা একগাল হেসে বললেন, 'সন্তু! দ্যাট নটি বয়।'

কাকাবাবু সত্যিকারের অবাক হয়ে বললেন, সন্তু? এর ভেতরে?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, হাঁ! কেয়া আজিব বাত। ও ছেলেটার কিন্তু বুদ্ধি সাঙঘাতিক।'

কাকাবাবু বললেন, সন্তু এখানে? ও সুড়ঙ্গের পথই বা কি করে জানল?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'জানেনি। লেকিন, আর একটু হলেই জেনে ফেলত। তোমার ম্যাপ পেয়ে তো আমি দলবল নিয়ে বিকেলেই এখানে পঁহুছে গেছি! তুমি শর্টকাট রাস্তা বাতলে দিয়েছিলে। এখানে এসে দেখি, ওই ঈগলের পাথরের আঁখ নিয়ে সন্তু নাড়াচাড়া করছে। পাশে অন্য একটা লোক।'

কাকাবাবু বললেন, সন্তু কি রাজকুমারের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'হাঁ। তারপর গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঠিক এখানে হাজির হয়ে গেছে। ওদের দু'জনকেও আমরা সুড়ঙ্গের অন্দরমে নিয়ে গেলাম। ওই তো সন্তু উঠছে।

তলা থেকে কেউ ঠেলে তুলেছে সন্তুকে, দু'হাতের ভর দিয়ে সে ওপরে উঠে এল। তারপর কাকাবাবুর দিকে চেয়ে সে লাজুকভাবে হাসল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছিস তো? কোথাও লাগেটাগেনি তো?'

সন্তু বলল, 'না।'

কাকাবাবু বললেন, 'এবারে সত্যিই তোর জন্য চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলুম! এ লোকগুলো বড় সাঙঘাতিক' চল, কালই ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। তোর স্কুল খুলে গেছে না।'

সন্তু বলল, 'স্কুল না, কলেজ!'

ভূপাল রহস্য

।। এক।।

কাকাবাবু দারুণ চটে গেলেন নিপুদার ওপর।

নিপুদা মানুষটি খুব আমুদে ধরনের, সব সময় বেশ একটা হৈ-চৈ এর মধ্যে থাকতে ভালবাসেন, আর কথাও বলেন জোরে জোরে।

নিপুদা আমার জামাইবাবুর ছোট ভাই। গত বছর আমার ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। ছোড়দি আর জামাইবাবুরা এখন থাকে মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শহরে। নিপুদা ভূপালেই পড়াশুনা করেছে, চাকরিও করে সেখানে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স।

অফিসের কাজে নিপুদাকে প্রায়ই আসতে হয় কলকাতায়। এসেই চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছটা বাংলা সিনেমা থিয়েটার দেখে ফেলে। আমাদের খাওয়াতে নিয়ে যায় পার্কস্ট্রিটের ভাল ভাল হোটেলে। নিপুদা এলে আমাদের সময়টা বেশ ভালই কাটে।

কিন্তু নিপুদার কথা শুনে যে কাকাবাবু প্রথমেই এতটা চটে যাবেন তা আমিও বুঝতে পারিনি।

কাকাবাবু নিজের ঘরে বসে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে কিছু একটা পুরোনো দলিল পরীক্ষা করছিলেন। আর অন্যমনস্কভাবে পাকাচ্ছিলেন বাঁদিকের গোঁফ। নিপুদা সে-ঘরে ঢুকেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। কাকাবাবু, তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আরে, আরে ও কি, না, না, দরকার নেই।'

কাকাবাবু পছন্দ করেন না কেউ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করুক। কাকাবাবুর একটা পা অকেজো বলেই বোধহয় তাঁর বেশি সঙ্কোচ। নিপুদা তবু জোর করে প্রণাম সেরে নিয়ে বসল। তারপর বলল, কাকাবাবু কেমন আছেন? ওঃ, নেপালে তো আপনারা একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে এলেন, পুরো একটা গুপ্তচর চক্রকেই ধরে ফেললেন। ভূপালের কাগজেও খবরটা খুব বড় করে বেরিয়েছিল। আমরা অবশ্য ওখানে বোম্বের খবরের কাগজও পাই... প্রথমে ওরা খবর দিয়েছিল, আপনি বুঝি সেই অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান, ইয়েতি যাকে তাই আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আচ্ছা কাকাবাবু ইয়েতি বলে সত্যিই কি কিছু আছে?

কাকাবাবু মুখখানা একটু হাসি হাসি করে বললেন, 'কি জানি!'

নিপুদা আবার বলল, 'আর ওই যে লোকটা, কেইন শিপ্‌টন, ও কি পালিয়েই গেল? 'ওকে আর ধরা গেল না?'

কাকাবাবু দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'না!'

আমি বুঝতে পাচ্ছি কাকাবাবু নিজের কোনও একটা চিন্তা নিয়ে মগ্ন আছেন, কথা বলার মুডে নেই।

নিপুদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু, আপনি কখনও ভূপাল গেছেন? একবার চলুন না, দারুণ জায়গা, আপনার খুব ভাল লাগবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'ভূপাল আমি গেছি। দুবার বোধহয়। না, তিনবার।'

নিপুদা তবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আর একবার চলুন। এবারেই আমার সঙ্গে চলুন, একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে।'

'এখন তো আমার যাওয়া হবে না। অন্য কাজে ব্যস্ত আছি।'

'জানেন, ভূপালে গত এক মাসের মধ্যে তিনটে সাংঘাতিক খুন হয়েছে। পুলিশ কিচ্ছু করতে পারছে না।'

এবার কাকাবাবু মুখ তুলে সোজা তাকালেন নিপুদার দিকে।

নিপুদা বলল, ওখানকার পুলিশগুলো কোনও কম্মের না। আপনি গেলে ঠিক খুঁজে বার করতে পারবেন। ওখানকার একজন পুলিশ অফিসারকে আমি বলেছি, তুমি মিঃ রায়চৌধুরীর নাম শুনেছ, তাঁকে ডেকে তাঁর বুদ্ধি নাও।'

কাকাবাবুর চোখ দুটি স্থির, মুখখানা লাল হয়ে গেছে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে কাকাবাবু বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর অত রাগের কারণটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম পরে। কাকাবাবু সাধারণ ডিটেকটিভ নন, খুনের তদন্ত করাও তাঁর পেশা নয়। কোন বড় শিল্পীকে যদি সিনেমার পোস্টার আঁকতে বলা হল, তা হলে তিনিও কাকাবাবুর মতনই চটে যাবেন নিশ্চয়ই।

রেগে গেলে কাকাবাবু বকাবকি, চ্যাঁচামেচি কিছুই করেন না, শুধু মুখখানা কি রকম চৌকো মতন হয়ে যায়।

কাকাবাবু চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর নিপুদার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সব খবর টবর ভাল তো? রুমি ভাল আছে নিশ্চয়ই?'

নিপুদা তাও মহা উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, প্রথম খুনটার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় খুন ডেডবডিটা পাওয়া গেল অরোরা কলোনীতে একটা পার্কের মধ্যে...'

কাকাবাবু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিপু, তুমি এখন ভেতরে যাও 'অন্যদের সঙ্গে কথা-টথা বল—'

কাকাবাবু রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে পেছনের একটা দেওয়াল আলমারি খুলে বই ঘাটতে লাগলেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

নিপুদা বলল, 'তারপর শুনুন, কাকাবাবু, থার্ড খুনটা...'

আমি এবার চুপিচুপি নিপুদাকে বললুম, 'চল নিপুদা, আমরা ভেতরে যাই।'

নিপুদা কীরকম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কী ব্যাপার, উনি আমার কথা শুনলেনই না!'

'কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছেন অন্য কিছু নিয়ে।'

'কিন্তু পরপর তিনটে নৃ-নৃ-নৃ, মানে ওই যে কী বলে লোমহর্ষ খুন... হ্যাঁগো সন্তু, এই লোমহর্ষ কথাটার মানে কি গো? হর্ষ মানে তো আনন্দ।

আমি বললুম, 'লোমহর্ষ না, রোমহর্ষ। যা শুনলে ভয়ে সারা গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে।'

নিপুদা বলল, 'হ্যাঁ, সেইরকম ঘটনাই বটে। কাকাবাবু যদি কেসটা হাতে নেন, আমাদের মধ্যপ্রদেশে ওঁর খুব নাম হয়ে যাবে।'

'আমি কাকাবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। আগে তো আমায় বলতে হবে কেসটা। আমি যদি মনে করি নেওয়া যেতে পারে, তাহলে কাকাবাবুকে রাজি করাব।'

কিন্তু কাকাবাবুর সহকারী হিসাবে নিপুদা আমায় বিশেষ পাত্তা দিল না। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি বুঝবে। এমন নৃ-নৃ পুংসক ব্যাপার।

'নৃ'পুংসক? ওঃ হো, নৃশংস। আমি কত সাংঘাতিক নৃশংস ব্যাপার দেখেছি, তুমি ধারণাই করতে পারবে না। জান আন্দামানে কি হয়েছিল।'

নিপুদা বলল, 'চল, তাহলে আজ সন্ধ্যেবেলা 'হীরক রাজার দেশে সিনেমাটা দেখে আসি।'

'তা তো যাব। খুন তিনটের কথা বলবে না?'

নিপুদা আমাদের বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে বলল, ও কে। তোমার বাড়িতে নেপালি দারোয়ান রাখলে কবে?'

আমি বললুম, নেপালি দারোয়ান নাতো। ও তো মিংমা, আমাদের বন্ধু। ওর জন্য কাকাবাবু আর আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। ও ক'দিন আগে নেপাল থেকে বেড়াতে এসেছে আমাদের এখানে।'

তাই বল। কি সুন্দর চেহারা ছেলেটির। খুব স্মার্ট, নয়?'

'মিংমা দু'বার এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল।'

'ও, শেরপা? হ্যাঁ, হ্যাঁ একজন শেরপার নামও কাগজে বেরিয়েছিল বটে। এই-ই সেই? এ তো তাহলে খুব বিখ্যাত।'

মিংমা গেটের কাছে আমার কুকুরটাকে নিয়ে খেলছিল। এই প্রথমবার কলকাতায় এসেছে মিংমা। কলকাতার রাস্তায় ও একা-একা বেরুতে ভয় পায়। তাই আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাড়ির বাইরে বিশেষ কোথাও যায় না। আমার কুকুরটার সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেছে। বেশ বাংলা শিখে গেছে এর মধ্যে। শিস্ দিয়ে ডাকছে, 'র-কুকু! ইধার এস। দৌড়কে এস।'

মিংমাকে ডেকে আমি আলাপ করিয়ে দিলুম নিপুদার সঙ্গে।

নিপুদা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুম তো নেপালকা আদমী হ্যায়, ভূপাল কভি দেখা? ভূপাল নেপালসে ভি আচ্ছা!'

মিংমা ভূপাল জায়গাটার নামই শোনেনি। সে অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে।

নিপুদা মিংমার বুকে টোকা মেরে বলল, তুম নেপালি, হাম ভূপালি। তুম্ ভি হামলোগকা সাথ সিনেমা চল।'

সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখার পরই অবশ্য আমাদের বাড়ি ফিরে আসতে হল, বাইরের হোটেলে আর খাওয়া হল না! কারণ মা আজকে তিন রকম মাছ রান্না করেছেন মিংমার জন্য। মিংমা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। বিশেষত ইলিশ আর চিংড়ি।

খাবার টেবিলে নানারকম গল্পগুজব হচ্ছে, হঠাৎ নিপুদা দুম করে কাকাবাবুকে বলল, কাকাবাবু, আপনি ভূপালে গেলে খুব ভাল হত। আমি বীরেনদাকে প্রায় কথাই দিয়ে ফেলেছি যে, আপনাকে এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

কাকাবাবু খাওয়া বন্ধ করে অকারণেই একবার বা হাত দিয়ে গোঁফটা মুছে গম্ভীর গলায় বললেন, নিপু আমি জানি না ধীরেনদাটি কে। আর আমাকে জিজ্ঞেস না করে আমার সম্পর্কে কারুকে কথা দেওয়ার অভ্যেসটিও মোটেই ভাল নয়।'

এমন কী, মা পর্যন্ত বুঝতে পেরে গেলেন যে, কাকাবাবু খুবই রেগে গেছেন নিপুদার ওই রকম কথা শুনে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, নিপু তুমি আর একটা ইলিশ মাছ নাও। একটা পেটি নাও, তোমাদের ওখানে তো ইলিশ পাওয়া যায় না! তোমরা চিংড়ি মাছ পাও?'

নিপুদা মায়ের কথা গ্রাহ্য না করে আবার বলল, বুঝলেন না, তিন-তিনটে খুন, তিনজনই শিক্ষিত লোক, তাদের একেবারে গলা কেটে ফেলেছে। একটা ডেড বডি তো আমি নিজেই দেখেছি, ওঃ কী রক্ত!'

কাকাবাবু বললেন, খাওয়ার সময় ওসব রক্তরক্তির কথা বলতে নেই, তাতে হজমের গণ্ডগোল হয়। মন দিয়ে খেয়ে নাও। বরং বৌদি খুব সুন্দর রান্না করেছেন।'

কাকাবাবু নিজে আর বিশেষ কিছু খেলেন না। প্রায় তক্ষুনি উঠে পড়লেন। আমি শুনতে পেলাম কাকাবাবু ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ এর পরেও যেন নিপুদা গিয়ে ওকে বিরক্ত করতে না পারে।

অবশ্য নিপুদার মুখে খুনের কথা শুনে আর সবাই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বাবা বললেন 'তোমাদের ওখানেও খুনজখম শুরু হয়ে গেছে নাকি?'

মা বললেন, কোথাও আজকাল আর একটুও শান্তি নেই। খালি খুন আর খুন। তুমি নিজের চোখে দেখলে নিপু? কি রকম দেখলে, গলা কাটা?'

নিপুদা বলল, খুন তো সব জায়গাতেই হয়, কিন্তু এই খুনগুলো একদম অন্যরকম। তিনজনই নিরীহ ভদ্রলোক, লেখাপড়া চর্চা নিয়ে থাকতেন। একজন তো আমাদের পাড়াতেই থাকতেন! ভদ্রলোকের নাম অর্জুন শ্রীবাস্তব, আমি কতদিন দেখেছি মাঝ রাতের পরেও ওঁর ছাদের ঘরে আলো জ্বলছে। সারারাতও নাকি জেগে কাটাতেন মাঝে মাঝে। যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিনও রাত দুটোর সময় নাকি পাড়ার একটি ছেলে ওঁর ঘরে আলো জ্বালাতে দেখেছিল, আর ভোরবেলা দেখা গেল পার্কে একটা বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে ওঁর দেহটা, আর মুণ্ডুটা গড়াচ্ছে ঘাসের ওপর।

মা বললেন, উফ! মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়।

নিপুদা বলল, শ্রীবাস্তবজী অতি শান্তশিষ্ট মানুষ, পাড়ার কারুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাবও ছিল না, ঝগড়াও ছিল না, নিজের মনে থাকতেন। এরকম লোককে কে যে মারবে।'

আমি বললুম, 'নিপুদা তুমি বার বার শুধু দ্বিতীয় খুনটার কথা বলছ কেন! প্রথম খুনটা কিভাবে হয়েছিল?'

দ্বিতীয় খুনটার পরই প্রথম খুনটার কথা ভালভাবে জানা গেল। খবরের কাগজে লিখল যে, অর্জুন শ্রীবাস্তবের মতনই ভূপাল মিউজিয়ামের

কিউরেটর সুন্দরলাল বাজপেয়িকেও কেউ ওই রকমভাবে গলা কেটে খুন করেছে মাস খানেক আগে। তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছিল একটা কবর-খানায়। সুন্দরলাল বাজপেয়ি অনেকদিন বিলেতে ছিলেন, খুব সাহেব ধরনের মানুষ, তাঁর চেহারাও বিশাল ওই রকম একজন তাগড়া লোকের গলা কেটে খুন করাও তো সহজ কথা নয়।

'আর তৃতীয়টা?'

তৃতীয় ঘটনাটা একটু অন্যরকম। সেটা তো ঘটল আমি আসবার মাত্র চারদিন আগে। এঁর নাম মনোমোহন ঝাঁ। বেশ বয়স্ক লোক, চাকরি থেকে কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছিলেন। ইনি থাকতেন একা একটি ফ্ল্যাটে। সঙ্গে একজন চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল ওঁর ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কেউ মনমোহন ঝাঁকে খুন করে গেছে। তাঁর মুখের ওপর তখনও বালিশটা চাপা দেওয়া রয়েছে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর সেই চাকরটা?'

নিপুদা বলল, সবার প্রথমেই চাকরটার কথাই মনে হয়েছিল। পুলিশও ভেবেছিল, চাকরটাই খুন করে পালিয়েছে। যদিও ঘরের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি, আর ওই চাকরটিও নাকি মনোমোহন ঝাঁ-র কাছে কাজ করছে প্রায় তিরিশ বছর ধরে। পরদিন চাকরটাকে পাওয়া গেল ভূপাল থেকে দশ মাইল দূরে এক মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায়, জিব কাটা।'

মা বললেন, 'অ্যাঁ?'

কেউ তার জিবটা কেটে নিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। বুঝলেন না, একেবারে লোমহর্ষক ব্যাপার! চাকরটার চিকিৎসা হচ্ছে হাসপাতালে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ!'

'তারপর কি হল?'

'তারপর পুলিশ ভূপাল শহর একেবারে তোলপাড় করে ফেলেছে। কিন্তু কে বা কারা এমন খুন করে চলেছে, তার কোনও হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না।'

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'রুমিরা বেশি রাত্তির করে আবার বেড়াতে-টেড়াতে যায় না তো?'

নিপুদা বলল, থার্ড খুনটা হওয়ার পর অনেকেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে। একটু রাত্তির হলেই রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন, যে তিনজন খুন হয়েছে, তাদের কারুর বাড়ি থেকেই কোনও জিনিষপত্র বা টাকাকড়ি খোয়া যায়নি। মনে হয় কোনও পাগলের কাণ্ড।

বাবা বললেন, 'সাধারণ পাগল হলে কি আর এতদিন গা ঢাকা দিয়ে

থাকতে পারে? পাগল-টাগল নয়, তোমাদের মধ্যপ্রদেশের তো অনেক বড় ডাকাতের গ্যাং আছে।'

নিপুদা বলল, 'ডাকাতরা নিরীহ সাধারণ লোকদের মারে না, আর তারা শহরেও আসে না। এই খুনের উদ্দেশ্যটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

মা বললেন, 'হাত শুকনো হয়ে যাচ্ছে, এবার তোমরা উঠে পড়। হাত ধুয়ে নাও।'

নিপুদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, চল সন্তু আমার সঙ্গে ভূপাল যাবি নাকি।'

নিপুদা জিজ্ঞেস করার আগেই আমি সব ঠিক করে ফেলেছি অনেকটা। আমার এখন ছুটি। অনায়াসেই ছোটদির বাড়িতে কিছুদিন থেকে আসতে পারি। খালি একটা ব্যাপার আছে। আমি জানি, 'বারমুড়া ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য সমাধান করার জন্য যে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন বসেছে, তাতে কাকাবাবুকে সদস্য করা হয়েছে। সানফ্রানসিসকো আর বারমুণ্ডার মাঝখানে সমুদ্রের একটা জায়গায় বড় বড় জাহাজ হঠাৎ ডুবে যায়। এমন কী, আকাশ থেকে অনেক এরোপ্লেনকেও যেন চুম্বকের মত টেনে নেয়। কত যে এইভাবে ডুবেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই তদন্ত কমিশনের কাজ শুরু করার জন্য কাকাবাবু নেমন্তন্ন পেয়েছেন আমেরিকা থেকে। কিন্তু কাকাবাবু লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি কমিশনের সদস্য হতে আগ্রহী নন। তাঁকে যদি কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে তিনি একাই ওই সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে পারেন।

কাকাবাবুর এই চিঠির উত্তর এখনও আসেনি। যদি ওরা রাজি হয়, তাহলে কাকাবাবু তো আর একদম একা যাবেন না, নিশ্চয়ই আমাকেও নিয়ে যাবেন। ভূপাল গেলে যদি সেটা ফস্কে যায়?

অবশ্য আমেরিকা যেতে হলেও তো কাকাবাবু এক্ষুনি যাচ্ছেন না। অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এখানে। এর মধ্যে আট-দশ দিনের জন্য আমি ভূপাল থেকে ঘুরে আসতে পারি। নিশ্চয়ই কাকাবাবু আমাকে ফেলে চলে যাবেন না। এর আগে সব কটি অভিযানে আমি কাকাবাবুর সঙ্গে গেছি।

'নিপুদার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম, হ্যাঁ যাব!'

মিংমা এতক্ষণ মুখ নিচু করে মাছের কাঁটা বেছে খেয়ে যাচ্ছিল, এবার মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললুম, 'মিংমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ওর বেশ বেড়ান হবে।'

মা বললেন, 'না, না, এখন ভূপাল যেতে হবে না। খুনে গুণ্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

নিপুদা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি? আমরা তো রয়েছি। আমাদের বাড়িতে লাইসেন্স করা বন্দুক আছে আজে বাজে লোক আমাদের বাড়ির ধার ঘেঁসতে সাহস করে না।'

বাবা বললেন, 'যাক্ না ঘুরে আসুক না, এখন তো ছুটি রয়েছে!'

পরদিন সকালে আমি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, আমি কি নিপুদার সঙ্গে ভুপাল যাব ক'দিনের জন্য? খুব করে বলছেন...'

কাকাবাবু আজও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস নিয়ে পুরনো কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও ঘুরে এস! কবে যাচ্ছ? আজই?'

মনে হল যেন আমরা আজকে গেলেই কাকাবাবু খুশি হন। তাহলে নিপুদা আর ওঁকে বিরক্ত করতে পারবে না।

'হ্যাঁ, আজকের রাত্তিরের ট্রেনে। মিংমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব?'

এবার একটু ভেবে কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। মিংমাও ঘুরে আসুক! তবে ওই সব খুন-টুনের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না!'

।। দুই।।

মধ্যপ্রদেশের নাম শুনলেই আমার মনে পড়ে শুধু জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়ের কথা, যেন ওখানে আর কিছু নেই। আমাদের চিড়িয়াখানায় যে সাদা বাঘ, তাও তো প্রথম এসেছিল ওই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল থেকে।

কিন্তু ভূপাল রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিকটা আসবার পর আমি অবাক। এমন সুন্দর শহর আছে এই মধ্যপ্রদেশে! দারুণ দারুণ চওড়া রাস্তা, পরিষ্কার ঝকঝকে। দু-পাশে নতুন ডিজাইনের নানা রকম বাড়ি। শহরের মাঝখানে একটা বিশাল লেক, তার ওপাশে পুরনো শহর। একটা মস্ত বড় মসজিদের চূড়া দেখতে পাওয়া যায় অনেক দূর থেকে। নিপুদার মুখে শুনলাম, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় নবাব পতৌদির বাড়ি আছে ওখানে। ঠিক করলুম, একদিন পতৌদির সঙ্গে দেখা করে ওঁর অটোগ্রাফ নিতে হবে।

শহরটা ঠিক সমতল নয়, রাস্তাগুলো উঁচু নিচু। পাহাড় কেটে যে শহরটা বানান হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। এক এক জায়গায় বাড়িগুলো বেশ উঁচুতে। যেদিকেই তাকাই, চোখে বেশ আরাম লাগে।

ট্যাক্সিটা প্রায় সারা শহরটা পেরিয়ে ঢুকল অরোরা কলোনিতে। এখানকার বাড়িগুলো যেন আরো বেশি কায়দায়, যেন কার বাড়ি কত সুন্দর হবে এই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির

সঙ্গেই একটা করে বাগান। ইংরেজি সিনেমায় যেরকম বাড়িটাড়ি দেখি সে তো এই রকমই।

একটা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিপুদা বলল, 'এই পার্কেই পাওয়া গিয়েছিল সেকেণ্ড ডেডবডিটা।'

ডান দিকে হাত তুলে একটা হালকা নীল রঙের তিনতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'আর ওই বাড়িতে থাকতেন অর্জুন শ্রীবাস্তব। ঐ যে ছাদের ঘরটা দেখতে পাচ্ছিস, ওটাই ছিল ওঁর পড়ার ঘর।'

এরপর ট্যাক্সিটা ডানদিকে ঘুরতেই আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলুম।

ছোড়দি তো আমায় দেখে অবাক! আগে থেকে আমরা কোনও খবর দিইনি। আমায় জড়িয়ে ধরে ছোড়দি বলল, 'খুব ভাল সময়ে এসেছিস রে সন্তু! আমরা এই শনিবারই পাঁচমারি যাবার প্ল্যান করেছি। দেখবি, দারুণ ভাল লাগবে।'

আমি মিংমার সঙ্গে ছোড়দির আলাপ করিয়ে দিলুম। মিংমা এমনিতে কম কথা বলে, নতুন জায়গায় এসে একদম চুপ।

ছোড়দি মিংমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বা, ছেলেটির চেহারা খুব সুন্দর তো!'

আমি বললুম, 'ছেলেটা বলছে কি। ওর বয়স একত্রিশ বছর, তোমার চেয়েও বয়সে বড়। আর ও বাংলা বোঝে!'

ছোড়দি বলল, 'চট করে হাতমুখ ধুয়ে নে। তোদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

সত্যিই বেশ খিদে পেয়েছে। ভূপালে কলকাতা থেকে একটানা ট্রেনে আসা যায় না। নাগপুর থেকে বদল করতে হয়। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল, চলেছি তো চলেছিই রাস্তা ফুরোচ্ছে না।

প্রথমে টপাটপ মিষ্টি খেয়ে ফেললুম কয়েকটা। তারপর ছোড়দি প্লেটে করে আরও মিষ্টি এনে দিল।

এ বাড়িটা দোতলা। ওপরে বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানেই বসে গল্প করতে লাগলুম। বিকেল পেরিয়ে সবে মাত্র সন্ধ্যে হব-হব সময়। আকাশে ঘুরছে কালো কালো মেঘ। রত্নেশদা এখনও অফিস থেকে ফেরেননি। নিপুদাও আমাদের পৌঁছে দিয়েই ছুটেছে নিজের অফিসের দিকে। ছোড়দির বাড়ির সামনেও একটা বেশ সাজানো বাগান। সেখানে লাফালাফি করছে মোটকা-মোটকা খুব লোমওয়ালা একটা কুকুর। একটু দূরে আর একটা বাড়িতে একটা কুকুর অনবরত ডেকে চলেছে। আমরা আসার পর থেকেই ওই কুকুরটার ওই রকম একটানা ডাক শুনতে পাচ্ছি।

ছোড়দিই এক সময় বলল, 'ইশ্, ধীরেনদার কী অবস্থা। সর্বক্ষণ ওই রকম কুকুরের ডাক সহ্য করা.....'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কুকুরটার কি হয়েছে? পাগল হয়ে গেছে নাকি?'

'না। ওই কুকুরটা ছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব নামে এক ভদ্রলোকের। তিনি হঠাৎ মারা গেছেন কিছুদিন আগে। তারপর থেকেই কুকুরটা ডেকে চলেছে। মনিবের জন্য ও কাঁদে।'

'কিন্তু অর্জুন শ্রীবাস্তবের বাড়ি তো এই ডানদিকে, আর কুকুরটা ডাকছে এদিকের একটা বাড়ি থেকে।'

ছোড়দি একটু অবাক হয়ে তাকাল, আমার দিকে। তারপর বলল, 'ও, নিপু বুঝি এর মধ্যে তোদের সব বলেছে? শ্রীবাস্তবজী মারা যাবার পর কুকুরটাকে দেখাশুনা করবার কেউ ছিল না, উনি তো একলাই কুকুরটাকে নিয়ে থাকতেন—সেই জন্য ধীরেনদা নিজের বাড়িতে কুকুরটাকে নিয়ে এসেছেন।'

'ধীরেনদা কে?'

'নিপু তোদের ধীরেনদার কথা কিছু বলেনি?'

'নামটা শুনেছি একবার।'

'সন্ধ্যেবেলা তোদের নিয়ে যাব ধীরেনদার বাড়িতে।'

কুকুরটা তখনও ডেকেই চলেছে। কী রকম যেন অদ্ভুত করুণ সুর।

আমার মনে পড়ল, সেই নেপালের অভিযানে কেইন শিপটনেরও একটা সাদা লোমওয়ালা সুন্দর কুকুর ছিল। কেইন শিপটন পালাবার পর সেই কুকুরটাও এ-রকম একা-একা কাঁদত! কেউ খাবার দিলে খেতে চাইত না। শেষ পর্যন্ত কুকুরটা যে কার কাছে রইল কে জানে!

সন্ধ্যেবেলা সবাই মিলে যাওয়া হল ধীরেনদার বাড়িতে। ধীরেনদা মানে ধীরেন চক্রবর্তী, একটা বিদেশী কোম্পানির বিরাট একটা কারখানার উনি ম্যানেজার। মানুষটি কিন্তু খুব হাসিখুশি। এখানকার অনেক বাঙালিই আসে এঁর বাড়িতে আড্ডা দিতে। সবাই ওঁকে ডাকে ধীরেনদা আর ওঁর স্ত্রীকে বলে রিণাদি।

ছোড়দি আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার পর ধীরেনদা বললেন, 'আরে, তাই নাকি? এই তাহলে 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্কের' সেই হিরো সন্তু, আর এই সেই মিংমা? আজ তো দু'জন খুব বিখ্যাত মানুষ এসেছে আমাদের বাড়িতে। কাকাবাবু এলেন না? ইশ, কাকাবাবুকে একবার দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল।'

ধীরেনদাদের দুটি ছেলে, দীপ্ত আর আলো। এদের মধ্যে দীপ্ত প্রায় আমারই বয়েসী!

রিণাদি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সন্তু, তোমরা যে সিয়াংবোচিতে ছিলে, এভারেস্টের অত কাছে, সেখানে তোমাদের নিশ্বাসের কষ্ট হয়নি?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, প্রথম দু'একদিন হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে মাস্কও ছিল, কিন্তু পরে সেগুলোর দরকার হয়নি, এমনিই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।'

ধীরেনদা বললেন, 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্কের হিরোরা এসেছে, আজ ওদের মাগুর মাছ খাওয়াব!'

কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম। মাগুর মাছ খাওয়ার মধ্যে আবার এমন কি বিশেষত্ব আছে?

ধীরেনদা বললেন, 'দীপ্ত, আলো, চল আমরা এখন মাছ ধরব।'

সবাই মিলে চলে এলুম বাগানে। প্রথম মনে হয়েছিল কোনও পুকুরে বুঝি মাছ ধরতে যাওয়া হবে। তা নয়। বাগানের এক কোণে রয়েছে একটা বেশ বড় চৌবাচ্চার মতন। পাশাপাশি চারখানা ক্যারাম বোর্ড রাখলে যত বড় হয়, ততখানি। কালো মিশমিশে জল, ওপরে ভাসছে পদ্মপাতা, দুটো পদ্মফুলও ফুটে আছে।

দুটো ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের মতন হাত-জাল নিয়ে ধীরেনদা আর দীপ্ত সেই জলের মধ্যে মাছ খুঁজতে লাগল। এক সময় দীপ্তর জাল থেকে একটা কি যেন লাফিয়ে পড়ল আমাদের সামনে।

প্রথমে চমকে উঠে আমি ভেবেছিলাম ওটা বুঝি সাপ। এত বড় মাগুর মাছ কখনও দেখিনি, প্রায় এক হাত লম্বা আর অ্যাত্ত বড় মাথা!

ছোড়দি ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'ধীরেনদা এই মাগুর মাছ সহজে তুলতে চান না। এখানে তো মাগুর মাছ পাওয়া যায় না। তোদের বেশি খাতির করার জন্যই ধরলেন।

চৌবাচ্চাটায় নিশ্চয়ই অনেক মাছ কিলবিল করছে, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ধীরেনদা আর দীপ্ত সাত-আটটা মাছ তুলে ফেলল।

রিণাদি বললেন, 'আর দরকার নেই, সাতটা মাছ থাক, একটাকে জলে ছেড়ে দাও।'

বাগানের অন্য দিকে অর্জুন শ্রীবাস্তবের কুকুরটা ডেকেই চলেছে। একটা খুঁটির সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা। মিংমা মাছ ধরা না দেখে কুকুরটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধীরেনদা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওর গায়ে হাত মাত দেও। কামড়ে দিতে পারে।'

কুকুরটা খয়েরি, খাব বেশি বড় নয়, কিন্তু গলার আওয়াজ বেশ জোরাল। মিংমা কুকুর খুব ভালবাসে। কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে লক্ষ্য করল

একটুক্ষণ। তারপর খপ করে এমন কায়দায় ওর ঘাড়টা এক হাতে চেপে ধরল যে কুকুরটার কামড়াবার কোন সাধ্য রইল না।

অন্য হাত দিয়ে মিংমা কুকুরটার লোমের ভেতর থেকে পোকা বাছতে লাগল। বড় বড় এঁটুলি। কুকুরটা ডাক থামিয়ে দিয়েছে। মনে হল যেন বেশ আরাম পাচ্ছে।

ধীরেনদা বললেন, 'এই মিংমার তো বেশ এলেম আছে। কুকুরটাকে এ পর্যন্ত কেউ সামলাতে সাহস পায়নি।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা ধীরেনদা, অর্জুন শ্রীবাস্তবের ঘরটা একবার দেখতে পারি? ঘরটা কি বন্ধ আছে?'

ধীরেনদা বললেন, 'কেন, তুমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করবে নাকি? বেশ তো।'

ছোড়দি বলল, না, না, ও-সবে মাথা গলাবার দরকার নেই। মা আমাকে চিঠি লিখে বারণ করে দিয়েছেন, কাকাবাবুর সঙ্গে থাকলে না হয় আলাদা কথা ছিল!'

ধীরেনদা বললেন, কাকাবাবু নেই বটে, কিন্তু আমরা তো আছি!

অভিজ্ঞতা আছে, সেই সঙ্গে যদি আমরাও সাহায্য করি তা হলে হয়তো খুনিকে ধরে ফেলা যেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের সরকার এর মধ্যেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।'

আমার অবশ্য খুনের তদন্ত করার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। কাকাবাবুর সঙ্গে আমি যে-সব অ্যাডভেঞ্চারে গেছি, তা আরও অনেক বড় ব্যাপার। তবু চুপ করে রইলুম।

ধীরেনদা বললেন, 'চাবি আমার কাছেই আছে। চল, এখুনি ঘুরে আসি।'

ধীরেনদা, আমি, দীপু আর মিংমা বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। মিংমা কুকুরটাকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। তিনতলার ওপর শুধু দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট আর ছাদ। অর্জুন শ্রীবাস্তব সেখানে একাই থাকতেন! সেখানে গিয়ে অবশ্য চমকপ্রদ কিছুই চোখে পড়ল না। দু'খানা ঘরেই ঠাসা বই পত্র, প্রায় সব বইই ইতিহাস বিষয়ে। মনে হয় যেন বই ছাড়া অর্জুন শ্রীবাস্তবের আর কোনও সম্পত্তি ছিল না। কোথাও মারামারি, ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই নেই। দুটো বাক্স আর একটা আলমারি আছে, সেগুলোরও তালা ভাঙা হয়নি। চাবিও পাওয়া গিয়েছিল, পুলিশ এসে খুলে দেখেছিল যে ভেতরে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি কেউ। তাঁকে খুন করা হয়েছিল রাত একটা দেড়টার সময়।

অত রাতে শ্রীবাস্তবজী কি নিজেই পার্কে গিয়েছিলেন? না চেনা কেউ তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল?

কুকুরটা এখানে এসেই আবার চ্যাঁচাতে শুরু করেছে। ও নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে কিন্তু আমরা যে ওর ভাষা বুঝি না!'

শার্লক হোমসের মতন একটা পোড়া দেশলাই-কাঠি কিংবা এক টুকরো কাপড়ের মতন কোনও সূত্রই চোখে পড়ল না। তবু আমি উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলুম খাটের তলা-টলা।

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে সন্তু, কিছু বলতে পারলে।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম। অনেক বইতেই পড়েছি, বড় বড় ডিটেকটিভরা কোনও সূত্র বা প্রমাণ পেলেও প্রথম দিকটায় কিছুই বলতে চান না।

আমার একবার মনে হল, কাকাবাবু এখানে উপস্থিত থাকলে কি করতেন? তিনিও কোন্ কোন্ জিনিষ পরীক্ষা করতেন আগে? হয়তো তিনি এই বইগুলোই পড়তে শুরু করে দিতেন।

অর্জুন শ্রীবাস্তবের বিছানাটি এখনও একই রকমভাবে পাতা আছে। চাদরে কোনও ভাঁজ নেই, মনে হয় রাতে শ্রীবাস্তবজী শুতেই যাননি। বিছানাটার দিকে তাকাতেই আমার গা শিরশির করছে। এই বিছানায় কয়েকদিন আগেও একজন মানুষ শুয়েছে, আজ সে বেঁচে নেই।

ধীরেনদা বললেন, শ্রীবাস্তবজী ছিলেন আমার বন্ধু। অতি নিরীহ শান্ত মানুষ, তাঁকে যে কেউ ওরকম ভয়ঙ্করভাবে খুন করতে পারে বিশ্বাসই করা যায় না।

খানিক বাদে আমরা চলে এলুম সেখান থেকে।

তারপর ধীরেনদার বাড়িতে থাকা হল অনেক রাত পর্যন্ত। গল্প হল অনেক রকম। আমরা এই শনিবারই পাঁচমারি বেড়াতে যাচ্ছি শুনে ধীরেনদা বললেন, 'ইশ, আমরাও আর একটা গাড়ি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে গেলে পারতুম। কিন্তু শনিবার 'তো হবে না, সেদিনই আমাদের কোম্পানির এক সাহেব আসছে আমেরিকা থেকে।

ছোড়দি বলল, একটু চেষ্টা করে দেখুন না ধীরেনদা, কোন রকমে ম্যানেজ করতে পারেন কি না? আপনি গেলে খুবই ভাল হত।'

ধীরেনদা বললেন, কোনও উপায় নেই! ঠিক আছে, তোমরা পাঁচমারি থেকে ঘুরে এস, তারপর আমি তোমাদের আর একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

ছোড়দি বলল, কোথায়? 'সাঁচি?'

'সাঁচি তো কাছেই। সেখানে যে-কোনও দিন যাওয়া যেতে পারে! আমি তোমাদেরও নিয়ে যাব ভীমবেঠ্কায়।'

'ভীমবেঠ্কায়? সেটা আবার কোন্ জায়গা?'

'নাম শোননি তো? যারা ভুপাল বেড়াতে আসে, তারা সবাই সাঁচিস্তূপ

দেখে কিংবা পাঁচমারি যায়। কিন্তু আমার ভীমবেঠ্‌কাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জায়গা। তোমাদের মতন যারা ভূপালে এসে বেশ কিছুদিন আছে, তারাও ওই জায়গাটার নাম শোনেনি।'

রিণাদি বললেন, ওই ভীমবেঠ্‌কা তোমাদের ধীরেনদার খুব ফেভারিট জায়গা, অবশ্য গেলে তোমাদেরও খুব ভাল লাগবে। ওই অর্জুন শ্রীবাস্তবই আমাদের প্রথম ভীমবেঠ্‌কায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তার আগে আমরাও নাম জানতুম না।'

ভীববেঠ্‌কা নামটা শুনে আমারও কি রকম যেন অদ্ভুত লাগল। ওই রকম কোনও জায়গার নাম শুনলেই যেতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক, আগে তো পাঁচমারি ঘুরে আসা যাক।

পরের দিন নিপুদা আমাদের ভূপালের বিখ্যাত লেক দেখিয়ে আনল। নবাব পতৌদির বাড়িতেও গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলাম, পতৌদি এখন ভূপালে নেই, অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলা দেখতে গেছেন। শনিবার সকালে পাঁচমারি যাবার জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি। রত্নেশদা একটা বড় স্টেশন ওয়াগন জোগাড় করে এনেছেন, আমরা সবাই তো যাবই, ধীরেনদার ছেলে দীপুও যাবে আমাদের সঙ্গে। এর মধ্যে দীপুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

একে-একে সব জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। পাঁচমারিতে নাকি রাত্রে খুব শীত পড়ে, তাই নিতে হচ্ছে কম্বল-টম্বল! রত্নেশদা সঙ্গে নিলেন একটা শটগান, যদি শিকার-টিকার কিছু করা যায়। আগেই শুনেছিলাম, পাঁচমারি পথে বাঘ দেখা যেতে পারে।

নিপুদা একটা ছোট্ট রেডিও এনে বলল, 'এটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই, কি বল? ওখানে গিয়ে গানটান শোনা যাবে।'

রেডিওর ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য নিপুদা একবার ওটা চালাল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুনতে পেলুম একটা দারুণ সুঃসংবাদ!

রেডিওতে তখন স্থানীয় খবর শোনাচ্ছে। তাতে জানা গেল যে, বিখ্যাত পন্ডিত এবং ভূপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনাকে গত চব্বিশ ঘন্টা ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছোড়দি বলল, অ্যাঁ? কি সর্বনাশ!

রত্নেশ্বর বলল, 'চুপ কর! আগে শুনতে দাও পুরো খবরটা।'

আরও জানা গেল যে, ডঃ শাকসেনা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য জেনিভা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পরশু রাত্রে

ফিরছেন ভুপালে। রাত্রে তিনি যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে ছিলেন, সকালবেলা থেকে তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে তিনি কিছু বলে যান নি, এমনভাবে তাঁর উধাও হয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই।

এর আগে যে তিনটি বীভৎস হত্যাকান্ড হয়েছে, তার জের টেনে ডঃ শাকসেনা সম্পর্কে চরম আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ সারা মধ্যপ্রদেশ জুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে এবং দিল্লীতে সব সি বি আইকেও জানানো হয়েছে।

নিপুদা বলল, এই রে, আর দেখতে হবে না! ওঁকেও মেরেছে!' ছোটদি বলল, 'চুপ কর! আগে থেকেই এ রকম বলতে শুরু কোরো না। এখনও তো কিছু পাওয়া যায় নি!'

নিপুদা বলল, 'ওঁর মতনএকজন শিক্ষিত বয়স্ক লোক কারুকে কিছু না বলেই বাড়ি চলে যাবেন, এ কি কখনও হয়? এ নিশ্চয়ই গুম খুনের কেস।'

রত্নেশদা বলল, 'আমাদের অফিসের ওই যে বিজয় শাকসেনা, তার তো আপন কাকা হন ইনি। একদিন বিজয়ের বাড়িতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এমন সৌম চেহারা যে, দেখলেই ভক্তি হয়। ওই রকম মানুষের কোনও শত্রু থাকতে পারে, তাই তো বিশ্বাস করা যায় না!'

নিপুদা বলল, 'এখন হোল্ ইন্ডিয়াতে ডঃ শাকসেনার মতন ইতিহাসের এত বড় পন্ডিত আর কেউ নেই। এত জায়গা থেকে ওঁকে চাকরি দেবার জন্য সেধেছে! কিন্তু উনি ভুপাল ছেড়ে কোথাও যেতে চান না।'

এই সময় এসে পড়ল খবরের কাগজ। তাতেও প্রথম পাতাতে ডঃ শাকসেনার ছবি দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে।

ছোড়দি আর নিপুদা কাগজটা আগে পড়বার জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। রত্নেশদা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, এখন নয়, আগে গাড়িতে উঠে পড়, যেতে যেতে পড়বে! অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

একটু বাদেই আমাদের গাড়ি ছুটল পাঁচমারির দিকে।

।। তিন।।

পাঁচমারি যে এত দূরে, তা আগে বুঝতে পারিনি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, তার মধ্যে কত রকম জায়গা যে পেরিয়ে এলুম তার ঠিক নেই। ধু-ধু করা মাঠ, ছোট ছোট শহর, কোথাও ঘন জঙ্গল। এক জায়গায় তো গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সবাইকে হাঁটতে হল, সেখানে একটা নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, কিছুটা জায়গা বালির ওপর দিয়ে যেতে হয়, ভর্তি গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, খালি গাড়িটা কোনরকমে হেলে-দুলে গিয়ে উঠল ব্রিজে।

শেষের দিকের খানিকটা একেবারে পাহাড়ি রাস্তা। গাড়িটা উঠতে

লাগল ঘুরে ঘুরে। একপাশে ঘন বন, আর একদিকে বহু দূর ছড়ান উপত্যকা। অনেকটা আমাদের দার্জিলিং-এর মতো। গাড়ি চালাচ্ছে নিপুদা, আর রত্নেশদা রাইফেলটা ধরে বসে আছে জানালার ধারে। খুব আশা করেছিলাম দু-একটা বাঘ ভালুক দেখতে পাব,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা লুকিয়েই থেকে গেল।

পাঁচমারি শহরটা প্রথম দেখে কিছু নতুন মনে হয় না। মনে হয়, এমনিই পাহাড়ের ওপর একটা ছোট্ট শহর। কিন্তু কিছুক্ষণ থাকবার পর বোঝা যায় এ-রকম জায়গা আমাদের দেশে বিশেষ নেই। ঠিক যেন ছবির বইতে কিংবা সিনেমায় দেখা ইওরোপের কোনও গ্রাম। সাহেবরাই এ পাহাড়ের ওপর জায়গাটা পরিষ্কার করে একসময় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানিয়েছিল! সাহেবি ধরনের সব বাড়ি, সেই রকম ছোট গির্জা। আমাদের দার্জিলিংও সাহেবদের তৈরি, কিন্তু এখন সেখানে অনেক নতুন বাড়ি-ঘর উঠেছে। কিন্তু সাহেবরা চলে যাবার পর পাঁচমারিতে আর তেমন নতুন বাড়িঘর বানাতে দেওয়া হয়নি, তাই শহরটাকে দেখতে ঠিক আগেকার মতনই আছে।

আমাদের হোটেলটা একটা টিলার ওপরে। এটাও আগে ছিল আগেকার এক সাহেবের। প্রত্যেক ঘরে কায়ারপ্লেস। এখানকার বারান্দায় দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ডানদিকে একটা উঁচু পাহাড়ে মন্দির। পাহাড়টা একেবারে খাড়া। ওই মন্দিরে মানুষ যায় কি করে কে জানে!

পাহাড়ি জায়গায় এসে মিংমা খুব খুশি। ও কথা খুব কম বলে, কিন্তু মুখচোখ দেখলেই বোঝা যায় এখানে এসে ওর খুব আনন্দ হয়েছে। হোটেলের পেছন দিকটায় একটা আমলকী গাছ, মিংমা সেটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অনেক আমলকী পেড়ে ফেলল। প্রায় দু'কিলো হবে! আমলকী খাবার পর জল খেলে খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু এত আমলকী কে খাবে?

হোটেলে সব গুছিয়ে রাখার পর আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম। পাঁচমারিতে অনেক কিছু দেখবার আছে। মনে হয়, এই জায়গাটা শিব-ঠাকুরের খুব পছন্দ। এক জায়গায় পাথরের গায়ে এমনি এমনি ফুটে উঠেছে ত্রিশূলধারী শিবের ছবি। পাঁচমারি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে রয়েছে একটা শিবলিঙ্গ, সেটা ওখানে কেউ বসায়নি। তৈরী হয়েছে স্বাভাবিকভাবে।

আর একটা ছোট টিলার ওপরে রয়েছে পাশাপাশি কয়েকটা গুহা। দেখলে মনে হয়, বহুকাল আগে কেউ ওখানে একটা বাংলো বানিয়েছিল। আমরা ওপরে উঠে দেখলুম, গুহাগুলো ঠিক ঘরের মতন। একজন বলল, 'এটা পঞ্চপাণ্ডবের গুহা। বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী এখানে কিছুদিন ছিলেন।

এই পাণ্ডব গুহার আবার ছাদ আছে। সেখানে এসে দেখলুম, একজন মানুষ পা ঝুলিয়ে বসে আছে এক ধারে। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিমে একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, লোকটি চেয়ে আছে সেদিকে।

রত্নেশদা বলে উঠল, 'আরে, বিজয়!'

লোকটি চমকে আমাদের দিকে ফিরল। নাকের নিচে পাকানো গোঁফ, ভালমানুষের মতন চেহারা। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর।

রত্নেশদা আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হচ্ছে বিজয় শাকসেনা, আমার অফিসের কলিগ?'

ছোড়দি বিজয় শাকসেনাকে আগে থেকেই চেনে, সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কবে এসেছেন?'

বিজয় শাকসেনা হিন্দিতে উত্তর দিল, 'আজ দুপুরে। চিফ্ মিনিস্টার কয়েকদিন পর এখানে মিটিং করতে আসবেন, সেই ব্যবস্থা করতে এসেছি।'

রত্নেশদা বলল, 'হঠাৎ ঠিক হল বুঝি? কিসে এলে? আমাদের বলতে পারতে, আমাদের গাড়িতে অনেক জায়গা ছিল—'

বিজয় শাকসেনা বলল, 'একটা জিপ পেয়ে গেলাম। কোনও অসুবিধে হয়নি।'

নিপুদা বলল, 'আপনার আংকল্ ডক্টর শাকসেনার কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে?'

বিজয় অবাক হয়ে বলল, 'কেন, একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমার কাকা তো বিদেশে!'

সে কী, আপনি শোনেননি। উনি ফিরে এসেছেন, তারপরই আবার উধাও হয়ে গেছেন, ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ সকালে রেডিওতে বলেছে, কাগজেও বড় বড় করে বেরিয়েছে...'

'ও, আমি ভোর চারটেয় বেরিয়েছি। রেডিও শুনিনি, কাগজও দেখিনি। কি বলছেন, উনি হারিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, উনি রহস্যময়ভাবে নিরুদ্দেশ। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, ওঁকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।'

'বাড়ি থেকে?'

'হ্যাঁ। উনি শুতে গিয়েছিলেন।'

'অসম্ভব। বাড়ি থেকে কে ওঁকে নিয়ে যাবে? উনি খেয়ালি লোক, হঠাৎ মাথায় কিছু এসেছে, নিজেই কোথাও চলে গেছেন। আমার কাকিমা কি বলেন জানেন? উনি বলেন যে, ওঁর বয়েস যদি এক হাজার বছর হত, তা

হলে ভাল হত। কারণ, অন্তত এক হাজার বছরের পুরনো না... হলে কোনও কিছু সম্পর্কে আমার কাকার কোনও আগ্রহ নেই। নিশ্চয়ই এখন উনি কোনও ধ্বংসস্তুপের মধ্যে বসে আছেন!'

'না মানে সবাই ভয় পাচ্ছে, ভুপালে হঠাৎ যে সব খুনটুন হতে শুরু করেছে...'।

'আমার কাকাকে কে খুন করবে? কেন খুন করবে? না, না, না আপনারা শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। চলুন নিচে যাওয়া যাক। এরপর অন্ধকার হয়ে যাবে।'

নিচে নামার পর বিজয় শাকসেনা আর বিশেষ কিছু না বলে নমস্কার জানিয়ে গেলেন।

রত্নেশদা বলল, 'চল সবাই, এক্ষুনি হোটেলে ফিরতে হবে। পাঁচমারির ব্যাপার জান তো, একটু রাত হলে আর বাইরে থাকা যায় না।'

আমি ভাবলুম, রাত্তিরবেলা বোধহয় এখানে বাঘ বেরোয়।

তা নয় বাঘের চেয়েও সাংঘাতিক এখানকার শীত। এটাই পাঁচমারির বিশেষত্ব। দিনেরবেলা এখানে গরম জামা গায়ে দিতেই হয় না। কিন্তু যেই সন্ধ্যের পর অন্ধকার নামতে শুরু করে, অমনি আরম্ভ হয় শীত! সে কি সাংঘাতিক শীত! হোটেলে ফিরতে না ফিরতেই আমরা কাঁপতে লাগলুম ঠকঠক করে।

তাড়াতাড়ি রাত্তিরের খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা সবাই মিলে একটা ঘরে বসলুম আড্ডা দিতে। অনেক কাঠ এনে ফায়ারপ্লেস জ্বালান হয়েছে তবু শীত যায় না। আমরা আগুনের কাছে এসে মাঝে মাঝে হাত-পা সেঁকে নিচ্ছি। আমরা যে কম্বল এনেছি, তাতে কুলোবে না, হোটেল থেকে আরও কম্বল দিয়েছে। একজন বেয়ারা বলছে যে, প্রত্যেকের অন্তত তিনটে করে কম্বল লাগবে।

নিপুদা একসময় রত্নেশদাকে বলল, আচ্ছা দাদা, তোমার অফিসের ওই বিজয় শাকসেনার ব্যবহারটা কেমন একটু অস্বাভাবিক লাগল না?'

ছোড়দি বলল, 'আমার মনে হল, ভদ্রলোক আমাদের দেখে যেন একটু চমকে উঠলেন। আমরা যে এই শনিবার পাঁচমারিতে আসব তুমি অফিসে জানাওনি?'

রত্নেশদা বলল, 'হ্যাঁ, জানাব না কেন? বিজয়কেও তো বলেছিলাম। বিজয় যে এখানে আসবে, সেটা জানতাম না। অবশ্য চিফ্ মিনিস্টারের এখানে আসবার কথা আছে ঠিকই!'

আমি বললুম 'ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনার নিরুদ্দেশ হবার কথা উনি আমাদের কাছে প্রথম শুনলেন?'

রত্নেশদা বলল, 'ও যে বলল আজ খুব ভোরে বেরিয়েছে। রেডিও শোনেনি কাগজ পড়েনি। তাহলে জানবে কি করে?'

আমি বললুম রেডিওতে আজ সকালে জানালেও ডক্টর শাকসেনাকে পাওয়া যাচ্ছে না কাল সকাল থেকে। কাল সারাদিনে উনি কোনও খবর পাননি? ওঁরা এক বাড়িতে থাকেন না বুঝি?'

রত্নেশদা বলল, 'তা অবশ্য ঠিক? এক বাড়িতে না থাকলেও খুব কাছাকাছি বাড়ি। বিজয়ের কাকার বাড়ি থেকে দেখা যায়। ও-বাড়িতে কিছু হলে বিজয় নিশ্চয়ই জানাবে।'

নিপুদা বলল, 'আমাদের মুখে খবরটা শুনেও ওকে খুব একটা ব্যস্ত হতে দেখলুম না। ওদের কাকা ভাইপোতে ঝগড়া নাকি?'

রত্নেশদা বলল, 'আরে না, না। বিজয় ওর কাকাকে একেবারে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া বিজয় মানুষটা খুব ভাল। কারুর সঙ্গে ওর ঝগড়াঝাটি নেই।

দীপু বলল, 'আমি একটা কথা বলব? আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? চিরঞ্জীব শাকসেনাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে, তা ওই বিজয়বাবু জানেন! বিজয়বাবুকে ভয় দেখিয়েছে যে মুখ খুললেই মেরে ফেলবে। সেইজন্যই উনি পাঁচমারিতে পালিয়ে এসেছেন।'

ছোড়দি বলল, দীপু ঠিকই বলেছে, আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।'

রত্নেশদা বলল, 'ওর কাকার এত বড় বিপদ হল বিজয় নিজের প্রাণের ভয়ে চুপ করে থাকবে, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ও হয়ত সত্যিই খবরটা জানত না, কাল সারাদিন বোধহয় ব্যস্ত ছিল,... আরে তাই তো, বিজয় তো গতকাল অফিসেও আসেনি।'

নিপুদা বলল, উনি পাঁচমারিতে কোথায় উঠেছেন, সে কথাও তো আমাদের বললেন না। হঠাৎ চলে গেলেন।'

রত্নেশদা বলল 'পাঁচমারি ছোট জায়গা, সবার সঙ্গে সবার রোজ দেখা হয়। বিজয় নিশ্চয়ই সার্কিট হাউসে উঠেছে। কাল সকালেই আবার দেখা হবে।'

একটু বাদেই পরপর দুবার দুড়ুম দুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। আমরা চমকে উঠলুম।

জায়গাটা এমনই শান্ত আর নিস্তব্ধ যে, সেই আওয়াজ যেন কামানের মতন শোনাল!

শীত অগ্রাহ্য করেও আমরা চলে এলুম বারান্দায়। এই টিলার ওপর থেকে পাঁচমারির অন্য বাড়িগুলোর আলো একটু একটু দেখা যায়। যেন ছড়ান ছেটান অনেকগুলো তারা। দূরে কোথাও সামান্য গোলমালের

আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। এত রাতে কে বন্দুক ছুঁড়বে। জঙ্গলে কেউ শিকার করতে গেছে? এই শীতের মধ্যেও যদি কেউ শিকারে যায় তবে তাঁর শখকে ধন্য বলতে হবে!

আর বেশীক্ষণ আমাদের গল্প জমল না। সকলের মন টানছিল বিছানার দিকে। শোওয়া মাত্র ঘুম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন ন'টা বেজে গেছে। চারিদিকে ঝলমল করছে রোদ। শীতও অনেক কম।

হোটেলের লম্বা টানা বারান্দায় অনেকগুলো বেতের চেয়ার আর টেবিল। আমরা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে চা খেতে লাগলুম। মিংমা চা খেল পরপর চার কাপ। ছোড়দির এই শীতে সর্দি লেগে গেছে, 'হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো' করছে বারবার।

কয়েকজন বেয়ারা এক কোণে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল গতকাল রাত্রের সেই গুলির আওয়াজের কথা। আমি জিজ্ঞেস করলুম 'রত্নেশদা, কালকের সেই গুল—'

রত্নেশদা বলল, 'ও হ্যাঁ, তাই তো!'

একজন বেয়ারাকে ডেকে রত্নেশদা জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাত্রে কিসের শব্দ হয়েছিল? তোমরা শুনেছ?'

বেয়ারাটি বলল, 'সাব, এমন কাণ্ড এখানে কোনদিন হয়নি। পাঁচমারিতে বেশি লোক আসে না, যারা আসে তারা সব বাছাই-বাছাই মানুষ। এখানে কোনদিন কোনও হাঙ্গামা-হুজ্জোত হয় না। এই প্রথম এখানে এমন একটা খারাপ ব্যাপার হল—'

'কী হ'য়েছে, আগে তাই বল না।'

সার্কিট হাউসে কারা এসে কাল এক বাবুকে গুলি করেছে।'

রত্নেশদা চমকে উঠে বলল 'অ্যাঁ? সার্কিট হাউসে? কে গুলি করেছে? কাকে করেছে? কেউ মারা গেছে?

বেয়ারাটি অত খবর জানে না। সে সব শুনেছে লোকের মুখে। একদল ডাকাত নাকি এসেছেন, একজন না দুজন মরে গেছে। ডাকাতরা অনেক কিছু নিয়ে গেছে।

ব্রেকফাস্ট না খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি। ছোড়দি আর মিংমাকে রেখে যাওয়া হ'ল।

সার্কিট হাউসের সামনে তখনও কুড়ি পঁচিশজন লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আমরা পৌছে বুঝলুম, আমাদের ঠিক পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। একটুর জন্য দেখা হল না।

কাল রাত্রে কেউ এসে গুলি ছুঁড়েছে ঠিকই? কেন ছুঁড়েছে বা কে ছুঁড়েছে তা বোঝা যায়নি। গুলির শব্দ শুনে সার্কিট হাউসের অন্য বাসিন্দারা উঠে এসে দেখে যে, বারান্দায় একজন লোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখনও মরেনি, অজ্ঞান। এখানকার হেল্‌থ সেন্টারে একজন মাত্র ডাক্তার, তিনি আবার কাল বিকেলেই চলে গেছেন জব্বলপুরে। তখন অন্যরা কোনও রকমে আহত লোকটিকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। গুলি লেগেছে উরুতে। আজ সকালে এই পাঁচ মিনিট আগে লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল শহরের হাসপাতালে। সঙ্গে সার্কিট হাউস থেকেও দুজন গেছেন।

একটু খোঁজ করতে জানা গেল, আহত লোকটির নাম বিজয় শাকসেনা।

।। চার।।

পাঁচমারিতে আমাদের থাকার কথা ছিল চার-পাঁচ দিন। কিন্তু আমরা ফিরে এলুম দু'দিনের মধ্যেই। এত ভাল জায়গা তবু আমাদের মন টিকছিল না। সেই গুলি চলবার পর টুরিস্টরা অনেকেই ফিরে গেল। জায়গাটা এমনিতেই ফাঁকা, এখন যেন একেবারে শুনশান। আমরা অবশ্য সেজন্য কিংবা ভয় পেয়ে ফিরিনি। ফিরতে হল ছোড়দির জন্য। ছোড়দির সর্দিটা খুব বেড়ে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ফিরে এসেই রত্নেশদা খবর দিল। বিজয় শাকসেনা এখানকার কোনও হাসপাতালে ভর্তি হয়নি! অফিসেও কোনও খবর আসেনি!

আর ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা এখনও নিরুদ্দেশ। অবশ্য তাঁর মৃত-দেহের সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

রত্নেশদা বলল, 'ভূপাল অনেক দূরে। পাঁচমারি থেকে কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে নিশ্চয়ই! অফিস থেকে তার খোঁজে চারদিকে খবর পাঠান হয়েছে।' এরপর আরও তিনদিন কেটে গেল, এর মধ্যে আর নতুন কোনও খবর নেই। আমি এখানে এসেই কাকাবাবুকে একটা চিঠি লিখেছিলুম, তার কোনও জবাব পাইনি। কিন্তু মা'র কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে, মা লিখেছেন তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে। কাকাবাবুর আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হল কি না তা জানা গেল না।

এর মধ্যে একদিন ধীরেনদা এসে বললেন, 'চল সন্তুবাবু, এবারে তোমাদের একদিন ভীমবেঠ্‌কা দেখিয়ে নিয়ে আসি। সাঁচিও তো দেখিনি! চল কালকেই ভীমবেঠ্‌কা ঘুরে আসি। তারপর একদিন সাঁচি দেখে নিও।

দীপু বলল, 'বাবা আমরা বেশ খাবার-দাবার নিয়ে যাব। ভীমবেঠ্‌কায় পিকনিক করা যাবে।'

আমি দীপুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি ভীমবেঠ্‌কায় গেছ?'

দীপু বলল, 'হ্যাঁ, দুবার!'

'কী আছে সেখানে?'

দীপু কিছু বলার আগেই ধীরেনদা বললেন, 'এখন বলিস না রে, দীপু! ওটা সারপ্রাইজ থাক!'

রত্নেশদা আর নিপুদার অসুখ, ওরা যেতে পারবে না।

ছোড়দির সর্দি। সুতরাং রিণাদি আর ধীরেনদা, দীপু আর আলো, আমি আর মিংমা, এই ক'জন গেলুম পরদিন। বেরিয়ে পড়লুম সকাল দশটার মধ্যে।

প্রথমে পাঁচমারির দিকেই খানিকটা যাবার পর এক জায়গায় আমরা বেঁকে গেলুম ডান দিকে। তারপর রাস্তাটা ক্রমশ একটু একটু উঁচুতে উঠতে লাগল অথচ সামনের দিকে ঠিক যে কোনও পাহাড় আছে তা বোঝা যায় না। আরও খানিকটা যাবার পর চোখে পড়ল রাস্তার এক পাশে রয়েছে অনেক বড়-বড় পাথরের চাঁই কিছুক্ষণ চলার পর ধীরেনদা একটা গাছের তলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'এই হল ভীমবেঠ্‌কা!'

আমি ধীরেনদা আর রিনাদির মুখের দিকে তাকালুম। সারপ্রাইজ দেবার নাম করে কি আমাকে ঠকাতে নিয়ে এলেন এখানে! এ আবার কি জায়গা? একটা টিলার ওপরে কতকগুলো দোতলা-তিনতলা সমান পাথর পড়ে আছে! জায়গাটা সুন্দর নয়, তা বলছি না, বেশ নিরিবিলি, পিকনিক করার পক্ষে ভালই। কিন্তু যে কোনও পাহাড়ি জায়গাতেই তো এরকম দেখা যায়। দূরে কোথাও যাবার সময় রাস্তার ধারে এ রকম কত জায়গা চোখে পড়ে। আমি হিমালয়ের কত চূড়া দেখেছি এভারেস্টের কাছাকাছি থেকে এসেছি আমাকে ধীরেনদা এই কয়েকটা পাথর দেখিয়ে অবাক করতে চান?

ধীরেনদা বললেন, ভীমবেট্‌কার আসল নাম কি জান? ভীমবৈঠক। মহাভারতের ভীম এখানে আড্ডা দিতেন! বোধহয় হিড়িম্বার সঙ্গে!'

পেল্লায় আকারের পাথরের চাঁইগুলোর চেহারায় খানিকটা ভীম ভীম ভাব আছে বটে। কিন্তু এরকম গল্পও তো আগে অনেক জায়গায় গিয়ে শুনেছি।

ধীরেনদা আবার বললেন, 'এখন জায়গাটা অবশ্য ভীমের জন্য বিখ্যাত নয়। শোন, সন্তু এরকম জায়গা কিন্তু সারা পৃথিবীতে খুব কম আছে। তোমার কাকাবাবু এলে এ জায়গাটা খুবই পছন্দ করতেন!'

সারা পৃথিবীতে খুব কম আছে? ধীরেনদা এখনও আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন? এরকম ছোট পাহাড়ী জায়গা আমি নিজেই অন্তত একশোটা দেখেছি! রিনাদি আর দীপুরা মিটিমিটি হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

ধীরেনদা বললেন, 'বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, মনে হয় খুব সাধারণ জায়গা, তাই না? সেটাই এর মজা। একটু ভেতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে, আসল ব্যাপার। চল!'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, সামনের দিকে একটা বড় পাথরের গায়ে একটি আশ্রম। সেখানে দুতিনজন এমনি লোক, একজন সাধু একটা গোরু আর একটা কুকুর রয়েছে, আর এই দিনের বেলাতেও ধুনির আগুন জ্বলছে। ভারতবর্ষে বোধহয় এমন কোনও পাহাড় নেই, যার চূড়ায় কোনও মন্দির বা সাধুর আশ্রম নেই।

ধীরেনদা চুপি চুপি বললেন, যখনই এই সাধুর আশ্রম দেখি, তখনই মন খারাপ হয়ে যায়। বুঝলে, একটা বেশ বড় গুহায় মুখটি জুড়ে ওই আশ্রম। ওই গুহার মধ্যে যে কি অমূল্য সম্পদ ওই সাধুবাবাটি নষ্ট করেছেন, তা উনি নিজেই জানেন না! চল আমরা ডান দিকে যাব।'

বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোকে এক একটা আলাদা পাহাড় বলেও মনে করা যায়, আর সেগুলোর মাঝখান দিয়ে বেশ গলির মতন যাতায়াতের জায়গাও রয়েছে। একটা সেইরকম পাথরের সামনে এসে ধীরেনদা থামলেন এই পাথরটার গড়নটা একটু অদ্ভুত। মাঝখান থেকে অনেকটা যেন কেউ কেটে নিয়ে একটা বারান্দার মতন বানিয়েছেন। মাথার ওপর ছাউনি অবশ্য, এমনিই পাথরটা ওই রকম।

ধীরেনদা বললেন, 'ধর এখন যদি খুব বৃষ্টি নামে, তাহলে আমরা সবাই মিলে এখানে আশ্রয় নিতে পারি, তাই তো? এক লক্ষ বছর আগেও আমাদের মতন কোনও মানুষ ওই জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল।'

'এক লক্ষ বছর আগে?'

'প্রমাণ চাও? ওই দ্যাখ!'

ধীরেনদা আঙুল দিয়ে পাথরের দেওয়ালে একটা জায়গায় কি যেন দেখাতে চাইলেন। প্রথমে আমার চোখেই পড়ল না। তারপর দেখলুম দেওয়ালের গায়ে একটা হাতের ছবি। ছ'সাত বছরের বাচ্চারা যে-রকম আঁকে। অনেকটা সেই ছবির মতন।

ধীরেনদা বললেন, 'এই ছবিটা অন্তত পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছরের আগেকার আঁকা।'

আমি বললুম, ধীরেনদা, 'আপনি আমাকে বড্ড বেশি ছেলেমানুষ ভাবছেন? আমি জানি, ওই ছবিটা আপনি নিজেই একদিন এসে এঁকে রেখে গেছেন।'

ধীরেনদা রিনাদি সবাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

রিণাদি বললেন, 'আগেরবার সমরেশদা এসেও প্রথমে এই কথা বলেছিলেন না?'

ধীরেনদা বললেন, এইরকম জায়গাকে বলে রক শেলটার। সত্যিই আদিমকালের মানুষরা এখানে ছিল। এ-রকম একটা নয়, অন্তত একশ কুড়ি-তিরিশটা রক শেলটার আছে এই জায়গায়!'

'চল তোমায় দেখাব, আদিম মানুষদের আঁকা এ-রকম হাজার হাজার ছবি আছে। একসঙ্গে এত রক শেলটার, বললুম না, সারা পৃথিবীতে এ-রকম জায়গা খুব কম আছে!'

'কিন্তু এই ছবিটা যে অত পুরনো, তা বুঝব কি করে?'

'বড় বড় ঐতিহাসিকরা এই সব ছবি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। রেডিও কার্বনটেস্টে যে কোনও জিনিসের বয়স বার করা যায়। দীপু, তুই যা তো, সন্তুকে এবার বোর্ডটা পড়িয়ে নিয়ে আয়। আগে ইচ্ছে করে তোমায় ওটা দেখাইনি।'

দীপু আমাকে আবার নিয়ে এল রাস্তার ধারে। সেখানে একটা বড় নীল রঙের বোর্ড রয়েছে, তাতে সাদা অক্ষরে অনেক কথা লেখা। আমাদের দেশে সব ঐতিহাসিক জায়গাতেই পুরাতত্ত্ববিভাগ এ-রকম বোর্ড লাগিয়ে রাখে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম ধীরেনদা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না। সেই বোর্ডে লেখা আছে যে, ১৯৫৮ সালে ভি এস ওয়াকা নকার নামে একজন ঐতিহাসিক এই জায়গাটা আবিষ্কার করেছেন। বেশিদিন আগের তো কথা নয়। তার আগে এই জায়গাটার কথা কেউ জানতই না। বোর্ডে আরও লিখেছে যে, এত বেশি প্রাগৈতিহাসিক ছবি ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। এখানে প্রস্তর যুগের গোড়ার দিক থেকে (অর্থাৎ, ১,০০,০০০ বছর আগে) প্রস্তর যুগের শেষ পর্যন্ত (১০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগে) একখানা মনুষ্য-বসবাসের চিহ্ন আছে তাদের তৈরি পাথরের কুঠার আর অন্যরা জিনিসপত্তরও (মাইক্রোলিথিক টুলস) পাওয়া গেছে। আরও কী সব মেসোলিথিক, চালকোলিথিক যুগের কথা লেখা, তার মানে আমি বুঝতে পারলুম না, কাকাবাবু থাকলে বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

এখানকার এইসব গুহাতে সম্রাট অশোক কিংবা গুপ্ত সাম্রাজের সময় পর্যন্তও মানুষ ছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারপর এই জায়গাটার কথা সবাই ভুলে যায়। এখন আবার এক সাধুবাবাজী একটা গুহায় থাকছেন। সুতরাং এখন এখানে সেই আদিম মানুষদের বংশধর রয়ে গেছে, তা বলা যায়।

বোর্ডটা পড়বার পর খানিকক্ষণ আমি হতবাক হয়ে রইলুম। এক লক্ষ

বছর। আমি যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এইখানে এক লক্ষ বছর আগে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে। লোহার মতন শক্ত তাদের শরীর, হাতে পাথরের হাতুড়ি, তারা দাঁতাল হাতি আর অতিকায় বাঘ-ভাল্লুক-গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই করেছে।

দীপু বলল, 'এমন-এমন সব গুহা আছে, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মনে হবে তৈরি করা। কিন্তু কোনটাই তৈরি করা নয়। চল, তোমায় থিয়েটার হলটা দেখাই।'

গিয়ে দেখলুম, ধীরেনদারা সেখানেই বসে আছে। সত্যিই জায়গাটা একটা থিয়েটার হলের মতন। বেশ চওড়া, চৌকামতন জায়গা, ওপরটা ঢাকা, একদিকে বেদীর মতন। দেখলে অবশ্য বোঝা যায়, কোনও মানুষ এটা তৈরি করেনি, প্রকৃতির হাতে গড়া।

ধীরেনদা বললেন, 'তখনকার লোকেরা থিয়েটার করতে জানত কি না তা অবশ্য আমরা জানি না। কিন্তু অনেকে নিশ্চয়ই এখানে ঘুমোত। কী চমৎকার জায়গা বল তো, বাইরে যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক, গায়ে লাগবে না! বাইরের দিকটায় নিশ্চয়ই কয়েকজন সারা রাত জেগে পাহারা দিত, যাতে হিংস্র কোনও জন্তু এসে ঢুকে না পড়ে। আমার ইচ্ছে করে, বাড়ি ছেড়ে আমিও এরকম জায়গায় থাকি!'

রিণাদি বললেন, 'থাকলেই পার! বেশ চাকরি-বাকরি করতে হবে না, কোনও চিন্তা থাকবে না।'

আলো বলল, 'বেশ পড়াশুনোও করতে হবে না। ইস্কুলে যেতে হবে না।'

ধীরেনদা বললেন, 'কিন্তু খাব কি? সেই সময়কার লোকেরা হরিণ, শুয়োর, খরগোশ এইসব মেরে খেত। এখন তো আর সেসব পাওয়া যায় না। এখনকার দিনে গুহায় থাকতে হলে সাধু সাজতে হয়।'

দীপু বলল, বাবা, এখনও এখানে হরিণ আছে। আমি আগের বার এসে নিচের দিকের গুহাগুলোর কাছে হরিণের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম। টাটকা।'

রিণাদি বললেন, 'হরিণ না ছাই! নিশ্চয়ই ছাগলের পায়ের ছাপ। নিচের গ্রাম থেকে এখানে রাখালরা গোরু-ছাগল চরাতে আসে।'

ধীরেনদা বললেন, 'এখানকার দেওয়ালের গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। সেইজন্যই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানেও ছবি আছে। চল অন্য গুহায় যাই, পরিষ্কার ছবি দেখতে পাওয়া যাবে।'

এর পরের গুহাটা আবার অন্যরকম। সামনের দিকটা ছোট মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়, কিন্তু ভেতরটা ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে। একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। ধীরেনদা টর্চ জ্বেলে বললেন, 'এই দ্যাখ।'

এবার দেখলুম মাথার ওপরের পাথরে এক সারি মানুষ আঁকা। এইরকম।

ছবিগুলির রং গেরুয়া ধরনের। ওই রঙের কোনও পাথর ঘষে ঘষে আঁকা।

রিণাদি বললেন, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, সব ছবি এক রকম নয়। এরই মধ্যে দু'একজন যেন নাচছে মনে হচ্ছে, তাই না? ওরা নিশ্চয়ই নাচতেও জানত।'

দীপ্ত বলল, 'নাচতে তো সবাই জানে না! ধেই-ধেই করে লাফালেই নাচ হয়।'

আলো মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, ওরা এ-রকম বাচ্চাদের মতন ছবি আঁকত কেন?'

রিণাদি বললেন, এক লক্ষ বছর আগেকার মানুষ। তারা তো মনের দিক থেকে বাচ্চাই ছিল। ছবি আঁকার কথা যে চিন্তা করেছে, এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

ধীরেনদা বললেন, 'আমরা প্রথমবার যেবার এসেছিলাম, সে-কথা মনে আছে, কিনা? কী ভয় পেয়েছিলুম। এই গুহাটাতেই তো, না?'

রিণাদি বললেন, 'হ্যাঁ এটাতেই। সেবার কী হয়েছিল জান, সন্তু? সেবার দীপ্ত আর আলো আসেনি। আমি আর তোমাদের ধীরেনদা গুঁড়ি মেরে এই গুহাটাতে ঢুকে টর্চ জ্বেলেছি, দেখি যে এক কোণে একটা মানুয বসে। আমি তো ভয় পেয়ে এমন চিৎকার করে উঠেছিলুম।'

ধীরেনদা হাসতে হাসতে বললেন, 'শুধু চিৎকার! তুমি এমন লাফিয়ে উঠলে যে, ছাদে তোমার মাথা ঠুকে গেল।

রিণাদি বললেন, 'আহা, তুমি ভয় পাওনি?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ আমিও একটু একটু ভয় পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু চ্যাঁচাইনি! তারপর সেই মানুষটা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। সে কে জান? ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা! উনি এই সব ছবির ফটোগ্রাফ তুলছিলেন, সেই সময় ওঁর ক্যামেরার ফ্লাশটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

আমি বললুম, 'ডক্টর শাকসেনা তো এখানে বোধহয় প্রত্যেকদিন আসতেন। আমরা যতবার এসেছি, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

রিণাদি বললেন, 'ডক্টর শাকসেনাকে পাওয়া যাচ্ছে না...উনি এ-রকম কোনও গুহার মধ্যে লুকিয়ে নেই তো?'

ধীরেনদা বললেন, ওঁর এখানকার সব ছবি তোলা হয়ে গেছে। চল, এখান থেকে বাইরে যাই!'

এরপর কয়েকটা গুহায় আমরা ওইরকম একই ছবি দেখলুম। তারপরের একটা গুহায় দেখা গেল হরিণের ছবি।

ধীরেনদা বললেন, 'জান তো, ঐতিহাসিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, একই দেওয়ালে এক যুগের আঁকা ছবির ওপর অন্য যুগের মানুষরা ছবি এঁকেছে। খুব বড় ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আনলে বোঝা যায়। চল, পাশের গুহাটায় চল, একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি।'

সেই গুহাটা অনেকটা খোলামেলা। খানিকটা উঁচুতেও বটে। মুখটা প্রকাণ্ড, তেরচা সরু। একটা ডিমের আধখানা খোলার মতন। পাশের একটা পাথরের ওপর উঠে সেটাতে ঢোকা যায়। সেই গুহার ছাদে আঁকা একসার মানুষের মধ্যে একটা মানুষ একেবারে আলাদা। সেই মানুষটা একটা ঘোড়ায় চড়ে বর্শার মতন একটা জিনিস দিয়ে একটা হরিণকে মারছে।

ধীরেনদা বললেন, 'এটাকে দেখছ? এই ঘোড়ার পিঠেয় চড়া মানুষ কিন্তু অনেক পরের যুগে আঁকা। মানুষ বেশিদিন ঘোড়ায় চাপতে শেখেনি। এমন কী, রামায়ণ-মহাভারতের সময়েও ছিল না।'

দীপু আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বললুম 'রামায়ণ-মহাভারতে ঘোড়া নেই?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, আছে ঘোড়ার রথ টেনেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে কেউ চেপেছে কি? রাম-লক্ষ্মণ কিংবা অর্জুনের মতো বীর কখনো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছে? তা কিন্তু করেনি।'

'মহাভারতের যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না?'

'ছিল কি না তা জানি না। কিন্তু সেরকম যুদ্ধের কোনও বর্ণনা নেই। হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধ করার বর্ণনা আগে, শল্য এসেছিলেন হাতিতে চেপে, কিন্তু ঘোড়ায় চেপে কে এসেছিলেন বল?'

রিণাদি হেসে বললেন, 'তোমাদের ধীরেনদা আগে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, এখন হয়ে উঠছেন ইতিহাসের পণ্ডিত!'

ধীরেনদা রিণাদির ঠাট্টাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'আরও একটা ব্যাপার কী জান! এই সব ছবির কিছু কিছু আগে একদল ভেজাল। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই তো এর কোন মূল্য বোঝে না, সাহেবদের দেশে এ-রকম এতকালের পুরনো কোন ব্যাপার পাওয়া গেলে কত যত্ন করে ঘিরে-টিরে রাখত, পাহারাদার থাকত। কিন্তু এখানে যে-যখন খুশি আসতে পারে, ইচ্ছে মতন এসব ছবি নষ্টও করতে পারে! ভাগ্যিস বেশি লোক এই জায়গায় খোঁজ রাখে না। তবু কিছু লোক এখানে কোনও কোনও গুহার ছবির পাশে ইয়ার্কি করে নিজেরা ছবি এঁকে গেছে। সেগুলো অবশ্য দেখলেই চেনা যায়।'

রিণাদি বললেন, যাই বল, বাপু, জায়গাটা বড্ড নির্জন। আমার তো বেশিক্ষণ থাকলে গা ছম্‌ছম্‌ করে। এখানে যদি কেউ কোনও মানুষকে খুন করে রেখে যায়, অনেকদিনের মধ্যে তা কেউ টেরও পাবে না।

দীপু বলল, 'মনোমোহন ঝাঁর চাকরকে জিব-কাটা অবস্থায় এখানেই কোথায় পাওয়া গিয়েছিল না?'.

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, এই পাহাড়ের নিচে। দুদিন ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল! তারপর এখানকার সাধুজী ওকে দেখতে পেয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা গাড়ি থামিয়ে খবর দেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'সেই লোকটি বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, বেঁচে উঠেছে। লোকটি নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। হয়তো মনোমোহন ঝাঁর খুনিকেও ও দেখেছে। মুখ দিয়ে শব্দ করে ও কিছু বলতে চায়, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা নেই। ও লেখাপড়াও জানে না। তা হলে লিখে বোঝাতে পারত।'

আর দু'তিনটে গুহা ঘোরার পর রিণাদি বললেন, 'আমি বাপু আর পারছি না। আমরা ওপরে বসি। এবারও দীপু দেখিয়ে আনুক সন্তুকে।'

ধীরেনদা বললেন, তাই যাক। অবশ্য একশ তিরিশটা গুহার সব ওরা দেখতে পারবে না একদিনে। যতগুলো ইচ্ছে হয় দেখে আসুক।'

গুহাগুলো ক্রমশই নেমে গেছে পাহাড়ের নিচের দিকে। মাঝে মাঝে আবার ওপরেও উঠতে হচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম একটার পর একটা গুহা।

ছবি অবশ্য বেশির ভাগ গুহাতেই একরকম। মানুষের ছবিই বেশি। একটাতে দেখতে পেলুম কয়েকটা রথের মতন জিনিসের ছবি!

মিংমা সব সময় আমাদের পেছনে পেছনে ছায়ার মতন আসছে। এখানকার ব্যাপারটা সে বুঝতে পারেনি, আমি যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এক-একটা গুহার মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে ছোট ছোট ছবি খুঁজে বার করার ব্যাপারে ও নিজেই বেশ মজা পেয়েছে। যে-গুলো আমরা দেখতে পাই না সেগুলো ও দেখায়।

একটা গুহা বিরাট বড়। এটাকে ঠিক গুহা তো বলা যায় না, নিচে বেশ সিমেন্টের মেঝের মতন মসৃণ পাথর আর তার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন ঝুলছে! অবশ্য সেই পাথরটা পড়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, হয়তো ওই অবস্থাতেই রয়েছে কয়েক লক্ষ বছর। মাঝখানের জায়গাটিতে অন্তত পঞ্চাশ ষাট জন লোক শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এত বড় একটা গুহাতে কিন্তু আমরা কোনও ছবি খুঁজে পেলুম না! এক এক জায়গায় মনে হল যেন ছবি আঁকা ছিল, কেউ ঘষে ঘষে মুছে দিয়েছে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ

আমরা মন দিয়ে সেই গুহার মধ্যে ছবি খুঁজছি, এমন সময় হঠাৎ এমন বিকট একটা আওয়াজ হল যে, দীপ্ত আর আমি দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলুম। আমরা ভয় পাওয়ার চেয়েও চমকে গেছি বেশি। কোনও মানুষ না জন্তু ওই আওয়াজটা করল তা বুঝতে পারলুম না।

তক্ষুনি আবার সেই আওয়াজটা হল। এবার বুঝলুম, কোনও জন্তু ও-রকম শব্দ করতে পারে না। মানুষেরই মতন গলা, যেন কেউ কোনও হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে শব্দ করছে হী-ঈ-ই-ঈ-ঈ! এমনই ভয়ঙ্কর সেই শব্দ যে শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে।

গুহাটার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ান যায় না, আমরা দাঁড়িয়েছিলুম ঘাড় বেঁকিয়ে। সেই অবস্থাতেই মিংমা সাঁ করে ছুটে গেল বাইরে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিংমার গলার একটা কাতর আওয়াজ পাওয়া গেল আঃ!

এবার আমি আর দীপ্তও বাইরে চলে এলুম। এসে যা দেখলুম, তা ভাবলে, এখনও যেন গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

মিংমা গুহার বাইরে লুটিয়ে পড়ে আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। হ্যাঁ, মানুষই বটে! সারা মুখ দাঁড়ি-গোঁফে ঢাকা, মাথায় জট পাকানো চুল গা-ভর্তি বড় বড় লোম আর দৈত্যের মতন চেহারা। একটা পুরো কলাপাতা তার কোমরে জড়ান, সেটাই তার পোশাক, হাতে একটা পাথরের মুগুর। ঠিক ছবিতে দেখা গুহামানব যেন একটি।

লোকটি আগুনের ঢেলার মতন চোখে কট্‌মট্‌ করে তাকাল আমাদের দিকে। ঠিক যেন বলতে' চায়, আমার গুহায় তোমরা ঢুকেছ কেন? ওই পাথরের হাতুড়ি দিয়ে মারলে আমার আর দীপ্তর মাথা তক্ষুনি ছাতু হয়ে যেত। কিন্তু কোনও কারণে আমাদের ওপর দয়া করে মারল না, চট করে সরে গেল পাথরের আড়ালে।

দীপ্ত আর আমি পাথরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলুম। একটুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলুম না। সত্যিই এক লক্ষ বছরের কোনও গুহামানবের বংশধর এখনও এখানে রয়ে গেছে।

মিংমা আবার 'আঃ' শব্দ করতেই আমাদের দু'জনের বিস্ময়ের ঘোর ভাঙল। দু'জনে কোনও আলোচনা না-করেই মিংমাকে চ্যাং-দোলা করে ছুট লাগালুম। বারবার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম, সেই মানুষটা তাড়া করে আসছে কি না!

মিংমার বাঁ কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুগুরের আঘাতটা ওর মাথায় লাগেনি, লেগেছে ঘাড়ে। তাতে ও একটুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই জ্ঞান ফেরায় ও বলল, 'ছোড় দোও, আভি ছোড় দোও!'

বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে আমরা মিংমাকে শুইয়ে দিলুম এক জায়গায়। মিংমা উঠে বসে হাত দিয়ে কানের রক্ত মুছল, মাথাটা ঝাঁকাল দু'তিনবার। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে এক সাঙঘাতিক কাণ্ড করল। একটা বড় পাথর টপ্ করে তুলে নিয়ে তরতর করে ছুটে গেল সেই গুহাটির দিকে। আমাদের বাধা দেবার কোনও সুযোগই দিল না। মিংমা পাহাড়ি জায়গায় মানুষ, কেউ আঘাত করলে ওরা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না।

দীপ্তকে বললুম, 'চল, আমরাও যাই।'

দীপ্ত আর আমিও তুলে নিলুম দুটো পাথর। তারপর অনুসরণ করলুম মিংমাকে। সেই বড় গুহাটার বাইরে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে দেখা হল ভাল করে। সেখানে ওই লোকটা ঢোকেনি। মিংমা এদিক-ওদিকেও খানিকটা খুঁজে এসে বলল, 'ভাগ গয়া।'

এখানে কেউ যদি লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে খুঁজে বার করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। একটা এইরকম ছোট পাহাড়ে এতগুলো গুহা, বোধহয় আর কোথাও নেই।

দীপ্ত বলল, 'চল, ওপরে গিয়ে বাবাকে বলি!'

ওপরে উঠতে উঠতে আমি ভাবতে লাগলুম, ব্যাপারটা কী হল, আজকের দিনে কোনও আদিম মানব কি টিকে থাকতে পারে? তাও ভূপাল শহরের এত কাছে? না, অসম্ভব! এ-কথা শুনলে মনে হয় যে কেউ আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। কেন? কেউ কি চায় যে, আমরা আর ওই গুহাগুলোর মধ্যে না ঢুকি? একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে আদিম মানুষদের আঁকা ছবি দেখব, এতে কার কী আপত্তি থাকতে পারে? এই পাহাড়টা নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টের সম্পত্তি!

হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ হল, যাকে একটু আগে দেখলুম মাথায় চুলের জটা, মুখে দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল...ও রকম চেহারা তো কোনও সাধুরও হতে পারে। ওপরে একটা গুহায় একজন সাধুবাবা যে মন্দির বানিয়েছে, তিনিই আমাদের ভয় দেখাতে আসেননি তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই! সাধুবাবা চান যাতে এখানে বাইরের লোকজন না আসে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। দীপ্ত দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে যখন ধীরেনদাকে সব ঘটনাটা বলল, তখন ধীরেনদা হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, দীপ্ত যখন-তখন গল্প বানায়, ভাবে যে আমরা বিশ্বাস করব।'

রিণাদি বললেন, 'তুই মোটেই লেখক হতে পারবি না দীপ্ত, তোর গল্প বড্ড গাঁজাখুরি হয়। যা, যথেষ্ট হয়েছে, গাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ারগুলো নিয়ে আয়, এবার খেয়ে নেওয়া যাক!'

দীপ্ত বলল, 'তোমরা বিশ্বাস করলে না? সন্তুকে জিজ্ঞেস কর! আর ওই

দ্যাখ মিংমার কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে!'

রিণাদি বললেন, 'সন্তু আর কি বলবে, ওকে তো আগে থেকেই শিখিয়ে এনেছিস। মিংমা নিশ্চয়ই আছাড়টাছাড় গুহামানব খেয়ে পড়েছে কোথাও!'

ধীরেনদা বললেন, টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরিতে গুহামানব, অ্যাঁ? দু'একটা থাকলে মন্দ হত না। কেয়া হুয়া মিংমা? আছাড় খাকে গির্ গিয়া, তাই না?' মিংমা বলল, একঠো আদমি, বহুত তাগড়া জোয়ান পাঠ্যে হাঁতে পাথরের লাঠি, খুব জোরসে হামায় মারল!'

ধীরেনদার ধারণা হল, মিংমা বোধহয় মিথ্যে কথা বলছে না। তিনি একটু চিন্তিতভাবে বললেন, সত্যিই মেরেছে? তাহলে কোনও পাগলটাগল হবে বোধহয়!' রিণাদি বললেন, 'দেখি কতটা লেগেছে?'

পরীক্ষা করে দেখা গেল, মিংমার সার্টের নিচে কাঁধেও খানিকটা থেঁতলে গেছে। বেশ জোরেই আঘাত করেছে, মিংমার আরও বেশি ক্ষতি হত, যদি মাথায় লাগত।

ধীরেনদা বললেন, চল তো, সাধুবাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এখানে কোনও পাগলটাগল ঘুরে বেড়ায় কিনা। উনি নিশ্চয়ই জানাবেন।'

আমিও তাই চাই। সাধুবাবাকে একবার দেখা দরকার। আমি বললুম, 'চলুন ধীরেনদা, সাধুবাবার কাছে চলুন।'

গুহাগুলোর পাশ দিয়ে যে গলি-গলি মতন রয়েছে, ধীরেনদা সেই পথ খুব ভাল চেনেন। বেশ সর্টকাটে উনি আমাদের চট্ করে নিয়ে এলেন সাধুবাবার আশ্রমের কাছে।

সেখানে জ্বলন্ত ধুনির পাশে একটা খাটিয়ায় একজন মানুষ আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে আশ্রমের দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। দূর থেকে সেই চেহারা দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। পেছন থেকে কাঁধের ভঙ্গিটাই যে খুব চেনা মনে হচ্ছে! আমরা একটু কাছে যেতেই আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সেই মানুষটি মুখ ফেরাল আমাদের দিকে।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'কাকাবাবু?'

।। পাঁচ ।।

ধীরেনদা রিনাদিরাও কাকাবাবুকে দেখে যেমন চমকে উঠলেন, তেমনই খুশি হলেন।

মিংমাও 'আংকল্ সাব' বলে একটা সেলাম দিল।

কাকাবাবু অবশ্য আমাদের দেখে একটুও অবাক হলেন না। বরং তার মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মিংমা, তুম-হারা কানসে খুন গিরতা! কেয়া হুয়া?'

এবারে দীপুর বদলে আমিই সবিস্তারে ঘটনাটা জানালুম।

কাকাবাবু এতেও বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, হুঁ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মিংমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুছে ফেল! আর ওই যে গাঁদাফুলের গাছ দেখছ, ওর কয়েকটা পাতা-হাত দিয়ে চিপে সেই রসটা কাটা জায়গায় লাগিয়ে দাও।'

ধীরেনদা বললেন, 'কাকাবাবু আপনি ভূপালে এসেছেন, সেটা আমাদের বিরাট সৌভাগ্য। কিন্তু... আপনি এ জায়গায় কি করে রাস্তা চিনে এলেন? আপনি ভীমবেঠ্কার কথা আগে জানতেন? কাকাবাবু কোনও উত্তর দেবার আগেই আশ্রমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক সাধু। গেরুয়া কাপড় পরা, রোগা লম্বা চেহারা, থুতনিতে একটু দাড়ি, মাথায় চুলও কম।

কাকাবাবু বললেন, 'নমস্তে, সাধুজী! আচ্ছা হ্যায় তো।'

সাধুজী চোখ কুঁচকে কাকাবাবুকে ভাল করে দেখে তারপর বললেন, 'কওন? আরে, ইয়ে তো রায়চৌধুরীবাবু! রাম, রাম! ভগবান আপ্‌কা ভালো করে!'

বুঝলুম, কাকাবাবু যে শুধু ভীমবেঠ্কার কথা আগে থেকে শুনেছেন তাই নয়। তিনি এখানকার সাধুজীকেও চেনেন!

আরও দু'একটা কথা বলার পর কাকাবাবু সাধুজীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, সাধুজী, আপনার এখানে কোনও পাগল-টাগল ঘুরে বেড়ায়? এরা একজনকে দেখেছে বলল—'

সাধুজী হিন্দিতে বললেন, 'হ্যাঁ, পাগল তো এক আমিই আছি। আর কোন্ পাগল এখানে থাকবে।'

একটু থেমে সাধুজী আবার বললেন, তবে কি জানেন, রায়চৌধুরীবাবু রাত্তিরের দিকে কারা যেন এখানে আসে! আমি শব্দ পাই। আগে, জানেন তো, ভূত-প্রেতের ভয়ে সাঁঝের পর এখানে মানুষজন আসত না। কাছাকাছি গাঁয়ের লোক তো এ-জায়গার নাম শুনলেই ভয় পায়। আমি ভূতপ্রেত মানি না। আমি জানি ওসব কিছু নেই। কিন্তু এখন রাত্তিরে কারা আসে তা আমি জানি না।'

কাকাবাবু বললেন, 'হু, আমিও তাই ভেবেছিলুম।'

উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ্ বগলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, সাধুজী, আমি একটু পরে ঘুরে আসছি। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'চল।'

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কখন পৌঁছলেন ভূপালে?'

কাকাবাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'এই এগারোটার সময়! রুমি বলল যে, সন্তুরা সবাই ভীমবেঠ্‌কায় গেছে। তাই আমিও একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে এলুম।'

রিণাদি বললেন, 'তা হলে তো আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়নি। আমাদের সঙ্গে খাবার আছে, আসুন আমরা খেয়ে নিই।'

কাকাবাবু বললেন, বেশ তো।'

গাড়ি থেকে আমরা টিফিন কেরিয়ারগুলো আর জলের বোতল নামিয়ে নিলুম। তারপর গিয়ে বসলুম একটা বিরাট পাথরের ছায়ায়।

রিনাদি যে কতরকম খাবার এনেছেন তার ঠিক নেই। হ্যামস্যাণ্ডুইচ সসেজ, স্যালামি, চিকেন রোস্ট, রাশিয়ান স্যালাড্‌ আরও কত কী।

খাওয়া শুরু করার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, আপনি হঠাৎ ভূপালে এলেন কেন? তখন না বলেছিলেন...

কাকাবাবু বললেন, 'আসতে হল বাধ্য হয়ে। এই যে নিপু, ও একটা গাধা। কলকাতায় গিয়ে বারবার বলছিল, ভূপালে তিনটে খুন হয়েছে। খুনি ধরা কি আমার কাজ? কিন্তু নিপু এবারও বলেনি, যে তিনজন খুন হয়েছেন, তাঁরা তিনজনই পরস্পরকে চিনতেন, তিনজনেই গবেষণা করতেন ইতিহাস নিয়ে।'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, অর্জুন শ্রীবাস্তবকে সব সময় ইতিহাসের বই-ই পড়তে দেখেছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'অর্জুন শ্রীবাস্তব, সুন্দরলাল বাজপেয়ী, মনোমোহন ঝাঁ—এঁরা তিনজনই ইতিহাসের নামকরা পণ্ডিত। সুন্দরলাল বাজপেয়ীর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল, একবার ভূপালে এসে আমি সুন্দরলালের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম।'

রিণাদি বললেন, 'তা হলে তো ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনাও...'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঐতিহাসিক হিসেবে ওঁর ভারতজোড়া নাম। চিরঞ্জীব আমার বিশেষ বন্ধু। একবার আফগানিস্থানে আমরা দু'জনে একসঙ্গে এক্সকাভেশানে গিয়েছিলাম। সেবারেই একটা দুর্ঘটনায় আমার এক পা নষ্ট হয়ে যায়।'

ধীরেনদা বললেন, 'ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, শুনেই আপনি ভূপালে এসেছেন তা হলে?'

কাকাবাবু বললেন, অর্জুন শ্রীবাস্তব, সুন্দরলাল বাজপেয়ী আর

মনোমোহন ঝাঁ-এর মৃত্যুর খবর কলকাতার কাগজে বেরোয়নি। নিপু যদি ওদের নাম বলত তা হলে আমি তখুনি বুঝতে পারতুম। যাই হোক, চিরঞ্জীব শাকসেনার উধাও হয়ে যাবার খবর সব কাগজেই বেরিয়েছে। সেইসঙ্গে আগের তিনটে খুনের খবর। তখনই আমি বুঝতে পারলুম, এগুলো সাধারণ খুন নয়। কেউ একজন বেছে বেছে ঐতিহাসিকদের মারছে কেন? এর মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে। এদের সরিয়ে দেওয়ার কার কি স্বার্থ থাকতে পারে সেটাই আগে দেখা দরকার সেইজন্যেই আমি এসেছি।'

ধীরেনদা বললেন, 'আশ্চর্য। বেছে বেছে শুধু ইতিহাসের পণ্ডিতদের মেরে কার কি লাভ? কেউ কি কোনও ইতিহাস মুছে দিতে চায়।'

কাকাবাবু বললেন, 'সেই জন্যেই রুমির কাছে শোনামাত্র চলে এলুম এখানে। মনে হল, তোমাদের এখানে কোনও বিপদ হতে পারে।'

আমি আর ধীরেনদা দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম, 'এখানে, কেন!' কাকাবাবু বললেন, ছোটখাট একটা বিপদ যে ঘটেই গেছে তা তো দেখাই যাচ্ছে!'

তারপর মিংমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'মিংমা, তুমি চিন্তা কোর না। তোমায় যে আঘাত করেছে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। আমার হাত থেকে সে, কিছুতেই ছাড়া পাবে না।'

মিংমা বলল, ও আদমি আভিতক্ ইধার-উধার হ্যায়!'

কাকাবাবু বললেন, রহনে দেও। ধরা সে পড়বেই!'

রিণাদি বললেন, তোমরা কাকাবাবুকে পাঁচমারির ঘটনাটা বল।'

ধীরেনদা তখন ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনার ভাই বিজয় শাকসেনার সঙ্গে পাঁচমারিতে দেখা হয়ে যাওয়া এবং পরের ঘটনা জানালেন কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললেন, 'তিনজন খুন হয়েছে, আর একজন নিরুদ্দেশ, প্রত্যেকেই ইতিহাসের পণ্ডিত। এমনও হতে পারে, ইতিহাসের কোনও একটা বিষয় নিয়েই চারজন গবেষণা করছিলেন। চিরঞ্জীব শাকসেনা এই ভীমবেঠ্‌কা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন গত মাসে।

সেইজন্য আমার সন্দেহ হচ্ছে, সমস্ত রহস্য আছে এই ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ের গুহাগুলোর মধ্যেই। খাওয়া শেষ তো, এবার ওঠা যাক্, অনেক কাজ বাকি আছে। ধীরেনবাবু, আপনার ওপর দু'একটা দায়িত্ব দেব।'

ধীরেনদা বললেন, "আমাকে 'বাবু' আর 'আপনি' বলবেন না। শুধু ধীরেন বলুন।"

কাকাবাবু বললেন, বেশ তো ধীরেন, তুমি এখন মিংমাকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও, ওর চোটের জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে দেবে।

তারপর ফোলডিং খাট কোথায় পাওয়া যায়, সেরকম দুটো খাটও জোগাড় করা দরকার। আজ সন্ধ্যের পর থেকে মিংমা আর আমি এখানে থাকব।'
ধীরেনদা অবাক হয়ে বললেন, 'এখানে থাকবেন? রাত্তিরবেলা?'

'হ্যাঁ আমি আগেও তো এখানে থেকেছি। ১৯৫৮ সালে এই গুহাগুলো আবিষ্কার হবার ঠিক পরের বছরই চিরঞ্জীব আর আমি এখানে এসে দু'রাত্তির ছিলাম। তখন গুহাগুলির মার্কিং হচ্ছিল।'

আমি বললুম, 'তাহলে তিনটে ঘাট। আমিও থাকব।'

ধীরেনদা রিণাদির দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি যদি বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি সামলাতে পার, তা হলে আমি কাকাবাবুর সঙ্গে ওখানে থেকে যাই। যদি কাকাবাবুর সঙ্গে নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হতে পারি—'

রিণাদি বললেন, 'সে তোমার ইচ্ছে হলে থাক না! আমি বাড়িতে ঠিক ম্যানেজ করতে পারব।'

কাকাবাবু বললেন 'অত লোক থাকলে কোনও লাভ হবে না। ধীরেন তোমাকে শহরে থেকেই কিছু কাজ করতে হবে। সন্তুরও থাকবার দরকার নেই। মিংমা তো থাকছেই আমার সঙ্গে।' মিংমা বলল, 'নেহি, সন্তু সাব্‌ভি রহেগা। আচ্ছা হোগা!'

কাকাবাবু বললেন, 'তবে তাই হোক। চল, এখন আমাকেও একবার শহরে যেতে হবে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, কিছু কেনাকাটিও আছে।'

কাকাবাবু যে গাড়িটা এনেছিলেন, সেটা এখনও রয়েছে। মিংমা ধীরেনদাসের গাড়িতে উঠল, আমি রইলুম কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক হল যে বিকেল পাঁচটার সময় আমরা ধীরেনদাদের বাড়ীতে মিট করব।

গাড়িতে ওঠার সময় কাকাবাবু বললেন, 'ধীরেন, তোমরা একটু সাবধানে থেক। হঠাৎ কোন বিপদ হতে পারে। রাত্তিরবেলা বাড়ির দরজা-জানালা সব ভালভাবে বন্ধ করে রাখবে।'

ধীরেনদা হেসে বললেন, 'বারে! আমরা থাকব নিজেদের বাড়িতে, আর আপনারা থাকবেন পাহাড়ের ওপর খোলা জায়গায়। আপনি আমাদের বলছেন সাবধানে থাকতে?

আমাদের তো অভ্যেস আছে। আমরা আগে থেকে বিপদের গন্ধ পাই। কিন্তু তোমরা যে আজ ভীমবেঠ্‌কায় এসেছ, আমার সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, এতে তোমাদের ওপর শত্রুপক্ষের নজর পড়তে পারে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, কোন সাংঘাতিক নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর দল এর পেছনে আছে। যারা এইরকম বীভৎসভাবে খুন করতে পারে—'

'আপনারা এখানে রাত্তিরে থাকবেন'

'তার কোনও ঠিক নেই। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।'

'তা হলে আমি কিন্তু একটা রাত অন্তত আপনাদের সঙ্গে এখানে কাটাব।

'আচ্ছা সে দেখা যাবে। তা হলে বিকেল পাঁচটায়?'

দুটো গাড়িই ছাড়ল একসঙ্গে। কাকাবাবু কয়েকটা জায়গায় থামলেন। আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে উনি যেন কার কার সঙ্গে দেখা করে এলেন। দেখা যাচ্ছে কাকাবাবু ভুপালের অনেককেই চেনেন।

তারপর আর একটা বাড়ির সামনে এসে বললেন, 'সন্তু এবার তুই চল আমার সঙ্গে।'

সেই বাড়ির গেটের পাশে নেমপ্লেটে লেখা ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনার নাম।

বেশ বড় তিনতলা বাড়ি, সামনে-পেছনে অনেকখানি বাগান। বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ রয়েছে সেই বাগানে। কয়েকটা পাথরের মূর্তিও দেখতে পেলাম। এক জায়গায় একটা বেঞ্চে বসে আছে দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ।

এত বড় বাড়িটা কিন্তু একদম চুপচাপ। কোনও লোকজনের শব্দ নেই। আমরা গেট ঠেলে ঢুকতেই একজন পুলিশ এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

কাকাবাবু জানালেন যে, তিনি ডক্টর শাকসেনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান।

পুলিশ বলল যে, তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করছেন না। খবরের কাগজ থেকে অনেক লোক এসেছিল, সবাই ফিরে গেছে। ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা নিরুদ্দেশ হয়েছেন প্রায় আটদিন আগে, এই ক'দিন তাঁর স্ত্রী একবারও তিনতলা থেকে নিচে নামেননি।

কাকাবাবু নিজের একটা কার্ড দিয়ে বললেন, 'এটা ভেতরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। উনি আমার সঙ্গে ঠিকই দেখা করবেন।'

একটু বাদেই বাড়ির ভেতর থেকে বুড়ো মতন একজন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের ডেকে বলল, 'আপলোগ আইয়ে।'

চিরঞ্জীব শাকসেনার স্ত্রীর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রং একদম মেমসাহেবের মতন। একটা চওড়া হলুদপাড় সাদাশাড়ি পরে আছেন। এঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। পরে জানলুম, ইনি গুজরাটের মেয়ে হলেও একটানা আট বছর ছিলেন শান্তিনিকেতনে।

বসবার ঘরে ঢুকেই উনি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী আপনি কবে এসেছেন?'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বসুন, ভাবিজী, বসুন। আজই এসেছি, দাদার খবরটা শুনেই চলে এলুম। ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল বলুন তো?

ভদ্রমহিলা বেশ শক্ত আছেন, শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়েননি। এই আটদিনের মধ্যেও যে চিরঞ্জীব শাকসেনার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি, এক হিসেবে সেটাই ভাল খবর। তার মানে ওঁকে এখনো মেরে ফেলা হয়নি। কোনও এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই।

উনি বললেন, 'আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না তো আপনাকে কি বলব। উনি আগের দিন বিদেশ থেকে ফিরলেন, খুব ক্লান্ত ছিলেন ভাল করে কথাই বলতে পারিনি...পরদিন থেকেই নিখোঁজ। কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, কার সঙ্গে গেলেন, কিছুই জানি না।'

'এর মধ্যে অন্য কেউ কোনও চিঠি বা খবর পাঠায়নি?'

'না। এই ছেলেটি কে?'

'ও আমার ভাইপো, ওর নাম সন্তু। আচ্ছা ভাবিজী, একটা কথা বলুন তো, অর্জুন শ্রীবাস্তব, মনোমোহন ঝাঁ আর সুন্দরলাল বাজপেয়ী—এঁরা শেষ কবে আপনার বাড়িতে এসেছিলেন? এঁদের আপনি চেনেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ চিনি। এঁরা তো প্রায়ই আসতেন।'

'শেষ কবে এসেছিলেন?'

দাঁড়ান, দাঁড়ান ভেবে দেখি, হ্যাঁ, উনি বিদেশ যাবার ঠিক আগেই সন্ধ্যেবেলাতেই তো এসেছিলেন সবাই। আরও অনেকে এসেছিলেন, কিন্তু ওঁরা ছিলেন অনেক রাত পর্যন্ত।'

'কি কথা হয়েছিল বলতে পারেন?'

'তা তো জানি না। ওঁরা তো প্রায়ই দরজা বন্ধ করে কি সব আলোচনা করতেন। সেদিন ওঁরা চার-পাঁচজন মিলে খুব চিল্লাচিল্লি করছিলেন বটে।'

'চার-পাঁচজন? ঠিক ক'জন ছিলেন?'

'তা তো জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে ওরা সবাই তো খুব চায়ের ভক্ত, কয়েকবার করে চা পাঠাতে হয়েছে। প্রত্যেকবার পাঁচ কাপ করে।'

'তার মানে অন্তত পাঁচজন। আমরা চারজনের হিসেব পাচ্ছি, আর একজন কে?'

'তা জানি না। ওরা চারজনেই বেশি আলোচনা করতেন, হয়তো সেদিন আরও কেউ একজন ছিলেন। অনেকেই তো আসতেন নানা কাজে।'

'চিরঞ্জীবদাদা বিদেশে থাকার সময় ওঁর যে তিনজন বন্ধু খুন হয়েছেন; সে-কথা উনি জেনেছিলেন?'

'যেদিন ফিরলেন, সেদিনই আমি বলিনি। ভেবেছিলাম কী, পরে একসময় বলব। আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা আঘাত—'

'অন্য কেউ বলে দিতে পারে?'

'আমি বিজয়কেও নিষেধ করে দিয়েছিলাম।'

হ্যাঁ ভাল কথা। ভাবিজী, বিজয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে?'

সে তো হোসাঙ্গাবাদ হাসপাতালে আছে! পাঁচমারিতে ডাকাতরা তাকে গুলি করেছিল। তবে জখম বেশি হয়নি, দু'চারদিনের মধ্যে ফিরে আসবে।'

'চিরঞ্জীবদাদার যে একজন খুব বিশ্বাসী লোক ছিল, সব সময় সঙ্গে থাকত, কি নাম যেন...ও হ্যাঁ, ভিখু সিং, সে কোথায়?'

'উনি বিদেশে যাবার সময় সে ছুটি নিয়ে নিজের বাড়ি গিয়েছিল।

ওর বাড়ি বিলাসপুর। এতদিন তার ফিরে আসার কথা। কিন্তু সে আসেনি।'

'হুঁ! ঠিক আছে, ভাবিজী, আমরা এবার যাব। বেশি চিন্তা করবেন না। আজ বা কাল যদি দৈবাৎ চিরঞ্জীবদাদা ফিরে আসেন, তবে বলবেন যে আমি ভীমবেঠ্কায় আছি।'

এতক্ষণ বাদে চমকে উঠলেন চিরঞ্জীব শাকসেনার স্ত্রী বীণা দেবী। তিনি বললেন, 'ভীমবেঠকায়? আপনি ওখানে থাকবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? ভীমবেঠ্কায় তো থাকার জায়গা নেই, রাত্তিরবেলা কোনও বিপদ হতে পারে, মানে, আপনার দুপা ঠিক নেই... না, না, ও-কাজ করবেন না!'

'ভাবিজী, কিছুদিন ধরে চিরঞ্জীবদাদা ওই ভীমবেঠ্কা নিয়ে খুব চিন্তা করছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওখানে যে ব্রাহ্মী লিপি আছে, তার নাকি পাঠোদ্ধার অনেকখানি করেছেন, এ-রকম তো শুনছিলাম।'

'অনেকখানি করেছেন? পুরোটা পারেননি?'

'সেইরকমই তো জানি।'

'বুঝলাম। এবার তাহলে আমরা উঠি।'

বীণাদেবী ব্যাকুলভাবে বললেন, আপনি রাতে ওই নিরালা জায়গায় থাকবেন এটা আমার মনে ভাল লাগছে না! দিনকাল ভাল না, কখন কী হয়...।'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার সঙ্গে অন্য আরও লোক থাকবে। তা ছাড়া আমি তো চিরঞ্জীবদাদার মতন ভালমানুষ নই, আমার সঙ্গে রিভলবার থাকে।'

বীণাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলুম ধীরেনদার বাড়িতে।

মিংমাকে ডাক্তার ইঞ্জেকশন আর ওষুধ দিয়েছেন! একটা ব্যাণ্ডেজও বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা খুলে ফেলেছে মিংমা। ও বলেছে, ব্যাণ্ডেজের কোনও দরকার নেই।

সে-কথা শুনে কাকাবাবু বললেন, 'ও ঠিক আছে।'

তিনখানা ফোলডিং খাট, কম্বল, নানারকম খাবার-দাবার গুছিয়ে রাখা হয়েছে এর মধ্যেই। ছোড়দিরাও এখানে এসে জড় হয়েছে। আমরা তিনজন ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ে থাকব শুনে ধীরেনদার মতন নিপুদা আর রত্নেশদা যেতে চাইল সঙ্গে। কিন্তু কাকাবাবু আর কারুকে নেবেন না।

ছোড়দি আমায় কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। কাকাবাবুকে তো আর কেউ ফেরাতে পারবে না। কিন্তু ভূপালে এসে আমার যদি কোনও বিপদ হয়, তবে সেটা যেন ছোড়দিরই দায়িত্ব।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, 'বাবা আমায় কি বলে দিয়েছেন জানিস না? কাকাবাবু যখন যেখানে থাকবেন, সব সময় আমাকে ওঁর সঙ্গে থাকতে হবে।'

আর দেরি করলে পাহাড়ে উঠতে বেশি রাত হয়ে যাবে। সেইজন্য কাকাবাবু বললেন, 'চল, এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

ধীরেনদা বললেন, কিন্তু আপনাদের খবর পাব কি করে? কাল সকালে কি আমরা কেউ যাব?'

কাকাবাবু বললেন, 'না, তোমাদের যাবার দরকার নেই। আমরা দু'দিনের মতন খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে যদি না ফিরি তা হলে একজন কেউ কিছু খাবার পৌঁছে দিয়ে এস।'

'কিন্তু আপনার ভাড়া করা গাড়িটা তো ওখানে দু'দিন থাকবে না, পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। হঠাৎ যদি আপনাদের ভূপালে আসার দরকার হয়, তাহলে আসবেন কি করে?'

'সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিকই, তোমাদের যাতে বেশি চিন্তা না হয়, সেইজন্য এটা তোমাদের দেখিয়ে রাখছি।'

কাকাবাবু তাঁর কিট ব্যাগ খুলে রেডিও'র মতন যন্ত্র দেখালেন। ওটা একটা শক্তিশালী ওয়ারলেস ট্রান্সমিশান সেট। বহুদূরে খবর পাঠান যায়।

আমি জানি, কাকাবাবু কলকাতার বাইরে কোথাও গেলেই ওই যন্ত্রটা সব সময় কাছে রাখেন।

মিংমা আর আমি ড্রাইভারের পাশে বসলুম। কাকাবাবু পেছনের সীটে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে বললেন, পৌঁছতে অন্তত দেড় দু-ঘন্টা লাগবে, ততক্ষণ আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।'

।। ছয় ।।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি আলো মিলিয়ে যায়নি। দূর থেকে ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়টা দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয় যেন একটা সাধারণ উঁচু টিলা। এর ভেতরে যে অতগুলো গুহা আছে, তা কল্পনা করাই শক্ত। আসলে পাহাড়টা একটা মৌচাকের মতন, রক শেলটায় বা গুহাতেই ভর্তি।

কাকাবাবু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন। ওপরে পৌঁছবার পর আমরা, ওঁকে জাগিয়ে দিলুম। মালপত্রগুলো সব বয়ে নিয়ে যাওয়া হল সাধুবাবার আশ্রমের কাছে। তারপর গাড়িটা ফিরে গেল!

প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপ করে নামল অন্ধকার। সেই অন্ধকার এমন কুচকুচে কালো যে পাশের লোককেও দেখা যায় না! শুধু দূরে দেখা যায় ধুনির আগুন।

সাধুবাবা সত্যিকারের সাহসী লোক। রাত্তিরে এখানে উনি একা থাকেন। যে দু'তিনজন লোককে দিনের বেলা ওঁর আশ্রমে দেখেছিলুম, তারা পাহাড়ের নিচে গ্রামের লোক। সন্ধ্যেবেলা ফিরে যায়।

ধুনির আগুনের কাছাকাছি আমাদের খাটগুলো পেতে ফেলা হল। রাত্তিরে মিংমা আমাদের জন্য রান্না করবে। মিংমা দারুণ খিচুড়ি রাঁধে।

সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন, ওঁর সঙ্গে কোনও কথা বলা গেল না। কাকাবাবু ঘড়ির উপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'সাড়ে সাতটা বাজে, রাত দশটা আন্দাজ চাঁদ উঠবে, তখন আমরা একটু বেড়াতে বেরুব।'

জায়গাটা যে কি অসম্ভব নিস্তব্ধ, তা বলা যায় না। এখানে ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত নেই। সেরকম একটা জঙ্গল দেখিনি এই পাহাড়ে। মাঝে মাঝে একটা দুটো বড় বড় গাছ তবে ছোট গাছই বেশি। অবশ্য দুপুরবেলা গুহাগুলো দেখতে দেখতে যখন পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে নিচে নামছিলাম, তখন আরও নিচের দিকে জঙ্গলের মতন দেখেছি। আমরা ঘুরেছিলাম মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা গুহায়, আরও কত গুহা না-দেখা রয়ে গেছে।

দিনের বেলায় ধীরেনদার সেই কথাটা মনে পড়ল। তাই আমি কাকাবাবুকে বললুম, 'আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা এই ক'দিন একটা বেশ ভালমতন গুহার মধ্যে থাকতে পারতুম না?'

কাকাবাবু বললেন, হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সেকালের মানুষের পক্ষে গুহায় থাকাই সবচেয়ে সুবিধের ছিল। কিন্তু একালে মানুষই সবচেয়ে হিংস্র। আমাদের যদি কেউ মারতে চায়, তাহলে গুহার বাইরে থেকে গুলি চালিয়ে খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারে। তা ছাড়া আমরা

একটা গুহার মধ্যে ঢুকে বসে রইলে চারিদিকে নজর রাখতে পারব না।

তারপর সাধুবাবার আশ্রমের দিকে হাত তুলে বললেন, 'দেখেছিস, সাধুজী কি চমৎকার জায়গা বেছেছেন। সামনে দেওয়াল। সবাইকে এখানে সামনে দিয়েই আসতে হবে। এখানে বসে থাকলে গাড়ির রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়।

সাধুবাবা একটা হরিণের ছালের ওপর জোড়াসনে শিরদাঁড়া একদম সোজা করে বসে আছেন। চোখ দুটো বোজা। আমরা যে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তাতেও উনি একবারও চোখ খোলেননি।

মিংমা মুগ্ধ হয়ে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই হিমালয় পাহাড়ে এরকম আরও সাধু দেখেছে, তাই ওর চেনা লাগছে। আমি গল্পের বইয়ের ছবিতে ছাড়া এরকম কোন ধ্যানময় সাধুকে দেখিনি। উনি কি সারারাতই এইভাবে থাকবেন নাকি?

কাকাবাবু আমায় বললেন, 'খাওয়া হয়ে গেলে তুই আর মিংমা যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তে পারিস। আমি রাত আড়াইটে পর্যন্ত জাগব। তারপর মিংমাকে তুলে দেব।'

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা মোটে। সময় যেন কাটতে চায় না।

একটু বাদে মিংমা স্টোভ জেলে রান্না চাপিয়ে দিল। আমি ওর পাশে বসে ব্যগ্রভাবে চেয়ে রইলুম। রান্না দেখা ছাড়া আর তো কোনও কাজ নেই।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে আমি চমকে ভয় পেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ছিলুম আর একটু হলে। মিংমা হি হি করে হেসে উঠল। আসলে আওয়াজটা মোটেই বিকট কিংবা অদ্ভুত নয়। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই প্রথমেই মনে হয়েছিল, দুপুরবেলা শোনা গুহার বাইরে সেই শব্দের কথা।

আগে লক্ষ্য করিনি, আশ্রমের সামনের চাতালের এক কোণে একটি গোরু শুয়ে আছে। দুপুরে বরং এখানে একটি কুকুর দেখেছিলুম, সেটা এখন নেই। বোধহয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিচে নেমে গেছে।

কিন্তু গোরুটা হঠাৎ ডেকে উঠল কেন? আমি টর্চ নিয়ে গেলুম গোরুটার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে গোরুর চোখে টর্চের আলো পড়লে ঠিক আগুনের ভাঁটার মত জ্বলজ্বল করে। মনে হয় কোনও হিংস্র প্রাণী।

গোরুটা আর একবার ডাকল, হা-ম-বা।

অমনি সাধুবাবা চেঁচিয়ে বললেন, বোম্ ভোলা মহাদেও শঙ্করজী।'

এবার সাধুবাবার ধ্যানভঙ্গ হল। মনে হল, গোরুটাই যেন সাধুবাবার ঘড়ির কাজ করে। সাধুবাবা যাতে ধ্যান করতে করতে সারারাত কাটিয়ে না

দেন কিংবা ঘুমিয়ে না পড়েন, সেইজন্য গোরুটা রোজ এই সময় ওঁর ধ্যান ভাঙিয়ে দেন।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে বললেন, সাধুজী, আমরা আপনার অতিথি হয়ে এসেছি। এখানে থাকব।'

সাধুবাবা বললেন, 'হাঁ হাঁ, থাকুন। আরামসে থাকুন! কোই বাত নেই।' এ-পাহাড় তো আমার নয়। পাহাড় সমুন্দর, জঙ্গল এ সবই ভগবানকা, যে কোনও মানুষ থাকতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি ঠিক বললেন না, সাধুবাবা। দিন কাল বদলে গেছে। ভগবানের আর অত বেশি সম্পত্তি এখন নেই। পৃথিবীর সব পাহাড় আর জঙ্গলই এখন কোনও না কোনও গভর্নমেন্টের! আমি যদি এই পাহাড়ে বাড়ি বানিয়ে থাকতে যাই, অমনি সরকারের লোক এসে আমাদের ধরবে। সমুদ্রের কিছুটা জায়গা এখনও খালি আছে বটে।'

সাধুবাবা বললেন, 'আমি তো এখানে আছি বহোত দিন।'

'আপনাদের কথা আলাদা। আপনি সাধুবাবা আমাদের সরকার এখনো সাধু-সন্ন্যাসীদের কিছু বলে না। আচ্ছা সাধুজী, আপনি যে, বলেছিলেন, রাত্রে এখানে শব্দ শুনতে পান, তা কিসের শব্দ? মানুষের চলাফেরার?'

'হাঁ, হাঁ।

'একজন মানুষ, না অনেক?'

'দো-তিন আদমি আসে মনে হয়।'

'আপনি কোনও গাড়ির শব্দ পান। তারা গাড়িতে আসে?'

'না, গাড়ির আওয়াজ পেয়েছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা, আপনি রাত্রে কি খাবেন? আমাদের হাতের রান্না আপনি খাবেন কি?'

সাধুজী জানালেন, না উনি রাত্রে শুধু এক বাটি দুধ ছাড়া আর কিছু খান না। উনি ঘুমোনও খুব তাড়াতাড়ি। ধুনির আগুনে মাঝে মাঝে কাঠ ফেলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে উনি একটু বাদেই চলে গেলেন আশ্রম গুহার মধ্যে।

মিংমা রান্না সেরে ফেলার পর আমরাও খেয়ে নিলুম!

কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। সাড়ে নটা বাজবার পর পাশের পাহাড়ের আড়াল থেকে একটু-একটু করে উঠতে দেখা গেল চাঁদের মুখ। আস্তে আস্তে গাঢ় অন্ধকারটা পাতলা হয়ে একটু আলো ফুটে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, 'চল, সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক। খাওয়ার পর একটু হাঁটাও হবে।'

খানিকক্ষণ হেঁটে আমরা প্রথম সারির গুহাগুলোর কাছে দাঁড়ালুম। টর্চ

নিবিয়ে দিতেই গাটা কেমন ছমছম করে উঠল। এরকম অদ্ভুত অনুভূতি আমার আর কোনও জায়গায় গিয়ে হয়নি। মনে হল, আমরা যেন পঞ্চাশ হাজার কিংবা এক লক্ষ বছর আগেকার সময়ে ফিরে গেছি। আদিম গুহাবাসী মানুষেরা এখানে থাকে। এক্ষুনি তাদের কারুকে দেখতে পাব! আবছা আলোয় একটু দূরের পাথরের চাঁইগুলোকে মনে হচ্ছে কালো কালো হাতির পাল।

আর থাকতে না পেরে আমি টর্চ জ্বেলে ফেললুম।

তারপরই দারুণ ভয় পেয়ে বলে উঠলুম, 'ও কি!'

টর্চের আলোটা সোজা যেখানে গিয়ে পড়েছে সেখানে একটা পাথরের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে একজন মানুষ।

কাকাবাবুও দেখতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, 'হু ইজ দেয়ার? উধার কৌন হ্যায়?'

লোকটি তাতেও নড়ল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, 'দো হাত উপর উঠাকে সামনে চলা আও। নেহি তো গোলি চালায় গা!'

লোকটি এবার আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ধুতি আর শার্ট পরা, গ্রাম্য লোকের মতন চেহারা। কিন্তু মুখে একটা হিংস্র ভাব! আমাদের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল, তারপর সামনে এগিয়ে আসার বদলে চট্ করে লুকিয়ে পড়ল একটা পাথরের আড়ালে।

সেইটুকু সময়ের মধ্যেই কাকাবাবু ওকে গুলি করতে পারতেন বটে, কিন্তু করলেন না।

চাপা গলায় আমায় বললেন, 'সন্তু, টর্চটা নিবিয়ে নিয়ে চট্ করে শুয়ে পড় মাটিতে।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা পাথরের টুকরো গিয়ে পড়ল আমাদের পেছনে। ওই পাথরটা মাথায় লাগলে আর দেখতে হত না।

তারপরই মিংমার গলার আওয়াজ পেলুম, 'আংকেল সাব পাকাড় গ্যায়া।'

মিংমা বুদ্ধি করে এরই মধ্যে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পেছন দিক দিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলেছে। আমি টর্চ জ্বেলে ছুটে গেলুম সেই পাথরটার কাছে।

মিংমা সেই লোকটার দুটো হাত পেছন দিকে মুচড়ে ধরে আছে।

ছোটখাট চেহারা হলেও মিংমার শরীরে দারুণ শক্তি। এ লোকটা ওর সঙ্গে জোরে পারবে কেন!

ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবুর এসে পৌঁছতে একটু দেরি হল। তিনি বললেন 'সন্তু এর মুখে ভাল করে আলো ফেলে দ্যাখ তো, এই লোকটাই দুপুরে তোদের ভয় দেখিয়েছিল কি না!'

আমি সঙ্গে-সঙ্গেই বললুম, 'না।'

মিংমা মাথা ঝাঁকাল। কারণ, এই লোকটা বেশ রোগা আর মুখখানা লম্বাটে। বয়েসও যথেষ্ট, প্রায় ষাটের কাছাকাছি। পরচুলা আর নকল দাড়ি লাগিয়েও ওর পক্ষে আদিম গুহাবাসীর ছদ্মবেশ ধরা সম্ভব নয়।

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে এ-লোকটা এখানে একা বসে আছে? সন্তু দ্যাখ তো ওর জামার পকেটে কি আছে? মিংমা, ভাল করে ধরে থাক ওকে।'

জামার পকেটে একটা বিড়ির কৌটো, দেশলাই আর কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। কাগজপত্র কিছু নেই। কিন্তু লোকটির কোমরের কাছে কি যেন একটা শক্ত, উঁচু জিনিস হাতে লাগল। জামাটা তুলে দেখলুম, একটা বেশ বড় ভোজালি ওর কোমরে গোঁজা।

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ। সঙ্গে এত বড় ছুরি, আবার পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে চেয়েছিল, তা হলে তো ইনি সাধারণ কোনও লোক নন। এই, তুম্ কৌন হ্যায়?'

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে কটমট্ করে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

'তুই কাঁহে পাথ্থর ফেকা? হামলোগ তুম্হারা দুশমন হ্যায়?' লোকটা তবুও চুপ।

'ইত্না রাতমে কাঁহে ইধার বৈঠা থা? তুম্হারা মতলব কেয়া হ্যায় ঠিক বাত্ বাতাও!

লোকটা তবু কোনও সাড়া-শব্দ করে না।

কাকাবাবু এবার মিংমাকে বললেন, 'আর একটু জোরে চাপ দাও তো! দেখি ও কথা বলে কিনা!'

মিংমা লোকটার হাত দুটো বেশি করে মুচড়ে দিতে লাগল। একটু একটু করে লোকটার মুখে ফুটে উঠল ব্যথার চিহ্ন। তারপর একসময় সে চিৎকার করে উঠল, অ্যাঁ, অ্যাঁ—।

ঠিক বোবা মানুষের মতন আওয়াজ!

টর্চের আলোয় দেখা গেল, লোকটার মুখের মধ্যে জিব নেই। জিব ছাড়া আর কোনও মানুষের মুখ তো আমি আগে দেখিনি। মুখের ভেতরটা অদ্ভুত গোল, দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে।

আমি উত্তেজিতভাবে বললুম 'কাকাবাবু!'

কাকাবাবু বললেন, তুই বুঝতে পেরেছিস, সন্তু? এ লোকটা নিশ্চয়ই মনোমোহন ঝাঁর সেই চাকর, যার জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে।'

আমি বললুম, 'ওকে জিব কাটা অবস্থায় এই পাহাড়ের কাছেই পাওয়া গিয়েছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'ওখানকার পুলিশের কাছে সেই খবর শুনে আমার আরও সন্দেহ হয়েছিল, এই পাহাড়টা ঘিরে সব রহস্য আছে।'

এই লোকটা কথা বলতে পারবে না। আর লিখতে-পড়তেও জানে না...।'

কিন্তু জায়গা চেনার ক্ষমতা ওর আছে। খুঁজে-খুঁজে এখানে আবার এসেছে নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবার জন্য।'

কাকাবাবু মিংমাকে বললেন, 'লোকটিকে ছেড়ে দিতে। তারপর ওকে বললেন, 'শুনো, হামলোগ তুমহারা মনিব মনোমোহন ঝাঁ-জীকা দুশমন নেহি! হামলোগ তুমহারা ভি দোস্ত্ হ্যায়। খুনিকো হামলোগ পাকাড়নে চাহ্তা হ্যায়।'

লোকটি কাকাবাবুর কথা কতটা বুঝতে পারল কে জানে। তবে মনোমোহন ঝাঁর নামটা শুনে একটু বোধহয় ভাবান্তর দেখা গেল।

কাকাবাবু আবার হিন্দিতে বললেন,'তুমি আমাদের সঙ্গে এস। আমরা এখানে থাকছি, তুমিও সঙ্গে থাকবে।'

লোকটিকে আমাদের সঙ্গে আসবার ইঙ্গিত করে কাকাবাবু চলতে শুরু করলেন। লোকটা কয়েক পা এল পেছন-পেছন। তারপরই হঠাৎ দৌড় লাগাল।

মিংমা আর আমি দু'জনেই দৌড়লাম ওকে ধরবার জন্য। কিন্তু লোকটা যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে আমরা ফিরে এলুম কাকাবাবুর কাছে। দিনের বেলায়ই কেউ এখানে লুকোতে চাইলে তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল, আর রাত্তিরবেলা তো অসম্ভব।

কাকাবাবু আফশোস করে বললেন, 'রাগে-দুঃখে লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে আমাদের কথা শুনল না কেন। ও একা একা কি করে প্রতিশোধ. নেবে? শত্রুপক্ষ যে অতি ভয়ংকর, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। চল্ আমরা এবার শুয়ে পড়ি।

আমরা আবার ফিরে এলুম আশ্রমের কাছে। শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম ওই জিবকাটা মানুষটির কথা!' ইস্, মানুষ এত নিষ্ঠুরও

হয় যে, অন্য একজন মানুষের জিব কেটে দিতে পারে! ওরা তো আরও তিনজন নিরীহ ঐতিহাসিককে খুন করেছে! মনোমোহন ঝাঁর এই সঙ্গীটিকে তো ওরা খুন করতে পারত, তার বদলে শুধু জিব কেটে দিল কেন? আরও বেশি অত্যাচার করার জন্য।

সহজে ঘুম আসতে চায় না। চিৎ হয়ে শুলেই ওপরে দেখা যায় আকাশ। এখন কয়েকটা তারাও ফুটেছে! বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে। দু'একটা শুকনো পাতা উড়ে যাবার খরখর শব্দ শুনতে পাচ্ছি এক-একবার। তারপর দূরে এক জায়গায় যেন একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ পেলাম। কাকাবাবু বললেন, ও কিছু না।

তারপর কখন যেন চোখ বুজে এসেছিল। আর একবার একটা শব্দ পেয়ে আবার জেগে উঠলুম।

কাকাবাবু ধুনির আগুনে কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কাকাবাবুর হাতে একটা কাপ। এর মধ্যে কখন যেন নিজের জন্য কফি বানিয়ে নিয়েছেন। রাত এখন ক'টা বাজে কে জানে। পাশের খাটে মিংমা ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

এক সময়ে চোখে আলো পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। ওমা, সকাল হয়ে গেছে দেখছি। তাহলে সারারাত কিছুই ঘটেনি?

কাকাবাবু আর মিংমা সাধুবাবার সঙ্গে চা খেতে-খেতে গল্প করছেন। তাহলে আমাদের তৈরি চা খেতে আপত্তি নেই সাধুবাবার। তড়াক করে নেমে পড়লুম খাট থেকে।

কাকাবাবু বললেন, 'বিছানা' তুলে খাটটা ফোল্ড করে ফ্যাল, সন্তু। খাটগুলো সব আশ্রমের পেছন দিকে লুকিয়ে রাখতে হবে। দিনের বেলা এখানে কিছু কিছু লোক আসতে পারে। আমরা যে এখানে থাকি, তা তাদের জানানর দরকার নেই।'

এখানে জলের বেশ সমস্যা আছে। আমরা দুটো বড় ফ্লাক্স ভর্তি জল এনেছিলাম, সে তো মুখহাত ধুতেই ফুরিয়ে যাবে। সারাদিন আমাদের অনেক জলের দরকার হবে।

সাধুবাবা জানালেন যে পাহাড়ের নিচে নেমে খানিকটা দক্ষিণে গেলে যে গ্রামটা আছে, সেখানকার কুয়ো থেকে জল আনা যায়! অথবা, পাকা রাস্তা ধরে নেবে গেলে মাইল দু'এক দূরে যে লেভেল ক্রশিং আছে একটা, সেখানকার গুমটি-ঘরের পাশে টিউবওয়েল আছে। আমরা জলের ব্যবস্থার কথা আগে চিন্তা করিনি। ঠিক হল যে, আমি আর মিংমা নিচে জলের সন্ধানে। সাধুবাবার শিষ্যরা তাঁর জন্য দু'তিন দিন চলার মতন জল একেবারে এনে দেয়।

আমরা পাউরুটি আর জেলি খেয়ে নিলুম। তারপর কাকাবাবুকে রেখে মিংমা আর আমি বেরিয়ে পড়লুম জলের জন্য।

কাল রাত্তিরবেলা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পাহাড়টাকে কী রকম ভয়ের জায়গা বলে মনে হচ্ছিল। এখন দিনের আলোয় সব কিছুই সুন্দর। সেই জিব-কাটা লোকটা কি এখনও লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের মধ্যে? তাহলে সে খাবে কি? আর সেই লোকটা যে গুহামানব সেজে আমাদের ভয় দেখিয়েছিল?

দিনের আলোয় ভয় থাকে না, তবে আমরা এগোতে লাগলুম সাবধানে গুহাগুলো সবই পাহাড়ের এক দিকে, অন্য দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের উপত্যকায়! আমরা হাঁটতে লাগলুম সেই ফাঁকা দিকটা ঘেঁষে।

কিছুক্ষণ নামবার পর একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। মিংমাকে নিয়ে আমি লুকোলুম একটা গাছের আড়ালে। গাড়িটা এই পাহাড়ের ওপরেই আসছে!

গাড়িটা হুঁশ করে আমাদের পেরিয়ে যাবার পর আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আরেঃ! এই থাম, থাম!'

চ্যাঁচামেচি শুনে গাড়িটা একটু দুরে দাঁড়িয়ে আবার ব্যাক করে এল। গাড়ীতে ধীরেনদা আর রত্নেশদা। ওঁরা বোধহয় আর থাকতে পারেননি, ভোর রাতেই বেরিয়ে পড়েছেন আমাদের খোঁজ নিতে!

ধীরেনদা বলতেন, 'কি, তোমরা সব ঠিকঠাক আছো তো?'

আমরা গাড়িতে উঠে পড়ে বললুম, 'গাড়ি ঘোরান, আমাদের জল আনতে যেতে হবে। আপনারা এসে পড়েছেন, বেশ ভালোই হল, হাঁটতে হবে না।'

ধীরেনদা বললেন, 'তাই তো এখানে যে জল নেই, সেটা আমারও খেয়াল হয়নি।'

'যখন এক সময় মানুষ থাকত, তখন তারা জল পেত কোথায়?'

ধীরেনদা বললেন, 'তখনকার লোকদের তো কোনও কাজ ছিল না, তারা পাহাড়ের তলা থেকে রোজ জল নিতে আসত। কিংবা তখন হয়তো কোনও ঝরণা ছিল এই পাহাড়ে। এখন শুকিয়ে গেছে। এক লক্ষ বছর আগে কি ছিল, তাতো বলা যায় না।

আমরা ফ্লাস্ক দুটো এনেছিলাম, কিন্তু ওইটুকু জলে তো চলবে না। তাই ধীরেনদা আমাদের নিয়ে গেলেন কাছাকাছি একটা ছোট শহরে। জায়গাটার নাম ওবায়দুল্লাগঞ্জ। সেখান থেকে কেনা হল বড় বড় তিনটে কলসি। এক দোকান থেকে বেশ গরম গরম জিলিপি আর কচুরি খেয়ে নিলাম পেট ভরে। কাকাবাবুর জন্যও নিয়ে যাওয়া হল কিছু।

ফেরার পথে কলসির জল ছলাৎ ছলাৎ করে পড়তে লাগল গাড়িতে। আমি আর মিংমা ধরে বসে আছি।

রত্নেশদা বলল, 'কাল সকালেও তো আবার জল আনতে যেতে হবে। আবার আসতে হবে আমাদের।'

ধীরেনদা বললেন, 'ভাবছি, একজন ড্রাইভারসুদ্ধু একটা গাড়ি জোগাড় করে আজ বিকালে এখানে পাঠিয়ে দেব। যে কদিন দরকার, সে ওখানে থাকবে।'

আমি বললাম, 'না, না, গাড়ির দরকার নেই। যেমনভাবে আগেকার গুহাবাসীরা নিচ থেকে জল আনত, সেইরকমভাবে কাল থেকে আমি আর মিংমা জল বয়ে আনব।'

পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে আশ্রমের সামনে কাকাবাবুকে দেখতে পেলুম না! সাধুবাবাও নেই।

গুহাগুলোর দিকে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই অবশ্য কাকাবাবুকে পাওয়া গেল। যে বড় গুহাটার নাম অডিটোরিয়াম অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহ, সেটার সামনে একটা বড় পাথরের ওপরে বসে কাকাবাবু একটা কাগজে সেটার ছবি আঁকছেন।

ধীরেনদাদের দেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, তোমরা কেমন আছ? রাত্তিরে কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো?'

ধীরেনদা হেসে ফেলে বললেন, 'না, কিছু হয়নি। আপনারাও তো ভালই আছেন দেখছি!'

কিছুক্ষণ গল্প করার পর ধীরেনদা চলে গেলেন? তার একটু পরেই আবার শুনতে পেলুম একটি গাড়ির আওয়াজ।

।। সাত ।।

দ্বিতীয়বার গাড়ির আওয়াজ শুনে কাকাবাবু বললেন, 'হয়তো কোনও ভিজিটর আসছে। আমি এখানে বসে ছবি আঁকব, তোরা দু'জনে দুদিকে দাঁড়িয়ে থাক। বাইরের লোকদের সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই!'

মিংমা চলে গেল আশ্রমের দিকে। আমি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে চলে এলুম রাস্তার একটা গুহার কাছে। এ দিকের কয়েকটা গুহা আমাদের দেখা হয়নি।

এখানে রয়েছে একটা দোতালা গুহা। একটা ছোট গুহায় অনেক ওপরে আর একটা। প্রকৃতিই নিজের খেয়ালে এ-রকম বানিয়েছে। ওপরের গুহাটায়

ওঠা খুব সহজ নয়, পাশের একটা বড় পাথর বেছে বেছে উঠতে হয়। খানিকটা ওপরে ওঠার পর পরিষ্কার দেখতে পেলুম রাস্তাটা!

একটা কালো গাড়ি এসে বড় নিমগাছটার তলায় থামল। তারপর গাড়ি থেকে যিনি নামলেন, তাঁকে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি কোনও ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সাহেব। বেশ লম্বা, ধপধপে ফরসা রং মাথার চুল একদম সাদা। বেশ রাশভারি চেহারা।

লোকটা গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাল।

এরপর নামল আরও দু'জন গাঁট্টাগোট্টা গুণ্ডার মতন চেহারার লোক। একজনের হাতে লম্বা একটা বাক্স। বেশ সন্দেহজনক চরিত্র। এদের ইতিহাসে কোনও আগ্রহ আছে কিংবা গুহার মধ্যে আঁকা ছবি দেখবার জন্য এতদূর আসবে তা ঠিক মনে হয় না। তাছাড়া এরা এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন এই জায়গাটা ওদের বেশ চেনা।

গাড়ি থেকে নেমেই ওরা কাকে যেন খুঁজছে মনে হল। চারিদিকটা দেখবার পর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কিছু বলে ওরা এগোল আশ্রমের দিকে।

আমার মনে হল, কাকাবাবুকে বোধহয় সাবধান করে দেওয়া উচিত! নামবার জন্য পা বাড়াতেই আর একটু হলে আমি খতম হয়ে যেতাম।

একটা আলগা পাথরে পা দিতেই সেটা গড়াতে গড়াতে দারুণ শব্দ করে পড়ল নিচে। আমি কোনও রকমে ঝুঁকে একটা পাথরের দেওয়াল ধরে সামলে নিলুম।

পাথরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে লোক তিনটে থেমে গেল, 'দু'জন ছুটে এল এদিকে। আমার তখন তাড়াতাড়ি নামবার উপায় নেই, এক যদি ওপরের গুহাটার মধ্যে লুকানো যায়। কিন্তু একটা পাথর সরে যাওয়ায় অনেকখানি উঁচুতে পা দিতে হবে। আমি ওপরে ওঠবার আগেই ওরা এসে পৌঁছে গেল। আমি আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। ফরসা লম্বা লোকটি এসে পড়ে আমাকে ভাল করে দেখল। তারপর আমাকে দারুণ অবাক করে দিয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, 'এ খোঁকা, তোমার চাচাজি কোথায় আছে?'

এই লোকটা আমায় চেনে? কাকাবাবুর কথা জানে? কিংবা শত্রু পক্ষের লোক, খবর পেয়ে আমাদের ধরতে এসেছে!

আমি কোনও উত্তর দিলুম না বলে লোকটি এবার হুকুমের সুরে বলল, 'নিচে উতারকে এস।'

পালাবার উপায় নেই, নামতেই হবে। আমি বসে পড়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিচে নামতে লাগলুম। ওদের একজন লোক একটু উঠে এসে আমার কোমর ধরে মাটিতে নামাল।

ফরসা-লম্বা লোকটির চোখের মণি নীল রঙের। যথেষ্ট বয়েস হলেও বোঝা যায় গায়ে বেশ শক্তি আছে। আবার গম্ভীর গলায় বলল, 'কোথায় তোমার চাচাজি? চল।'

আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে বললুম, 'কা-কা-বা-বু! আপনাকে খুঁজতে এ-সেছে।'

ফরসা-লম্বা লোকটি এবার হেসে বলল, 'হুঁ! ছোকরা বিলকুল তৈয়ার! তার মানে তোমার কাকাবাবু কাছাকাছি আছে। চল চল।'

ওর গুণ্ডামতন একজন সঙ্গী আমার হাত ধরল। আমি হাঁটতে লাগলুম অডিটোরিয়াম গুহার দিকে। কাকাবাবুকে সাবধান করে দিয়েছি, যা ব্যবস্থা করার উনিই করবেন!

যা ভেবেছি ঠিক তাই। একটু আগে তিনি যেখানে বসে ছবি আঁকছিলেন এখন সেখানে নেই। নিশ্চয়ই আমার চিৎকার শুনতে পেয়ে লুকিয়েছেন।

ফরসা-লম্বা লোকটি গুহার মধ্যে একবার উঁকি মেরে দেখে বলল, 'এখানে ছিল? নেই তো, কাঁহা গেল?'

তারপর আমাকে আরও সাংঘাতিক অবাক করে দিয়ে সেই লোকটি চেঁচিয়ে ডাকল, 'রাজা! রাজা! এদিকে এস!'

কাকাবাবুর ডাকনাম রাজা। একমাত্র আমার বাবা ছাড়া আর কারুকে ওই নাম ধরে ডাকতে শুনিনি। লোকটি সেই নাম জানল কি করে?'

এবার একটা গুহার আড়াল থেকে রিভলভার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। রিভলভারটা পকেটে ভরতে-ভরতে হেসে বললেন, 'চিরঞ্জীবদাদা!

বুঝতে বাকি রইল না যে ইনিই ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা।

ডক্টর শাকসেনা এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর খানিকটা স্নেহের সুরে বকুনি দিয়ে বললেন, 'রাজা তুমি কি পাগল বনে গেছ? এই খোঁকাকে সাথ্ সাথ্ নিয়ে তুমি এখানে রাত কাটাচ্ছ? কত রকম বিপদ হতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, আপনি ভবানীকে দিয়ে অতগুলো মিথ্যে কথা বললেন, ভাবীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওঁর তো মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই।'

'তুমি বুঝতে পারলে? তাজ্জব কথা!'

'হ্যাঁ, ভাবীর সঙ্গে একটুখানি কথা বলেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, উনি জানেন, আপনি কোথায় আছেন। তার মানে, আপনি নিরুদ্দেশ হননি, ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছেন।'

একটা গুহার আড়াল থেকে রিভলবার হাতে নিয়ে
বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু

'তোমাকে ফাঁকি দেবার উপায় কি আছে। বীণার বোঝা উচিত ছিল, তোমাকে সত্যি কথা বলতেই পারত।

'আপনি বলে গিয়েছিলেন, যেন কেউ জানতে না পারে।'

'কী করি. বল। বিদেশ থেকে ফিরতে না ফিরতেই শুনলাম যে অর্জুন, সুন্দরলাল আর মনোমোহন মার্ডার হয়ে গিয়েছে, অমনি সমঝে নিলাম মাই লাইফ অল্সো ইজ ইন ডেনজার।'

'তখন আপনি আগনার ভাইপো বিজয়কে নিয়ে পাঁচমারি গিয়ে লুকোলেন।'

'পাঁচমারি খুব লোনলি জায়গা। ভাবলাল কী, এখানে কেউ খোঁজ পাবে না, আমারও বিশ্রাম হবে। কিন্তু ওরা ঠিক হাজির হল।

'চিরঞ্জীবদাদা, ওরা মানে কারা? সেটা বুঝেছেন?'

'না। এখনও জানি না। বাট্ দে আর আ ডেঞ্জারাস লট্। পাঁচমারিতেও হঠাৎ আমার সামনে একটা লোক এসে গোলি চালিয়ে দিল। খতমই হয়ে যেতাম, বুঝলে রাজা, ঝটাকসে সে এসে পড়ল মাঝখানে। আমার বদলে সে-ই জীবন দিতে যাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ শুনেছি, সে আপনাকে খুব ভক্তি করে। যাক, সে বেঁচে গেছে শুনেছি।'

'আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে জিম্বা করে দিয়েছি।'

পাশের লোক দুটিকে দেখিয়ে ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'এঁরা দু'জন পুলিশ অফিসার। তারপর থেকে এঁদের প্রটেকসান নিতে বাধ্য হয়েছি! ঠিক আছে, আপলোগ গাড়িমে যাকে আরাম কিজিয়ে।'

পুলিশ দু'জন চলে যাবার পর ডক্টর শাকসেনা আর কাকাবাবু পাশাপাশি বসলেন এসে। কাকাবাবু মিংমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ডক্টর শাকসেনার। আমরাও দু'জনে বসলুম সামনের একটা গুহার মুখে বেদীর মতন জায়গায়!

চিরঞ্জীব শাকসেনা পকেট থেকে লম্বা একটা চুরুট বার করে ধরালেন। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এবার বল তো রাজা ভীমবেঠকায় রাত-পাহারা দেবার মতন বেপট্ ভাবনা তোমার মাথায় এল কি করে?'

কাকাবাবু বললেন, 'তাতে আমি ভুল করিনি নিশ্চয়ই। ভীমবেঠ্কা সম্পর্কে আপনারা নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি?'

'নতুন আর কি হবে?'

'নির্ঘাত নতুন কিছু পেয়েছেন?'

'শোন, আয়ডিয়াটি প্রথমে আসে মনোমোহনের মাথায়। সে একদিন

বলল কী, এখানে যে এত গুহার মধ্যে ছবি আছে, তার সব ছবি সির্ফ ছবি নয়। সেগুলো ভাষা। তার মানে চিত্রভাষা। মিশরে পিরামিডের মধ্যে যেমন হিয়েরোগ্লিফিকস্, অর্থাৎ ছবির মধ্যে ভাষা আছে, সেই রকম!'

'আমিও সেইরকমই আন্দাজ করেছিলুম দাদা।'

'তুমি তো জান রাজা, ওই মনোমোহন ছিল, অ্যামেচার হিস্টোরিয়ান। তার কথা প্রথমে আমরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। আহা বেচারা বড় ভাল মানুষ ছিল। হার্ট অব গোল্ড যাকে বলে। কে ওকে মারল?

'সেটাই তো কথা, ওঁকে মারল কে?'

'জরুর কোনও ম্যানিয়াকের কাজ। নইলে কি এমন বীভৎসভাবে গলা কাটে?'

'কোনও ম্যানিয়াক বেছে বেছে শুধু ইতিহাসের পণ্ডিতদের খুন করবে কেন? যাই হোক, সে কথা পরে ভাবা যাবে। আপনি বলুন, মনোমোহন এই গুহার চিত্রলিপি সম্পর্কে কি জেনেছিলেন?'

'শুনলে ওয়াইলড্ আইডিয়া বলে মনে হবে। সে বলল, 'কিছু কিছু ছবির মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে। সেই ছবি দিয়ে যেন কিছু বলা হচ্ছে। মনোমোহন সেই ভাষাটা পড়বার জন্য খুব মেতে উঠল আর আমরা হাসলুম।'

'মনোমোহন কিছু প্রমাণ করতে পেরেছিলেন?

'হ্যাঁ। বড় তাজ্জবের কথা। এক গুহার ছবি দেখে মনোমোহন বলল, এতে লেখা আছে, 'মহান বীর ভোমা তাঁর নিজের বাস গুহাতেই শুয়ে রইলেন।'

'এর তো একটাই মানে হয়?'

'ঠিক বলেছ। আমরা আধা বিশ্বাস আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখলাম কি, যে গুহাতে এই ছবি আছে, সে গুহার জমিন খুব প্লেন, আর সেখানে পাথরের সঙ্গে মিশে আছে মাটি। জায়গাটা খোঁড়া হল। সেখানে পাওয়া গেল এক কঙ্কাল। বহুত পুরনো—

'কোন পিরিয়ড?'

'চালকোলিথিক হবে মনে হয়। আমরা তো অ্যাস্টাউণ্ডেড। সেই কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গেল কয়েকটা দামি জহরত। টারকোয়াজ! তার দাম তুমি জান। এখন মনোমোহন তো আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য ওই গুহার মধ্যে একটা কঙ্কাল আর দামি জহরত পুঁতে রাখেনি।'

'এটা কতদিন আগের কথা?'

'পাঁচ মাস।'

'এ আবিষ্কারের কথা তো কোনও কাগজে বেরোয়নি দাদা?'

'ইচ্ছা করেই গোপন রেখেছি। ঠিক প্রমাণ দাখিল না করলে সবার কাছে লাফিং হয়ে যাব না? চিত্রভাষার অ্যালফাবেট তো বুঝতে হবে? সে কঙ্কাল আর জহরত জমা রেখেছিলাম এখানকার মিউজিয়ামে।'

'অর্থাৎ সুন্দরলাল বাজপেয়ীর কাছে। সে-ও জেনেছিল।'

'সুন্দরলালেরই তো বেশি উৎসাহ হল। মনোমোহনকে নিয়ে সেও এখানে আসতে লাগল ঘন ঘন। কিন্তু মুশকিল বাধল ওই যে ছবির প্যার্টান, তা কিন্তু সব গুহাতে নেই। অধিক সংখ্যক গুহাতেই সাধারণ ছবি, বিচ্ছিন্ন ছবি। আদিম মানুষদের মধ্যে দু'একজন থাকত শিল্পী স্বভাবের তারা ইচ্ছামত এঁকেছে। সেখানে চিত্রভাষা নেই। এর মধ্যে অর্জুন শ্রীবাস্তব আবার প্রমাণ করে দিলে যে, এতগুলো রক শেলটারের মধ্যে পাঁচ জায়গার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। ভিন্ন জাতের। সেই ছবি খুব পুরানো দেখতে লাগলেও আসলে নতুন—এক দেড় হাজারের বেশি বয়স না!'

'তার থেকে আবার নতুন কিছু পাওয়া গেল?'

মনোমোহন বলল, 'এই যে পাঁচটা রক শেলটারের ছবি, ওর মধ্যেও চিত্রভাষা আছে। তখন তো পুরোদমে লিপি চলেছে, তবু কেউ ইচ্ছা করে ছবির মধ্যে সাঙ্কেতিক কিছু লিখে রেখে গেছে।'

'ওখানে তো ব্রাহ্মী লিপিও আছে, আপনিও তা পড়ে ফেলেছেন?

'তার মধ্যে এমন কিছু নেই। শুধু কয়েকটা নাম। কিন্তু আমাদের মনোমোহন আবার একটা চিত্রভাষা পাঠ করে ফেলল। আমার বিদেশ যাবার ঠিক চার-পাঁচ দিন আগে।'

'কি সেটা?'

'বুঝলে, রাজা আমার তো ধারণা সেটা গল্প। কেউ চিত্রভাষায় একটা গল্প লিখে গেছে। যদি অবশ্য ওই ভাষা সত্যি হয়।'

তবু বলুন দাদা, কি লেখা আছে সেই গুহায়?'

সেটা পড়ে মনে হয়, মধ্যযুগে কোনও এক রাজা তার রাজ্য হারিয়ে শত্রুর তাড়া খেয়ে এখানে কোন গুহায় লুকিয়েছিল। তারপর এখানেই তার মৃত্যু হয়। গুহার দেওয়ালে ছবিতে লেখা আছে যে, অক্ষম, বৃদ্ধ পরাজিত এক রাজা বড় অতৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে। তবু এখানেই রইল তার সব কিছু। চল্লিশ মানুষ দূরে রইল চল্লিশ। কোনও বংশধর একদিন পেলে নতুন রাজ্য পত্তন করবে।'

'চিরঞ্জীবদাদা, এ তো শুনে মনে হচ্ছে কোনও গুপ্তধনের সঙ্কেত।'

'আবার গাঁজাখুরি গল্পও হতে পারে। লোভী লোকদের জন্য কেউ

ভাঁওতা দিয়েছে। এর মধ্যে সঙ্কেত কোথায়? চল্লিশ মানুষ দূরে চল্লিশ, তার মানে কে বুঝবে বল?'

'একমাত্র আপনিই বুঝতে পারবেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্কেত ও হেঁয়ালি, এই আপনার থিসিস আছে, আমি জানি।'

'কিন্তু আমি মাথা ঘামাবার সময় পেলাম কোথায়! চলে তো গেলাম দেশের বাইরে!'

'দাদা এমনও তো হতে পারে যে, আপনি যখন বিদেশে ছিলেন তখন মনোমোহন বা সুন্দরলাল বা অর্জুন শ্রীবাস্তব এরা কেউ এই সঙ্কেতের অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছে। অর্থাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।'

'তা অসম্ভব কিছু নয়।'

'আপনার বাড়িতে যখন এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তখন আর কে উপস্থিত ছিল?'

'আর কে ছিল, কেউ না।'

'আপনারা পাঁচজন ছিলেন। বীণা ভাবীজি পাঁচ কাপ চা করে পাঠিয়েছেন।'

'পাঁচজন? অর্জুন, সুন্দরলাল, মনমোহন, আমি আর হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ তো, প্রেমকিশোর ছিল এক দুদিন।'

'এই প্রেমকিশোর গুপ্তধনের কথা শুনেছে।'

'তা শুনেছে।'

'তাহলে তো ওই প্রেমকিশোরের ওপরেই সন্দেহ পড়ে। সে কোথায়? তিনজন খুন হয়েছে, আপনাকেও মারার চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ আপনারা চারজন এই পৃথিবী থেকে সরে গেলে শুধু প্রেমকিশোরই ওই গুপ্তধনের কথা জানবে। এই সব ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই সে আছে।'

চিরঞ্জীব শাকসেনা হেসে বললেন, প্রেমকিশোর কে তা তুমি জান না? সে তো সুন্দরলালের ছেলে। সতোরো-আঠারো বছর মাত্র বয়েস, দিল্লিতে কলেজে পড়ে কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে এসেছিল।'

কাকাবাবু একটুখানি চুপ করে গেলেন! আমি ওঁদের কথাবার্তা গোগ্রাসে গিলছিলুম এতক্ষণ। আমারও মনে হয়েছিল পঞ্চ ব্যক্তিই এ-সব কিছুর জন্য দায়ী। কিন্তু প্রেমকিশোরের এত কম বয়েস। তা ছাড়া, সে তো আর তার বাবাকেও খুন করবে না!'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রেমকিশোর এখন কোথায় তা জানেন?'

ডক্টর শাকসেনা বললেন, দিল্লিতেই আছে নিশ্চয়ই। আমি তো ফিরে এসে আর কোনও খবর পাইনি।'

'এক্ষুনি তার খোঁজ নেওয়া দরকার। তারও তো কোনও বিপদ হতে পারে। এখন আমারও মনে পড়েছে বটে, সুন্দরলালের বাড়িতে তার ছেলেকে দেখেছিলুম, তখন সে খুবই ছোট। সুন্দরলাল খুবই ভালবাসত তার ছেলেকে।'

'তা ঠিক।'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, দাদা।'

তাই, চল, ফিরে যাওয়া যাক!'

'না, আমি ফিরে যাবার কথা বলিনি। যে গুহাটায় আপনারা ওই গুপ্তধনের সঙ্কেত লিপি পেয়েছেন, আমি সেই গুহাটা দেখতে চাই।'

'সেটা অনেক নিচে। খুবই দুর্গম জায়গায়, তুমি সেখানে যেতে পারবে না।'

'ঠিক পারব।'

'তুমি ক্রাচ্ বগলে নিয়ে অতখানি নামবে? তোমার খুবই কষ্ট হবে। তা ছাড়া, রাজা, তুমি এই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছ কেন? আমি পুলিশকে সব জানিয়েছি...'

'চিরঞ্জীবদাদা, কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। আর বিপদের মধ্যে না জড়ালে বিপদকে জয় করা যাবে কীভাবে?'

'রাজা, তুমি এখনও এইকথা বলতে পার! কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি এখন ক্লান্ত। আমি এখন বিশ্রাম নিতে চাই...তবু চল, তুমি যখন বলছ...'

।। আট ।।

সরু রাস্তা দিয়ে পাথরের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে নিচে নামা সত্যিই কষ্টকর। একটানা নিচে নামা নয়, মাঝে-মাঝে আবার ওপরেও উঠতে হয়। ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনাই একটু পরে হাঁপিয়ে গেলেন। অথচ কাকাবাবুর মুখে কোনও পরিশ্রমের চিহ্ন নেই। অন্য কেউ নিষেধ করলেও কাকাবাবু শুনছেন না, আবার নিজের কোনও রকম অসুবিধে হলেও কারুকে জানাবেন না।

যে বড় গুহাটার সামনে মিংমাকে একজন মেরেছিল, সেখানে পৌঁছে আমি বললুম, 'কাকাবাবু ঠিক এই জায়গায় সেই লোকটা—'

কাকাবাবু ডক্টর শাকসেনাকে ঘটনাটা শোনালেন।

উনি তো খুবই অবাক! আদিম গুহামানবের ছদ্মবেশ? এরকম উদ্ভট চিন্তা কার মাথায় আসতে পারে?

কপাল কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে উনি বললেন, 'আর বোধহয় যাওয়া উচিত নয় আমাদের। অন্তত পুলিশ দু'জনকেও সঙ্গে আনলে হত!

কাকাবাবু বললেন, 'এতখানি যখন নেমেছি, তখন সেই গুহাটা আমি একবার দেখে আসতে চাই।'

'শোন রাজা, এখানে যদি কয়েকজন খুনে-গুণ্ডা লুকিয়ে থাকে, আমাদের পক্ষে তা বোঝার উপায় নেই। যদি হঠাৎ তারা আক্রমণ করে ... আমি আর যেতে চাই না ... তুমি আমাকে ভীতু ভাবতে পার, কিন্তু আমার ওপর ওরা তাক করে আছে, পাঁচমারিতে একবার খুন করতে এসেছিল ...

'তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনি ওপরে উঠে যান, সন্তু আর মিংমা আপনাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। সেই গুহাটা এখান থেকে কোন্ দিকে হবে আমায় বলে দিন, আর কত নম্বর, আমি একাই সেখানে যাব।'

'তুমি দেখছি আচ্ছা পাগল। চল, এসেছি যখন সবাই যাই!'

আমরা পাহাড়ের অনেকখানি নিচের দিকে নেমে এসেছি। এখান থেকে ওঠবার সময় আমার আর মিংমার তেমন অসুবিধে হবে না হলেও কাকাবাবু আর শাকসেনার তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এর থেকে তো পাহাড়ের উল্টো দিকে ঘুরে এসে নিচ থেকে ওপরে ওঠা সোজা ছিল।

ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'এসে গেছি, ওই যে ডাহিন দিকে গাছের আড়ালে—'

সেদিকে কয়েক পা এগোতেই আমরা একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলুম। একজন মানুষ যেন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় উঁ উঁ করছে।

মিংমাই প্রথম দৌড়ে গেল সেদিকে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'সন্তু সাব্ ইধার আও।'

সেখানে গিয়ে আমি প্রায় আঁতকে উঠলুম। একটা পাথরের নিচে আধখানা চাপা পড়ে আছে একজন মানুষ। সেই গুহামানব। মাটিতে অনেকখানি রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। লোকটা ওখানে গেল কি করে? নিশ্চয়ই কেউ ওপর থেকে পাথরটা গড়িয়ে ফেলে ওকে চাপা দিয়েছে। কিংবা এমনি-এমনিও পড়তে পারে।

মিংমা আর আমি ঠেলে পাথরটা সরাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেটা দারুণ ভারী। এর মধ্যে কাকাবাবু আর শাকসেনাও পৌঁছে গিয়ে হাত লাগালেন। অনেক কষ্টে পাথরটাকে একটু নড়ান গেল, সেই অবস্থায় মিংমা লোকটির হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাইরে।

এবার ভাল করে দেখেও মনে হল লোকটি যেন সত্যিই একজন আদ্যিকালের গুহামানব।

চিরঞ্জীব শাকসেনা হাঁটুমুড়ে লোকটির পাশে বসে পড়ে প্রথমে নাকে হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'বেঁচে আছে! এখনও চিকিৎসা করলে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি এখানে এসে না পড়তুম কেউ দেখতে পেত না ওকে, এই অবস্থায় মরে যেত।'

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু লোকটা কে? ওর গোঁফ-দাঁড়ি মাথার চুল টেনে দেখুন তো? মনে হচ্ছে নকল।'

সত্যিই তাই। মিংমা ওর চুল ধরে টান দিতেই সবসুদ্ধ উঠে এল। দাড়িগোঁফেরও সেই অবস্থা।

চিরঞ্জীব শাকসেনা দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'তাজ্জব না তাজ্জব। এও কি বিশ্বাস করা যায়? এ যে ভিখু সিং!'

কাকাবাবু বললেন, 'ভিখু সিং? যে সব সময় আপনার সঙ্গে থাকত?'

'হ্যাঁ। ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। সে এখানে কি করছে?'

'বুঝতে পারছেন না, ও এসেছিল গুপ্তধনের সন্ধানে। নিশ্চয়ই আপনাদের আলোচনা লুকিয়ে-চুরিয়ে শুনেছে।'

মাটিতে বসে পড়ে চিরঞ্জীব শাকসেনা বললেন, 'হা ভগবান গুপ্তধনের এত লোভ? এত বিশ্বাসী নোকর ভিখু সিং। হ্যাঁ, ও আমাদের কথাবার্তা তো শুনতেই পারে। আমার সঙ্গে ও ভীমবেঠ্‌কাতেও এসেছে কতবার।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করা দরকার। ওর কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে! কিন্তু ওকে এতখানি ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে কি করে? বেশি নড়াচড়া করা উচিতও না!

ভিখু সিংয়ের এখনো জ্ঞান ফেরেনি' আধা-অজ্ঞান অবস্থায় মাঝে মাঝে আঃ আঃ শব্দ করছে। ওর একটা হাত পা প্রায় থেঁতলে গেছে মনে হয়। মাথাতেও চোট লেগেছে।

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, এক কাজ করা যাক। আপনার গাড়িটাকে যদি ঘুরিয়ে এই পাহাড়ের নিচে আনা যায়, তা হলে ওকে এখান থেকে সহজে নামিয়ে দেওয়া যাবে।

ঠিক হল মিংমা ওপরে গিয়ে শাকসেনার লোকদের খবর দেবে। মিংমা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে না বলে শাকসেনা একটা কাগজে লিখে দিলেন কয়েক লাইন, মিংমা সেটা নিয়ে চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবুও এ রকম সেজেছে কেন?

কাকাবাবু বললেন, 'ইতিহাসের পণ্ডিতের চাকর তো, শুনে শুনে ও নিজেও ইতিহাসের অনেক কিছু জেনে গেছে। অনেক বইতে ছবিটবিও দেখেছে নিশ্চয়ই। ভেবেছে গুহামানব সেজে থাকলে কেউ ওকে দেখলেই ভয়ে পালাবে।

শাকসেনা বললেন, 'ঠিক বলেছ, ব্যাটা তাই ভেবেছিল নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় ও এখানে কিছু খোঁড়াখুঁড়িও করেছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'এর মধ্যেই বেশ বড় গর্ত আমার চোখে পড়েছে। সেটা ওর একার পক্ষে খোঁড়া সম্ভব নয়। হয় ওর সঙ্গে আরও লোক ছিল, কিংবা যে বা যারা ওকে মেরেছে, তারাও গর্ত খুঁড়েছে।'

আমি বললাম, 'কাকাবাবু, বোধহয় ওরা গুপ্তধন পেয়ে গেছে, তাই ওকে ভাগ না দেবার জন্য ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল?'

কাকাবাবু বললেন, কথাটা কিন্তু সন্তু একেবারে মন্দ বলেনি, দাদা?

এখানে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু পাওয়া গেছে! নইলে শুধু গুপ্তধন পাওয়া যেতে পারে, এই উড়ো কথাতেই তিনজন মানুষ খুন হয়ে গেল? কিছু পাবার পরে লোভ বেড়েছে, এমনও হতে পারে। সন্তু, দ্যাখ তো এদিকে এ-রকম গর্ত ক'টা আছে?'

আমি খানিকটা ঘুরে বেশ বড় বড় পাঁচটা গর্ত দেখতে পেলুম। সব গুলোই এক-মানুষ, দু'মানুষ গভীর। একটা গর্তের মুখে বারুদের দাগ দেখে মন হল, সেটা ডিনামাইট দিয়ে ওড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে দু-একটা গর্ত বেশ নতুন' একটাকে তো মনে হয় কালকেই খোঁড়া হয়েছে।

ফিরে এসে সে-কথা জানাতে কাকাবাবু বললেন, দেখলেন তো!'

শাকসেনা বললেন, কিন্তু ওরা সঙ্কেতের অর্থ জানবে কেমন করে? তা তো জানতে পারে না। যদি মনোমোহন কারুকে না বলে।'

'মনোমোহন তাহলে জানত?'

'মনোমোহন আমাকে পীড়াপীড়ি করেছিল ওর একটা অর্থ উদ্ধার করে দিতে, আমি স্টাডি করার তত সময় পাইনি তো, তবু একটু আন্দাজ করেছিলুম! মনোমোহন বলল, 'তাহলে সেই অনুযায়ী এক্সকাভেশন করা হোক। আমি বললুম, যদি গুপ্তধনের বেওপার হয়, তবে আগে সরকারকে সব জানাতে হবে। গুপ্তধন সাধারণত সরকারের সম্পত্তি হয়, অন্য কেউ নিতে পারে না। সরকারকে জানিয়ে কাজ শুরু করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই বলেছিলাম, আমি বিদেশ থেকে ফিরে আসি তারপর দেখা যাবে।'

'নিশ্চয়ই মনোমোহন সেই কথা চেপে রাখতে পারেনি। অর্জুন শ্রীবাস্তব আর সুন্দরলালকেও বলেছিল কোনও এক সময়। সুন্দরলাল বলেছে তার ছেলেকে। আপনি বিদেশে ছিলেন, এই চারজনের কোনও একজনের কাছ থেকে শুনে ফেলেছে বাইরের কোনও লোক। তারপরই শুরু হয়েছে গণ্ডগোল। আপনাকে বলা হয়নি, এই পাহাড়ে আরও একজন ঘুরছিল কাল

রাত্রে, আমরা দেখেছি। সে হল মনোমোহনের চাকর, যার জিব কেটে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম ও এসেছিল প্রতিশোধের জন্য, কিন্তু এমনও হতে পারে, ও-ও এসেছে গুপ্তধনের লোভে।'

'বাপ রে বাপ। আর বোল না, আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। মানুষের এত লোভ। ভিখু সিং, আমার এত বিশ্বাসের লোক ছিল...সে বেওকুফটা পর্যন্ত এখানে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে...'

কাকাবাবু বললেন, চলুন দাদা, ততক্ষণ গুহাটার ভেতরে একটু দেখে আসি!

এই গুহাতেও একটু উঁচুতে, কয়েকটা পাথরের ওপর পা দিয়ে সিঁড়ির মত উঠতে হয়। কাকাবাবু কারুর সাহায্য না নিয়ে উঠে পড়লেন ওপরে।

গুহাটা চৌকো ধরনের, প্রায় একটা ঘরের মতন। খাট-বিছানা পেতে এখানে বেশ ভালভাবেই থাকা যায়! কোনও পলাতক রাজার পক্ষে এখানে আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে সব দেওয়ালগুলো দেখতে লাগলেন। কোনও দেওয়ালেই ছবি নেই। ছবি দেখতে পাওয়া গেল ছাদে। পাশাপাশি নানা ভঙ্গির অনেকগুলো মানুষ। অন্য গুহাগুলোরই মতন খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দমের চেহারার মানুষ। আমি সংখ্যা গুনতে লাগলুম।

চিরঞ্জীব শাকসেনা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ইস, ছি ছি ছি ছি ছি। কি অন্যায়! ভ্যান্‌ডাল্‌স! এদের ফাঁসি হওয়া উচিত।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

'ওই দ্যাখো! দেখছ, ভাঙা জায়গা? ছেনি কিংবা বাটালি দিয়ে কেউ ওখানে পাথর ভেঙে নিয়েছে।'

'ওখানে ছবি ছিল?'

'আলবাত।'

'কেউ ছবিগুলো কপি করে নিয়ে তারপর আসল ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছে। যাতে আর কেউ এখান থেকে কোনও সূত্র না পায়।'

'ছি ছি ছি, এরকম মূল্যবান ছবি! দেশের সম্পদ।'

আমি ততক্ষণে গুনে ফেলেছি। এখন ছবি আছে মোট সাতশটা মানুষের। তার পাশে পাথরের চলটা উঠে গেছে অনেকখানি।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে কি এখানে মোট চল্লিশ জন মানুষের ছবি ছিল?'

চিরঞ্জীব শাকসেনা বললেন, 'না। সেইটাই তো মজা। সাংকেতিক ভাষায় চল্লিশজন মানুষের উল্লেখ থাকলেও এখানে ছবি ছিল মোট একশো

পঁয়তিরিশটা। আমরা খুব শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেছি তার পাশে আরও ছবি মুছে যাওয়ার চিহ্ন ছিল।'

আচ্ছা দাদা, কতকগুলো এ-রকম মানুষের ছবি দেখে কি করে একটা ভাষা পড়া যায়?'

'ওটা ছিল মনোমোহনের ব্যাপার। তবে দেখছ তো, প্রত্যেকটা ছবির হাত-পায়ের ভঙ্গি আলাদা? ওই হাত-পায়ের ওঠানামার মধ্যেই একটা ভাষা থাকতে পারে। অনেকটা সিমাফোর-এর মতন। তুমি নিশ্চয়ই সিমাফোর কি তা জান, আমি এ বাচ্চাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'শুনো সন্তু বেটা, সিমাফোর হচ্ছে একটা কথা-না-বলা ভাষা। অনেকটা তোমার টেলিগ্রাফের টরেটক্কার মতন। তুমি এখানে পোস্ট অফিসে বসে টরেটক্কা কর, বহুত দূরে আর একজন সেই ভাষা বুঝে যাবে। এই টরেটক্কাকে বলে মর্স কোড। আর সিমাফোর তার আগের। মনে কর তুমি একটা দ্বীপে একটা বিপদে পড়ে আছ, দূর দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছে! তুমি চিৎকার করলেও তো সমুদ্রের আওয়াজের জন্য তোমার গলা কেউ শুনতে পাবে না। তখন যদি তুমি সিমাফোর কোড জান, তাহলে একটা পতাকা কিংবা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঠিক-ঠাক নাড়ালে জাহাজের ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরে যাবে। সামনের দিকে দু'বার নাড়ালে বুঝবে খাদ্য, আর মাথার ওপর দু'বার ঘোরালে বুঝবে হিংস্র প্রাণী এই রকমে, বুঝলে তো?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এই গুহাবাসীরা সিমাফোর জানত?'

'সিমাফোর ঠিক নয়, ওরা নিজস্ব অন্য একটা ভাষা তৈরী করে নিয়েছিল। মনোমোহন তার পাঠ উদ্ধার করেছে।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মূল ছবিগুলোর সব ছবি তোলা আছে আপনার কাছে?'

'আমার কাছে নেই, তবে মনোমোহনের কাছে অনেক রকম এই ছবি তোলা ছিল।'

'সবাই জানে, যে তিনজন খুন হয়েছে, তাদের কিছু চুরি যায়নি! কিন্তু মনোমোহনের ঘর থেকে ছবিগুলো উধাও হয়ে গেছে কি না খোঁজ নেয়নি?'

'ঠিক বলেছ! পুলিশের একথা মাথাতেই আসবে না।'

'চলুন। এখানে আর কিছু দেখবার নেই। বাইরে যাই।'

বাইরে গিয়ে দেখলুম, ভিখু সিং চোখ মেলেছে, কোনও রকমে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। চিরঞ্জীব শাকসেনাকে দেখে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, ওকে জিজ্ঞেস করুন, ওকে যে মেরেছে তাকে ও দেখতে পেয়েছিল কিনা?'

কিন্তু ভিখু সিং কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু কেঁদেই চলল।

চিরঞ্জীব শাকসেনা বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর। তোর ভয় নেই, তোকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা ঘটেছে নিশ্চয়ই কাল রাত্তিরে। ওপরে বসে পাহারা দিয়ে কোনও লাভ হল না। ওপরের গাড়ির রাস্তা দিয়ে না এসে যে কেউ পাহাড়ের নিচ দিয়ে এদিকে আসতে পারে।'

একটু পরেই তলা থেকে মিংমার গলা পেলাম, 'আংকল সাব! আংকল সাব।'

বুঝলাম, গাড়ি এসে গেছে এদিকে।

মিংমা আর পুলিশ দুজন ওপরে উঠে এল জঙ্গল ঠেলে। তারা তিনজনে ধরা ধরি করে ভিখু সিংকে নামিয়ে নিয়ে চলল।

চিরঞ্জীব শাকসেনা কাকাবাবুকে বললেন, রাজা, তুমিও চল আমার সঙ্গে। এখানে থেকে আর কি করবে।'

ভেবেছিলুম কাকাবাবু সে-কথা শুনবেন না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কাকাবাবু তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'হাঁ, চলুন। এখানে আর থেকে কি হবে। এখানে সত্যিই যদি গুপ্তধন থাকে, তবে তা উদ্ধার বা রক্ষা করবার দায়িত্ব সরকারের, আমাদের তো নয়।'

।। নয় ।।

আমাদের খাটিয়া আর সব জিনিসপত্তর পড়ে রইল পাহাড়ের ওপর, সাধুবাবার আশ্রমে। আমরা ফিরে এলুম ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনার গাড়িতে।

মিংমা আর আমি নেমে গেলুম অরোরা কলোনীর কাছে। কাকাবাবু যাবেন ভিখু সিংকে নিয়ে হাসপাতালে।

ছোড়দি তো আমাদের ফিরতে দেখে অবাক। এত তাড়াতাড়ি আমাদেব অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়ে যাওয়ায় আমিও বেশ একটু নিরাশ বোধ করছি। ভেবেছিলুম ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ে অন্তত দিন সাতেক থাকা হবে। জলের কলসি-টলসি কেনা হল কোনওই কাজে লাগল না। বেশ লাগছিল কিন্তু ওখানে থাকতে।

তাছাড়া খুনিরাও তো ধরা পড়ল না!

রত্নেশদা ধীরেনদা, নিপুদারা সবাই অফিসে। দীপু আর আলোও স্কুলে গেছে। দুপুরে কিছু করার নেই, আমি তাই খেয়েদেয়ে ঘুমোলুম।

মিংমা ঘুমোয় না, ও সারা দুপুর খেলা করল কুকুরটাকে নিয়ে।

কাকাবাবু ফিরলেন বিকেলে। উশকো-খুশকো চুল ক্লান্ত চেহারা। মনে হয় সারাদিন কিছুই খাননি। সঙ্গে একটা বিরাট ব্যাগ ভর্তি, অনেক রকম কাগজ আর বইপত্তর।

ছোড়দিকে বললেন, 'কিছু খাবার-টাবার তৈরি কর তো, আমি স্নানটা করে আসি।'

বিকেলের দিকে খবর পেয়ে ধীরেনদা ছুটে এলেন কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, কাকাবাবু খুনি ধরা পড়ল না?'

কাকাবাবু বললেন, 'খুনি ধরা তো আমার কাজ নয়। ভীমবেঠ্‌কার সঙ্গে যে ওই তিনটে খুনের সম্পর্ক আছে, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। পুলিশ খুনিদের খুঁজে বার করবে। খুনের মোটিভ ও কারণটা জানা গেলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।'

ধীরেনদা বললেন, 'যাঃ। আমরা খুব আশা করেছিলুম আপনিই ওদের শাস্তি দেবেন।

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'নাঃ এবারে আর তা হল না। এক হিসেবে ধরতে পার, এবারে আমার হার হল। ওই সব সাংঘাতিক খুনির সঙ্গে আমি পারব কেন। পুলিশই পারতে পারে।'

ধীরেনদা বললেন, 'এখানকার পুলিশ...আমার অত বিশ্বাস নেই।'

'কাল থেকে ভীমবেঠ্‌কার ওই গুহাগুলোও পুলিশ পাহারায় থাকবে, যাতে ওখানে আর খোঁড়াখুঁড়ি করতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।'

'কাল থেকে? যদি আজ রাত্তিরেই ওরা এসে কিছু ক'রে যায়?'

'সেটাও সরকারের দায়িত্ব। তবে...'

কাকাবাবু কথা বলতে-বলতে থেকে চুপ করে রইলেন। একটু ভেবে আবার বললেন, 'তবে এমন হতে পারে, কাল থেকে পুলিশ হয়তো পুরো ভীমবেঠ্‌কা পাহাড় ঘিরে রাখবে, কোনও লোককেই যেতে দেবে না, আমাদের জিনিষপত্রের কি হবে? সেগুলো আনব কি করে? বিশেষত আমার ট্রান্সমিশান সেট্‌টাও ওখানে পড়ে আছে।'

আপনাকে নিশ্চয়ই যেতে দেবে। তা কখনও হয়?'

'বলা তো যায় না। বরং এক কাজ করা যাক, এই তো সবে সন্ধ্যে হচ্ছে, এখনই গিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আসা যাক। ট্রান্সমিশান সেট্‌টা হারালে খুব মুশকিল হবে।'

'সেটা এমনি ফেলে এসেছেন?'

'সাধুবাবার কাছে জমা দিয়ে এসেছি। ধীরেন 'তোমার গাড়ির ড্রাইভার আছে না?'

'আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না, না, তার দরকার নেই। তোমাকে যেতে হবে না। ড্রাইভার থাকলেই হবে আমরা যাব আর আসব।'

'তা হয় না, কাকাবাবু, এই রাত্তিরে আপনাকে আমরা একলা যেতে দেব না। আমি যাবই আপনার সঙ্গে।'

'ধীরেন, তুমি জান না। ওই সন্তুকে জিজ্ঞেস কর, আমি একবার না বললে আর হ্যাঁ হয় না। আমি বলছি, তোমার যাবার দরকার নেই।'

'আপনি কেন একথা বলছেন, আমি জানি। আপনি ভাবছেন আমার যদি কোনও বিপদ হয় তাহলে আমার স্ত্রী আর ছেলেরা আপনাকে দোষ দেবে। যে ড্রাইভার বেচারা যাবে, তারও স্ত্রী আছে, দুটো বাচ্চা আছে। তার বিপদ হলেও সেই একই ব্যাপার। তাছাড়া আপনি না থাকলেও আমি মাঝে-মাঝে এ-রকম বিপজ্জনক ঝুঁকি নিই। চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই, বেরিয়ে পড়া যাক।'

তুমি যাবেই বলছ? বেশ! তুমি ফায়ার আর্মস চালাতে পার? তোমার আছে কিছু?'

'এককালে আমার শিকারের শখ ছিল। কিন্তু এখন তো বন্দুক পিস্তল কিছু নেই আমার। একটা বড় ছুরি আছে। ওঃ, হ্যাঁ, রত্নেশের তো রাইফেল আছে, সেটা নিতে পারি?'

'তাই নাও। একটা কিছু হাতিয়ার সঙ্গে রাখা ভাল।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কাকাবাবু কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন একটা ব্যাগ। ভীমবেঠ্‌কায় পৌঁছবার আগেই নেমে এল অন্ধকার। এখানকার রাস্তা অবশ্য অন্য অনেক পাহাড়ি রাস্তার মতন তেমন বিপজ্জনক নয়। হেডলাইট জ্বেলে ধীরেনদা সাবধানে চালাতে লাগলেন গাড়ি।

কালকের মতন আজও সাধুবাবা চোখ বুজে ধ্যানে বসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, 'এখন ওকে ডাকা ঠিক হবে না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।'

আশ্রমের পেছন দিকে আমাদের গোটান খাটগুলো পেয়ে গেলুম। কিন্তু স্টোভ আর অন্যান্য জিনিসপত্র কিছু নেই। সেগুলো হয়তো সাধুবাবা আশ্রমের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু সাধুবাবার অনুমতি না নিয়ে আশ্রমের মধ্যে ঢোকা উচিত নয়।

আমরা সকলে চলে যাওয়ার সময় সাধুবাবাকে একটা খবরও দিয়ে যেতে পারিনি। উনি কী ভেবেছেন, কে জানেন! নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম এদিক-ওদিক। আজ আর তেমন অন্ধকার নয় আকাশ বেশ পরিষ্কার।

ধীরেনদা চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন, 'সাধুজির ধ্যান কখন ভাঙবে? যদি সারারাত উনি ওইরকম বসে থাকেন?'

ধীরেনদা এই কথা বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কালকের মতন গোরুটা দুবার ডেকে উঠল, হাম্‌বা হাম্‌বা।

তারপরই সাধুবাবা বললেন, 'ব্যোম্‌ ভোলা, মহাদেও শঙ্করজী।'

আশ্চর্য! সত্যিই তো দেখা যাচ্ছে, এই গোরুটা একদম ঠিক ঘড়ির মতন।

কাকাবাবু বললেন, 'নমস্কার, সাধুজী।'

সাধুজী বললেন, 'রায়চৌধুরীবাবু, আপলোগ অচানক চলে গায়ে ম্যায় শোচ্‌তা হুঁ...'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা পাহাড়ের নিচে নেমে গিয়েছিলুম তাই আপনাকে আর খবর দিতে পারিনি। আমার জিনিসপত্র...'

সাধুবাবা জানালেন যে, সেগুলো আশ্রমের মধ্যে আছে। ভেতরে ঢুকে তিনি একে একে সবই এনে দিলেন।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সাধুজী, আমরা চলে যাবার পর আর কেউ এসেছিল? আপনার নজরে পড়েছে?'

উনি দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

জানেন, সাধুজী, এই পাহাড়ে গুপ্তধনের হদিস পাওয়া গেছে?'

সাধুবাবা হিন্দিতে বললেন যে, 'গুপ্তধন? তা বেশ তো! তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না। ওঁর তো কোনও জিনিসে প্রয়োজন নেই।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার সাধুজী। আবার পরে এলে দেখা হবে।'

মালপত্রগুলো সব নিয়ে আসা হল গাড়ির কাছে। ওপরের কেরিয়ারে বাঁধা হল খাটগুলো। আমরা গাড়িতে উঠে বসেছি, কাকাবাবু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। উনি যেন শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছেন পাহাড়টাকে।

কিন্তু অবস্থা অন্ধকারে কিছুই নেই অবশ্য। অন্ধকার গুহাগুলোর দিকে তাকিয়ে আজও আমার গা ছম্‌ ছম্‌ করছে।

কাকাবাবু বললেন, 'এত দূর এলুম যখন, একবার গুপ্তধনের খোঁজ করে যাব না?'

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকাবাবু, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, এখানে গুপ্তধন আছে?' আমি কিন্তু এখনও ঠিক...

'তোমাকে কেন আনতে চাইনি জান ধীরেন? গুপ্তধন পেলে তোমাকেও ভাগ দিতে হবে, সেইজন্য!'

আমি আর ধীরেনদা দুজনেই অবাক। কাকাবাবুর মুখে এ-রকম কথা আমি কখনও শুনিনি। উনি গুপ্তধনের জন্য লোভ করবেন, তা হতেই পারে না।

কাকাবাবু বললেন, 'মিংমা চল তো আমরা একবার নিচের সেই গুহাটা থেকে ঘুরে আসি। ধীরেন আর সন্তু এখানে অপেক্ষা করুক।'

ধীরেনদা বললেন, 'আপনি এই অন্ধকারের মধ্যে এতখানি নিচে নামবেন? এ যে অসম্ভব ব্যাপার।'

'অসম্ভব বলে আবার কিছু আছে নাকি? ছবির ভাষায় যে সঙ্কেত তা আমি বুঝতে পেরে গেছি। সেটা সত্যি কিনা আজই আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কাল থেকে পুলিশ পাহারা দেবে...তোমরা দুজনে এখানে অপেক্ষা কর বরং...'

ধীরেনদা কাকাবাবুকে থামাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কাকাবাবু যাবেনই গুপ্তধনের সন্ধানে। তাহলে ধীরেনদা আর আমারও এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

এবার আমার সত্যিকারের ভয় করতে লাগল। হোঁচট খেয়ে পড়া কিংবা নিচে গড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তো আছেই। তাছাড়া কে কোথায় লুকিয়ে আছে, ঠিক নেই। যে-কেউ পাথর ছুঁড়ে কিংবা গুলি করে আমাদের মেরে ফেলতে পারে।

ঠিক হল সবাই যাব, একসঙ্গে, পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে। আমার আর মিংমার হাতে টর্চ, সামনে রাইফেল হাতে ধীরেনদা, একদম পেছনে রিভলবার হাতে কাকাবাবু!

নামতে নামতে এক-একবার কোনও শব্দ শুনেই চমকে উঠছি আমরা। হয়তো আমাদেরই পায়ের শব্দ কিংবা পায়ের ধাক্কায় ছিটকে যাওয়া কোনও ঘুড়ি। মাথার উপর দিয়ে শান-শান করে উড়ে গেল একদল বাদুড়। এই অন্ধকারের মধ্যে ক্রাচে ভর দিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে নামা যে কত শক্ত, তা আমরা বুঝব কি করে! দু'পায়ে ভর দেওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই হড়কে যাচ্ছে আমাদের পা, কাকাবাবু কিন্তু একবারও পিছলে গেলেন না।

বেশি নিচে নামতে হল না। মাঝামাঝি এসে এক জায়গায় কাকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'দ্যাখ তো সন্তু, সামনের গুহাটার নম্বর কত?'

কোনও কোনও গুহার বাইরে আলকাতরা দিয়ে নম্বর লেখা আছে বটে। এখানে একটা গুহার বাইরে লেখা আছে 'আর এস্ ফিফ্‌টি টু।

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে দ্যাখ আর এস্ ফিফ্‌টি ফোরটা কাছাকাছি হবে।'

টর্চের আলো ঘোরাতেই এক জায়গায় দুটো আগুনের মতন চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

আমি চমকে উঠতেই ধীরেনদা বললেন, 'ওটা নিশ্চয়ই কোনও পাখি। হ্যাঁ এই তো প্যাঁচাটা এত আলো দেখেও নড়ে-চড়েনি। একদৃষ্টে চেয়েছিল আমাদের দিকে। আমি আর মিংমা হুস্-হাস করতে করতে অনিচ্ছার সঙ্গে উড়ে গেল। গুহাটার মধ্যে খুব ভাল করে দেখলুম যে, আর কিছু নেই। তারপর, ঢুকে পড়লুম সেটার মধ্যে।

এক দিকের দেওয়ালে দেখলুম, পর পর কয়েকটা মানুষের ছবি, আর দুটো জন্তুর, খুব সম্ভবত মোষের।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু, ছবি আছে।

'ক'টা মানুষ?'

'তেরোটা।'

'অন্য দেওয়ালে দ্যাখ।'

'আরেকটি দেওয়ালে এক সার মানুষ রয়েছে। এখানে আছে পাঁচটা। পেছন দিকের দেওয়ালে নটা।

সে কথা কাকাবাবুকে জানাতে উনি বললেন ভাল করে ছাদটাও দেখতে।

'হ্যাঁ ছাদেও ছবি আছে অনেকগুলো। এখানেও তেরোটা।'

কাকাবাবু বললেন, 'তাহলে কত হল? চল্লিশ না? ঠিক আছে এবারে বেরিয়ে আয়।'

শরীরটা একবার কেঁপে উঠল আমার। চল্লিশ মানুষ! গুপ্তধনের সংকেতে চল্লিশজনের উল্লেখ আছে। তা হলে কি এখানেই আছে সেই গুপ্তধন?

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে টর্চের আলোয় দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মিলেছে। আমি দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এসেছি কোন গুহায় কত ছবি আছে তার লিস্ট আছে সেখানে। দুটো মোষের ছবিও দেখিসনি?'

'হ্যাঁ দেখেছি কাকাবাবু!'

'এবার দ্যাখ তো, পাশের গুহাটায় কি আছে?'

মাথার উপর দিয়ে শান-শান করে উড়ে গেল একদল বাদুর

সে-গুহাটায় ঢুকে দেখলুম, সেখানে আর কোনও ছবি নেই, শুধু দুটো মোষের ছবি।

কাকাবাবু নিজের ঝোলা-ব্যাগ থেকে একটা শাবল বার করে উত্তেজিত-ভাবে বললেন, 'আর একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। এই দুটো গুহার মাঝখানেই আছে সেই গুপ্তধন। চটপট গর্ত করে দেখতে হবে।'

প্রথমে ধীরেনদা চেষ্টা করলেন শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়বার। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কিছু মাটিমেশানো জায়গাও আছে। সেখানে ছাড়া অন্য জায়গায় শুধু শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়া প্রায় অসম্ভব। ধীরেনদা খানিকটা খুঁড়বার পর মিংমা ওঁর হাত থেকে শাবলটা নিয়ে জোরে জোরে গর্ত খুঁড়তে লাগল। বেশ কিছুটা গর্ত করার পর ঠং-ঠং শব্দ হতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

তিনি গর্তটার পাশে বসে পড়ে হাত ঢুকিয়ে দিলে। কিছুই নেই শুধু কঠিন পাথর।

কাকাবাবু দ্বিতীয়টাও পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'আর-একটা খুঁড়ে দ্যাখ, কিছু এখানে থাকতে বাধ্য।'

তৃতীয় গর্তটা অনেকখানি গভীর হল। এক সময় কাকাবাবু মিংমাকে বললেন, 'ব্যাস, আর না। সরে এস, আমি ভেতরটা খুঁজে দেখছি। সবাই টর্চ নিবিয়ে দাও তো, একবার কিসের যেন শব্দ পেলাম।'

বড়-বড় পাথরের ফাঁকে আকাশের আলো আসে না, টর্চ নেবাতেই আমরা ডুবে গেলাম ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে। সবাই কান খাড়া করে রইলাম।

দূরে যেন শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ হল। কেউ যেন হাঁটছে। তবে আওয়াজটা এত ক্ষীণ যে, মনে হয়, যে-ই হাঁটুক, সে আছে বেশ দূরে, কিংবা শেয়াল-টেয়ালের মতন ছোট কোনও প্রাণী!

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাকাবাবু ফিসফিসিয়ে বললেন, 'একটু টর্চ জ্বাল একবার। মনে হয় কী যেন পেয়েছি!'

কাকাবাবু দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'এই তো, সোনার মূর্তি। আমার ধারণা এরকম চল্লিশটা মূর্তি এখানে পোঁতা আছে। এর-এক-একটার দাম কত হবে বল তো, ধীরেন?'

ধীরেনদা এত অবাক হয়ে গেছেন যে, কথাই বলতে পারছেন না। সত্যিই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি আমরা। এই তো দেখা যাচ্ছে একটা কত বড় সোনার মূর্তি টর্চের আলোয় গা'টা ঝকঝক করছে।

কাকাবাবু বললেন, 'অন্তত লাখ দু'এক টাকা এক একটারই দাম হবে। যথেষ্ট হয়েছে, চল এবার। বেশি লোভ করা ভাল নয়। আমরা বেআইনি কাজ করছি। তা ছাড়া যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ হতে পারে।'

মিংমাকে তিনি বললেন, 'চটপট গর্তগুলো বুজিয়ে দিতে। তারপর আমরা ফেরার পথ ধরলুম। এত জোরে উঠতে লাগলুম যেন কেউ আমাদের তাড়া করে আসছে। গুপ্তধন নিয়ে পালাচ্ছি বলে ধক্‌ধক্‌ করছে বুকের মধ্যে।

বিনা বিপদেই আমরা পৌঁছে গেলুম ওপরের রাস্তার দিকটায়। এখানে আসবার পর ভয় কেটে গেল। অন্ধকার গুহাগুলোর আশেপাশে যে-কেউ আমাদের আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, আমাদের কাছে একটা রাইফেল আর রিভলবার আছে।

গাড়িটাতে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলুম খানিকক্ষণ। তারপর কাকাবাবুর কাছ থেকে মূর্তিটা নিয়ে সবাই দেখলুম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। মূর্তিটা বেশ ভারি। এতকাল মাটির তলায় ছিল, কিন্তু একটু ভাঙেনি, শুধু রংটা একটু কালো হয়ে গেছে। তবু বোঝা যায় জিনিসটা সোনার।

ধীরেনদা বললেন, 'এবার তা হলে কেটে পড়ি আমরা?'

কাকাবাবু বললেন, 'তোমাদের খিদে পায়নি? এত পরিশ্রম হল? আমার তো খিদেয় পেট জ্বলছে।'

ধীরেনদা বললেন, ''ওবারদুল্লাগঞ্জে হোটেল খোলা থাকতে পারে। চলুন সেখানে খেয়ে নেবেন।'

গাড়ির সামনে ঘাসের ওপর বসে পড়ে কাকাবাবু ক্রাচ দুটো এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'ভাবছি পথে কোনও বিপদ হবে কি না। পাহাড় থেকে নামবার পথে যদি কেউ আমাদের গাড়ি আটকায়? একটা পাথরের চাই গড়িয়ে দেয়? পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলের আড়াল থেকে কেউ যদি আমাদের দেখে থাকে...আমাদের সঙ্গে এত দামি জিনিস...। তার চেয়ে এক কাজ করলে তো হয়, রাত্তিরটা আমরা এখানেই থেকে যাই, সঙ্গে তো স্টোভ আর চাল-ডাল আছেই, মিংমা খিঁচুড়ি রাঁধবে।'

ধীরেনদা বললেন, 'সারারাত এখানে থাকব?'

'কেন, অসুবিধের কি আছে?'

'আমি যদি খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাই?'

'তাতে বিপদ আরও বাড়বে। রাস্তার মাঝখানে পাথর ফেলে রাখলে আমাদের গাড়ি উল্টে যাবে। তার চেয়ে বরং এখানে সারারাত জেগে পাহারা দেব। সেই তো ভাল।'

'বাড়িতে কিছু বলে আসিনি। ওরা চিন্তা করবে। ভেবেছিলুম রাত দশটার মধ্যে ফিরব!'

'এখনই তো দশটা বেজে গেছে। তোমাদের বাড়িতে খবর নেবার ব্যবস্থা আমি করচি। থানায় খবর দিচ্ছি, ওরা তোমার বাড়িতে জানিয়ে দেবে।'

কাকাবাবু ওয়ারলেস ট্রান্সমিশান যন্ত্রটা খুললেন। সেটাতে কড় কড় শব্দ হতেই উনি বললেন, 'রায়চৌধুরী স্পিকিং, ফ্রম দা ভীমবেঠ্‌কা হিলস...রায়চৌধুরী...।

মিংমা এই সব কথাবার্তা শুনে গাড়ি থেকে স্টোভটা বার করে জ্বেলে ফেলেছে। কাকাবাবু বললেন, 'আগে একটু চা করো। তারপর খিঁচুড়ি-টিচুড়ি হবে।'

জলের কলসিগুলো কিন্তু সাধুবাবার আশ্রমের কাছে রয়ে গেছে।

ধীরেনদা বললেন, 'চল সন্তু, তুমি আর আমি ধরাধরি করে একটা কলসি এখানে নিয়ে আসি। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে, আমাদের মুনলিট পিকনিক হবে।'

আমি বললুম, 'ধীরেনদা, আপনার একবারও বুক কাঁপেনি? আমার তো এখনও বুকের মধ্যে দুম্‌দুম্‌ হচ্ছে। গুপ্তধনের জন্য গর্ত খোঁড়ার সময় সব সময় মনে হচ্ছিল, কারা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখছে। এই বুঝি গুলি চালাল।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছিল? আমার এখন কি মনে হচ্ছে জান? রাত্তিরে যখন থেকেই যাওয়া হল, তখন আর-একবার ওখানে গেলে হয় না?'

'আবার যেতে চান?'

'আরও কত জিনিস আছে দেখতুম! সত্যি, গুপ্তধনের একটা সাংঘাতিক নেশা আছে।'

'যারা গুপ্তধন খুঁজতে যায়, তারা কেউ সাধারণত প্রাণে বাঁচে না।'

এর মধ্যে তিনজন খুন হয়েছে। কে জানে, তারাও আলাদাভাবে এখানে গুপ্তধনের জন্য এসেছিল কিনা! এসে হয়তো কিছু পেয়েও ছিল, খুন হয়েছে সেই জন্য!

'তবু আপনি বলছেন আবার যাব!

'তবু ইচ্ছে করছে যেতে। তা হলেই বুঝে দ্যাখ কি রকম নেশা!'

জলের কল্‌সিগুলো বাইরেই পড়ে আছে। সাধুবাবা ঘুমোতে গেছেন। আমি আর ধীরেনদা একটা কল্‌সি দু'জনে ধরে তুললাম।

সেটাকে ধরাধরি করে কিছুটা নিয়ে এসেছি, এমন সময় কোথায় যেন প্রচণ্ড জোরে দুম্‌দুম্‌ করে দুটো শব্দ হল। ঠিক যেন কামানের আওয়াজ কিংবা বোমা ফাটার মতন।

দু'জনে এতই চমকে গিয়েছিলুম যে, হাত থেকে পড়ে গেল কল্‌সিটা।

দু'জনেরই মনে হল, কাকাবাবুর কোনও বিপদ হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলুম গাড়ির দিকে।

কাকাবাবু আমাদের চিন্তায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমরা এসে পৌঁছবার পর কাকাবাবু বললেন, 'যাক, তোমরা এসেছ, নিশ্চিন্ত হলাম। মিংমা, তোমায় আর খিঁচুড়ি রাঁধতে হবে না, আমরা একটু বাদে ফিরে যাব।'

হাতের সোনার মূর্তিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এটারও আর কোনও দরকার নেই।'

ধীরেনদা বললেন, 'কি হল ব্যাপারটা?'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'ওটা সোনার মূর্তি নয়। সাধারণ লোহার মূর্তির ওপর পেতলের পাত মোড়া।'

ধীরেনদা চোখ একেবারে কপালে তুলে বললেন, 'আপনি ওই গুপ্তধনের জায়গায় এই লোহার মূর্তি পেয়েছেন? গর্তের মধ্যে?'

কাকাবাবু হাসলেন।

'মূর্তিটা গর্তে ছিল না। ছিল আমার ঝোলায়। অন্ধকারের মধ্যে গর্তে লুকিয়ে তারপর তোমাদের তুলে দেখিয়েছি! ওটা গুপ্তধনের জায়গাও না, ওখানে আমি দুটো ফাঁদ পেতে রাখতে গিয়েছিলাম। আমার কায়দাটা কাজে লেগে গেছে দেখছি। এক্ষুনি দেখতে পাবে। ওরে মিংমা, চা-টা অন্তত তৈরি করে ফ্যাল্।'

মিংমা ফ্লাস্কের জল নিয়ে সস্‌প্যানে চাপিয়ে দিল।

ধীরেনদা মাটি থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমার আগেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেরকম কথা একবার ভাবিওনি। গর্তের মধ্যে থেকে বেরুল কাকাবাবু আমি কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না এখনও! বোমা ফাটল কোথায়? কারা ফাটাল?'

'আমি ফাটালাম।'

'আপনি?'

'বোস, বলছি আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম যে, যারা গুপ্তধনের লোভে মানুষ খুন করেছে, তারা আজ রাতেই কিছু একটা হেস্তনেস্ত করার চেষ্টা করবে।

'কাল থেকে পুলিশ-পাহারা বসবে। আজ রাতে, অন্ধকারের মধ্যে যদি ওই গুহা আর জঙ্গলে আট-দশটা লোকও লুকিয়ে থাকে, তাহলেও তাদের ধরা সম্ভব নয়। অন্ধকারে খুঁজে পাবে কি করে? তাই আমি একটা ফাঁদ পাতলুম। অনেক চেষ্টা করে আজ দুপুরে এখানকার আমির, কাছ থেকে আমি দুটো মিথেন বোমা জোগাড় করেছি। কোনও লোহার জিনিস দিয়ে

ছুঁলেই এই বোমা ফেটে যায় তখন দুশো ফুটের মধ্যে যত মানুষ থাকবে সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। যেখানে আমরা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলাম, ওখানে গুপ্তধন থাকার কোনও কথাই নয়। তবু ওখানে গর্ত খুঁড়িয়ে একটাতে এই রকম আর-একটা পেতলের মূর্তি, আর দুটোতে দুটো বোমা লুকিয়ে রেখে এসেছি তখন। জানতুম, আড়াল থেকে কেউ না কেউ আমাদের লক্ষ্য করবেই। ঠিক সেটাই হয়েছে। ওই শোন।'

এবার জঙ্গলে শোনা গেল অনেক হুইশেলের শব্দ, মানুষের গলার আওয়াজ। আর বড়-বড় ফ্লাশলাইটের আলো ঝলসে উঠল। কৌতূহল সামলাতে না-পেরে আমরাও এগিয়ে গেলুম খানিকটা।

প্রায় কুড়িজন পুলিশ মিলে বয়ে নিয়ে এল আটজন ঘুমন্ত বন্দীকে। তাদের মধ্যে প্রথমেই আমি চমকে উঠলুম সাধুবাবাকে দেখে।

ধীরেনদা বললেন, 'ইস্, সাধুবাবা পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারেন নি।'

কাকাবাবু বললেন, 'ইনি আসলে সাধুবাবা নন। আগের বার এসে দেখেছিলাম দু'জন সাধুকে। ও ছিল চেলা। আসল বড় সাধুবাবা কাশীতে তীর্থ করতে গেছেন।'

পুলিশের অফিসার বললেন, 'আরও তিনজনকে চিনতে পারা গেছে। একজন মিউজিয়ামের দারোয়ান, একজন পুলিশের লোক আর এই যে গোঁফওয়ালাটিকে দেখছেন, ও সেই কুখ্যাত ডাকাত রামকুমার পাখি, খুনগুলো সম্ভবত এই করেছে। ভোজালি দিয়ে মুণ্ডু কেটে ফেলা এর স্টাইল। ওর নামে দশহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আর সবাইকে চিনতে পারবেন ঠিকই। সবই একজাতের পাখি। এদের একটু চাপ দিলেই জানতে পারেন, কোথায় এরা সুন্দরলালের ছেলে প্রেমকিশোরকে আটকে রেখেছে। সম্ভবত প্রেম কিশোরের মুখ থেকেই এরা প্রথমে ব্যাপারটা জানতে পারে। তার কি সাংঘাতিক পরিণতি।'

পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'স্যার, আপনি যে অসাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে এ-রকমভাবে ওদের ধরতে আমাদের সাহায্য করবেন...'

কাকাবাবু সে-কথা না শুনে মিংমার দিকে ফিরে বললেন, কই রে, তৈরী হল না এখনও? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এখন ভাল করে এক কাপ চা খেতে চাই।'

সাধুবাবার হাত

সন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলেজে যাবার জন্য বাসে উঠতে যাবে, এই সময় একটি বেশ জবরদস্ত চেহারার সাধু তার মুখোমুখি দাঁড়ালো। সাধুটির মাথায় জটা, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। বেশ লম্বা চেহারা, পরনে একটা গেরুয়া আলখাল্লা।

মেঘের ডাকের মতন গম্ভীর ভাঙাভাঙা বাংলায় সে বললো, এই লেড়কা, কুথা যাচ্ছিস? কলেজে? আজ তোর কলেজে যাওয়া হবে না। গেলে তোর খুব বিপদ হবে। যা যা, ঘরে ফিরে যা।

সন্তু শুনে হাসলো, একজন সাধুর কথা শুনে সে কলেজে যাওয়া বন্ধ করবে, এমন ছেলেই সে নয়। আর কলেজে গেলে যদি তার বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তা হলে তো সে আরও বেশি করে যাবে। বিপদের গন্ধ পেলেই তার মন চনমন করে ওঠে।

সে বলল, আচ্ছা সাধুবাবা, নমস্কার। তোমার কথা যদি মিলে যায়, তা হলে তোমাকে পরে একদিন মিষ্টি খাওয়াবো! এখন চলি।

হন হন করে পা চালিয়ে সে এগিয়ে গেল মোড়ের দিকে। দূরে বাস আসছে। হঠাৎ সন্তু পকেটে হাত দিল। এই রে, সে তো পয়সা আনে নি।

জামা বদলেছে একটু আগে, আগের জামার পকেটে পয়সাগুলো রয়ে গেছে। বাসে উঠলে সে ভাড়া দিতে পারতো না।

আবার তাকে ফিরে আসতে হলো, বাড়ির সামনে সেই সাধুবাবা দাঁড়িয়ে অন্য একটি লোকের হাত দেখছে। সন্তুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। ভাবখানা যেন এই কী বলেছিলুম না, কলেজ যেতে পারবি না।

সন্তু মনে মনে ঠোঁট উল্টে বললে, বাস ভাড়া নিতে ভুলে গেছি, এটা আবার একটা বিপদ নাকি? কী আর হতো, বড় জোর মাঝপথে বাস থেকে নামিয়ে দিত। এক্ষুনি আমি আবার পয়সা নিয়ে কলেজে যাবো।

বাড়িতে ঢুকে সন্তু আগের জামাটা খুঁজতে গিয়ে দেখলে সেটা সে ভুল করে বাথরুমে ছেড়ে এসেছে, আর মা এখন বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন।'

তা হলে একটু দেরি করতে হবে। কলেজের ফার্স্ট পীরিয়ডটা বোধহয় আর করা হবে না।

এই সময় ঝনঝন করে বেজে উঠলো টেলিফোন।

সন্তু টেলিফোনের রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওদিক থেকে ভেসে এলো তার বন্ধু জোজোর-র গলা।

জোজো বললে, কী রে, তুই কলেজে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়িস নি তো? যাক্ ভালো করেছিস। আজ কলেজ ছুটি হয়ে গেছে।

সন্তু চমকে উঠে বললে, অ্যাঁ? কলেজ ছুটি? কেন?

জোজো বললে, আমাদের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মারা গেছেন হঠাৎ। আমি গিয়ে দেখি নোটিশ ঝুলছে। তুই বাড়িতে থাক, আমি দুপুরবেলা যাচ্ছি তোর কাছে।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সন্তু একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে রইলো। ব্যাপারটা কী হলো। রাস্তার একজন সাধুবাবা তাকে দেখে একটা কথা বললেন, অমনি সেটা মিলে গেল? পুরোটা মেলেনি অর্ধেকটা। সত্যি তো আর কলেজে যাওয়া হোলো না।

দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখলো, সাধুবাবা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে একজন লোকের হাত দেখছেন।

কৌতূহলী হয়ে সন্তু সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

ধুতি-পাঞ্জাবীপরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোকের হাত ধরে সাধুবাবা বলছে, তুম যব ছোট থা, একবার তোমার পা ভেঙে গেল ঃ ঠিক কি না?

লোকটি মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ, সাধুবাবা পা ভেঙেছিল! দুমাস বিছানায় শুয়ে ছিলাম।

সাধুবাবা মাথা নেড়ে আবার বললেন, এখন তোমার পেট মে দরদ

আছে। পেট বেথা করে মাঝে মাঝে? ঠিক কি না? শনি বক্রি আছে, শনি কাটাতে হবে।

লোকটি বললে, হ্যাঁ মাঝে মাঝে পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাই।

তুম নোকরি করো...না, বেওসা? হাঁ হাঁ, হাতে লেখা দেখছি বেওসা।

হ্যাঁ সাধুবাবা, আমি ছোটখাটো একটা ব্যবসা করি। তবে ইদানিং আমার ব্যবসার...

তুমার এক বন্ধু জিগরি দোস্ত, তুমাকে চোট দিয়েছে। তোমার বেওসা ক্ষতি করে দিয়েছে।

লোকটি এবারে কাঁদো কাঁদো ভাব করে বললো, হ্যাঁ, সাধুবাবা, আমার এক বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার ব্যবসার সর্বনাশ করে দিয়েছে।

সাধুবাবা গম্ভীরভাবে বললেন, শনি বক্রি আছে। আংটি ধারণ করতে হবে।

সন্তু রীতিমতন অবাক। সাধুবাবা প্রত্যেক কথা মিলিয়ে দিচ্ছেন কী করে? হাত দেখে এরকম বলা যায়? কাকাবাবু তো একদিন তাকে বলেছিলেন যে হাত দেখার ব্যাপারটা একেবারে গাঁজাখুরি! আংটি বা মাদুলি ধারণ করাও কুসংস্কার।

সন্তু মুখ তুলে দেখলো কাকাবাবু ও বাড়ি থেকে বেরুলেন তক্ষুনি। সে ডেকে উঠলো, কাকাবাবু এদিকে এসো, একবার দ্যাখো।

সাধুবাবাকে দেখে কাকাবাবু হাসি মুখে কাছে এসে বললেন, কী আংটি বিক্রি করার চেষ্টা হচ্ছে বুঝি?

সন্তু তাড়াতাড়ি বললে, কাকাবাবু এই সাধুবাবা হাত দেখে যা বলছেন, সব মিলে যাচ্ছে।

সন্তুর কথায় মন না দিয়ে কাকাবাবু ধুতিপরা ভদ্রলোকটিকে বললেন ও মশাই, সাধুবাবাজী আপনার হাত দেখে কী কী বলেছে? ছোটবেলায় আপনার একবার হাত কিংবা পা ভেঙেছিল? আপনার পেটে কিংবা বুকে ব্যথা? আপনার অফিসের চাকরি কিংবা ব্যবসার অবস্থা এখন ভালো নয়। একজন বন্ধু আপনার ক্ষতি করেছে—

এবারে সন্তু আর সেই ভদ্রলোক দুজনেই স্তম্ভিত। কাকাবাবু এসব কথা জানলেন কী করে!

কাকাবাবু বললেন, মশাই, ছেলেবেলায় কার না একবার হাত পা ভেঙেছে। আমাদের সবারই ওরকম হয়। অনেক বাঙালীরই পেটের রোগ থাকে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। চাকরি কিংবা ব্যবসার ব্যাপারেও সকলেরই কিছু না কিছু অভিযোগ থাকে। বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাওয়াও এমন কিছু নতুন কথা নয়! বিশেষ করে আপনাদের বয়সেই বেশি হয়।

সাধুবাবা কটমট করে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুম্ কেয়া বোলতা হ্যায়? তুম ভাগো হিঁয়াসে।

কাকাবাবু একটু ভয় পাবার ভান করে বললেন, ওরে বাবা ভস্ম করে দেবে নাকি?

সাধুবাবা বললেন, তুম আপনা রাস্তামে যাও। তুম জানো আমি কে আছি? আমি মানুষের অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব কিছু দেখতে পারি।

কাকাবাবু ধুতিপরা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই সব আংটির পাথরটাথরের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের কোনো যোগ নেই, বুঝলেন?

এটা আমার কথা নয়, পঁচাত্তর জন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক এই কথা বলেছেন। পেটের রোগ কিংবা ব্যবসার রোগ আংটিতে সারে না।

সাধুবাবা এবারে কাকাবাবুর কাঁধে এক চাপড় মেরে বললেন, বেওকুফ, তুই আমার কথা অবিশ্বাস করছিস। তুই দেখবি আমার ক্ষমতা? দ্যাখ! সাধুবাবা এবারে নিজের মাথার জটা থেকে কয়েকটা চুল ছিঁড়লেন পট করে। তারপর ধুতিপরা ভদ্রলোকটিকে ধমকে বললেন, ফুঁ দেও! ফুঁ দেও।

ভদ্রলোকটি ভয় পেয়ে ফুঁ দিলেন সেই চুলে কয়েকবার। সাধুবাবা তারপর হাতটা একবার ঘুরিয়ে কাকাবাবুর মুখের সামনে এনে মুঠো খুললেন।

দেখা গেল সেই মুঠোতে চুল নেই, রয়েছে খানিকটা ছাই।

সাধুবাবা হুংকার দিয়ে বললেন, দেখ দেখ? মাথার চুল ছাই হয়ে গেলো।

কাকাবাবু বললেন,.এ তো অতি সাধারণ ম্যাজিক। আমিও ওরকম দু-একটা ম্যাজিক জানি। ওসব থাক। সাধুবাবাজী তুমি যে লোকজনের হাত দেখে বেড়াও, তোমাকে দু'একটা প্রশ্ন করি। তুমি জাপানের হিরোসিমা নাগাসাকির নাম শুনেছো? ঐ দুটো শহরে অ্যাটম বোমা পড়েছিলো। অ্যাটম বোমা ফাটার কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক মারা যায়। এখন বলো তো, ঐ সব লোকের হাতে কি লেখা ছিল যে তারা একসঙ্গে মারা যাবে?

সাধুবাবা বললেন, কেয়া অ্যাটম বোম্! বোম ভোলানাথ।

কাকাবাবু বললেন, ও তুমি অ্যাটম বোমা কি তা জানো না। ঠিক আছে, ট্রেন কাকে বলে জানো তো? গত সপ্তাহে ট্রেন দুর্ঘটনায় যে আড়াই শো লোক মারা গেল; তাদের হাতে লেখা ছিল যে, তারা একই দিনেই এক সঙ্গে মরবে?

সাধুবাবা ধমক দিয়ে বললেন, ও সব বাত ছোড়ো। তুমার হাত দেখে আমি যদি সব কুছ বলে দিতে পারি?

কাকাবাবু বললেন, আমার হাত দেখার দরকার নেই। তোমার হাতটা বরং দেখিতো?

কাকাবাবু খপ করে সাধুবাবার হাতটা চেপে ধরে উৎফুল্লভাবে বললেন, বাবা, হাতে সব লেখা আছে দেখছি! বাড়ি কোথায় ছিল, বিহারে তাই না?

সাধুবাবা আপত্তি করতে পারলেন না। মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেল। কাকাবাবু আবার বললেন, যব লেড়কা থা, একবার হাত ভেঙেছিল না?

সাধুবাবা মাথা দু'দিকে জোরে জোরে নেড়ে বললেন, নেহি! নেহি মিলা!

কাকাবাবু বললেন, ও হাত না, পা! পা ভেঙেছিল। ঠিক না?

সাধুবাবা এবারে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন।

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও আরও বলছি। তুমি যে সাধু হবে তা তোমার হাতেই লেখা আছে, দেখছি। কেন সাধু হলে? আচ্ছা সাধুবাবা, তোমাদের গ্রামে একটা খুন হয়েছিল না? সত্যি কথা বলো।

সাধুবাবা এবারে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উল্টো দিকে ফিরে এক দৌড় লাগালেন। মিলিয়ে গেলেন চোখের নিমেষে।

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন হো হো করে।

ধুতিপরা লোকটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ও মশাই, আপনি যা বললেন, তা সত্যি নাকি? আপনি কি করে জানলেন? হাত দেখে বলে দিলেন, ওদের গ্রামে খুন হয়েছে?

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আন্দাজে, সব আন্দাজে বলেছি।

মহাকালের লিখন

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, এ কী! এগুলো কিসের ডিম?

সন্তুও বেশ অবাক হয়েছিল। ডাক বাংলার কুক তাদের দুজনের জন্য একটা প্লেটে চারটে ডিম সিদ্ধ দিয়ে গেছে। ওরকম ডিম সন্তু কক্ষনও আগে দেখেনি। মুরগীর ডিমের চেয়েও একটু ছোট, পুরোপুরি গোল ঠিক পিং পং বলের মতন। প্লেটে সাজানো যেন অবিকল চারটি বল, এক্ষুনি ওগুলো নিয়ে টেবিল টেনিস খেলা যায়।

বিমান আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছে। সে শুধু এক কাপ চা নিয়ে বসেছে খানিকটা দূরে।

বিমান হাসতে হাসতে বলল, কাকাবাবু আপনি চিনতে পারলেন না?

বাংলোর কুকটি বাঙালী। সে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, স্যার, এখানে হাঁসের ডিম তো পাওয়াই যায় না। মুরগীর ডিম চালান আসে, তাও মাঝে মাঝে কম পড়ে যায়। কিন্তু কচ্ছপের ডিম পাওয়া যায় যথেষ্ট!

কাকাবাবু বললেন, ছি ছি ছি ছি!

বিমান বলল, খেতে কিন্তু খারাপ নয়। আপনারা খেয়ে দেখুন! আমি বলছি ভালো লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, তুমি আমাকে কচ্ছপের ডিম চেনাচ্ছো? এক সময় কত কচ্ছপের ডিম খেয়েছি। কচ্ছপের মাংস খেয়েছি। এক একটা কচ্ছপ মারলে তার পেটের মধ্যে চৌদ্দ পনেরোটা ডিমও পাওয়া যেত! এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও। আমরা খাব না।

বিমান বলল, এক সময় খেতেন, এখন খাবেন না কেন? আপনার আর সহ্য হয় না? তা হলে সন্তু খেয়ে নিক।

কাকাবাবু বললেন, না, সন্তুও খাবে না। তোমরা জান না, কচ্ছপ মারা নিষেধ? সারা পৃথিবীতেই কচ্ছপের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পর কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। শুধু শুধু এইভাবে কচ্ছপের ডিম নষ্ট করার কোনো মানে হয়?

বিমান বলল, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এগুলো তো সেদ্ধই হয়ে গেছে। এগুলো খেয়ে নিন। এগুলো থেকে তো আর বাচ্চা বেরুবে না!

কাকাবাবু বললেন, তবু খাওয়া উচিত নয়। তুমি যদি ভাবো এই ডিমগুলো তো আমি নিয়ে আসিনি, আমি সেদ্ধও করিনি, সুতরাং আমার খেতে দোষ কী? তা হলে অন্য লোক আরও বেশি করে এই ডিম ধরবে, বাজারে এনে বিক্রি করবে। সেইজন্য একদম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। ডিম নিয়ে যাও, আমরা শুধু টোস্ট আর চা খাব!

বাংলোর কুকটি বলল, আপনি বললেন, স্যার, কচ্ছপ কমে যাচ্ছে। এদিকে কিন্তু অনেক কচ্ছপ পাওয়া যায়। ওরা সমুদ্রে থাকে, কিন্তু ডিম পাড়বার সময় ওপরে উঠে আসে। মাটি খুঁড়ে সামান্য একটু গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে, তারপর আবার মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়। লোকেরা সেই মাটি খোঁড়া দেখলেই চিনতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, লোকেরা অমনি সেই ডিমগুলো চুরি করে আনে, তাই তো! এখন যতই কচ্ছপ থাক, এইভাবে ডিম নষ্ট হলে একদিন কচ্ছপের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে না? পৃথিবীর কত প্রাণী এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে!

বিমান বলল, কচ্ছপ মারাও যে খুব সোজা। একবার ধরে উল্টে দিতে পারলেই হলো। ওরা নিজে থেকে সোজা হতে পারে না।

কাকাবাবু বললেন, নিরীহ প্রাণী বলেই এক সময় সাহেবরা হাজার হাজার কচ্ছপ মেরে ফেলেছে। ভারত মহাসাগরে এমন অনেক দ্বীপ ছিল যেখানে লক্ষ লক্ষ কচ্ছপের বাসা ছিল। এক একটা দ্বীপে যখন সাহেবদের জাহাজ ভিড়েছে, তখন খেলার ছলে তারা যত ইচ্ছে কচ্ছপ মেরেছে!

বিমান বলল, সাহেবরা তো সর্বভুক। কচ্ছপের মাংসও নিশ্চয়ই ওরা খায়!

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, টারটল সুপ তো অনেকের প্রিয়। কিন্তু শুধু

খাবার জন্য নয়। বললাম না, খেলার জন্যও মেরেছে? এক দিনে কি হাজার হাজার কচ্ছপ খাওয়া যায়? মজা করার জন্য জাহাজের খালাসীরা কচ্ছপগুলোকে ধরে ধরে উল্টে দিত। কে কটা পারে তার প্রতিযোগিতা হতো। তারপর ওরা জাহাজে নিয়ে চলে যেত। দিনের পর দিন হাজার হাজার কচ্ছপ অসহায়ভাবে চিৎ হয়ে পড়ে থাকত। দৃশ্যটা ভাবো তো। তারপর তারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যেত!

সন্তু বলল, ইস!

বিমান বলল, চলুন কাকাবাবু এবার আমাদের বেরুতে হবে!

কাকাবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাইনিং রুম ছেড়ে সবাই চলে এল বাইরে। একটা ঝকঝকে নতুন জিপসি গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। উর্দি পরা ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

কাকাবাবু জোরে একবার শ্বাস টেনে বললেন, আঃ, এখানকার বাতাস কি পরিষ্কার! চমৎকার টাটকা গন্ধ। এইটুকু রাস্তা আর গাড়িতে গিয়ে কী করব। চলো, হেঁটেই যাই।

বিমান বলল, হাঁটতে অসুবিধে হবে না আপনার?

কাকাবাবু হেসে বললেন, না হে, এই ক্রাচ্ নিয়েই আমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারি। চলো, চলো!

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। একেবারে লেখার কালির মতন ঘন নীল জল। রয়াল ব্লু! খুব কাছেই একটা দ্বীপ। সবুজ গাছপালায় এমন ভর্তি যে এখান থেকে মনে হলো এক ইঞ্চিও জায়গা খালি নেই। এমন নিবিড় জঙ্গল সন্তু আর কোথাও দেখেনি।

সন্তু এই দ্বিতীয়বার এসেছে আন্দামানে! পোর্ট ব্লেয়ার শহরটা তার বেশ চেনা লাগছে। মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে তার। এখানকার সমুদ্র অন্য রকম, দীঘা কিংবা পুরীর সঙ্গে কোন মিল নেই। তীরের কাছে জল একটুও ঘোলা নয়, একেবারে স্বচ্ছ, একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাছের ঝাঁক দেখা যায়।

মোটর লঞ্চটাও রেডি হয়ে আছে। ওপরের ডেকের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এর মালিক রূপেন মিত্র। কাকাবাবুদের দেখে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন, 'আসুন, আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। আমরা ঠিক ন'টার সময় স্টার্ট করব।

লঞ্চটা মাঝারি আকারের। নীচে চারখানা ক্যাবিন, অনায়াসে আটজন লোক শুতে পারে। রান্না-বান্নার ব্যবস্থাও আছে। একসঙ্গে বেশ কয়েকদিন সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ানো যায়। রূপেনবাবুদের ঝিনুক আর মাদার অফ পার্ল-এর ব্যবসা! আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি সমুদ্রে ঝিনুকের অন্ত নেই। কতরকম ঝিনুক, মাঝে মাঝে শঙ্খও উঠে আসে। মাদার অফ পার্ল দিয়ে মেয়েদের গয়নার লকেট হয়।

এবার অবশ্য এই লঞ্চে ঝিনুক তুলতে যাওয়া হচ্ছে না।

বিমান একজন বিমান-চালক। তার নামের সঙ্গে কাজের খুব মিল। সে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের পাইলট, মাঝে মাঝেই তাকে আন্দামানে আসতে হয়। রূপেন মিত্তিরদের সঙ্গে তার খুব ভাব। বিমানই কাকাবাবুদের এখানে বেড়াতে আসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওপরের ডেকে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে। সবাই বসল সেখানে। লঞ্চটা বন্দর ছেড়ে ছুটে চলল গভীর সমুদ্রে। পাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই অন্য লঞ্চ যাচ্ছে, সেগুলোতে যাত্রী ভর্তি। এখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলে লঞ্চ ছাড়া উপায় নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন্ দিকে যাব?

রূপেনবাবু বললেন, আমরা যাব রঙ্গত আয়ল্যাণ্ডের দিকে। পথে অবশ্য অনেক দ্বীপ পড়বে।

বিমান বলল, এখানে কত যে দ্বীপ। অনেক দ্বীপের কোনো নামই নেই! কাকাবাবু, আপনি তো জানেন, আপনি এদিকটা ভালো করে ঘুরছেন।

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

বিমান আবার বলল, জানেন, রূপেনবাবু একবার কাকাবাবু আর সন্তু একেবারে হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন।

রূপেনবাবু বললেন, তাই নাকি? যে দ্বীপটায় জারোয়া উপজাতি থাকে, আমরা তো সেটা এড়িয়ে চলি। কাছেই যাই না। আপনি গেলেন কী করে? ওরা আপনাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করে নি?

কাকাবাবু মৃদু হেসে বললেন, সে এক লম্বা গল্প। এখন সে কথা থাক। আচ্ছা রূপেনবাবু, আপনি কি নিজের চোখে মারমেড দেখেছেন?

রূপেনবাবু বললেন, না, আমি দেখি নি। আমি লঞ্চে করে এখানকার সমুদ্রে অনেক ঘুরেছি! বড় বড় তিমি দেখেছি। হাঙরের ঝাঁক তো যখন তখন দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লাইং ফিস দেখেছি। ডলফিনও দেখেছি। কিন্তু মারমেড জাতীয় কিছু কখনও আমার চোখে পড়ে নি।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, বিমান যে বলল, আপনি দেখেছেন? মারমেড দেখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো বিমান আমাদের এখানে টেনে আনল।

বিমান বলল, রূপেনবাবু নিজের চোখে দেখেছেন, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলেছি যে, রূপেনবাবুর লোকজনেরা দেখেছে!

রূপেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার লঞ্চের দু'জন খালাসী নাকি দেখেছে। খানেক ধরে এখানে একটা গুজব রটেছে যে একটা মারমেড বা জলকন্যাকে নাকি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কোনো নির্জন দ্বীপের ধারে বালির ওপর সে বসে থাকে! মানুষের সামান্য সাড়াশব্দ পেলেই চোখের নিমেষে জলে ঝাঁপ

দেয়, তারপর গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। রঙ্গত আর মায়া বন্দরের বেশ কয়েকজন লোকই নাকি দেখতে পেয়েছে তাকে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি, এটা বিশ্বাস করেন!

রূপেনবাবু বললেন, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু নেই। নিজের চোখে তো দেখি নি!

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, যারা দেখেছে, তারা মারমেডটিকে কেমন দেখতে বলেছে?

রূপেনবাবু বললেন, ওপরের দিকটা একটা সুন্দরী মেয়ে, লম্বা চুল, ফর্সা রং, টানা টানা চোখ। তার তলার দিকটা মাছের মতন। দুটো পা নেই, তার বদলে লেজ যেমন হয়!

কাকাবাবু বললেন সবাই এই রকমই বলে। কোপেনহ্যাগেন শহরে এইরকম একটি মারমেডের মূর্তিও আছে।

বিমান বলল; সেটা তো বিখ্যাত। আমি দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, মুর্তিটা তুমি দেখেছ। কিন্তু আসল মারমেড এ পর্যন্ত কোনো মানুষ চোখে দেখে নি!

বিমান বলল, অ্যাঁ? কেউ দেখেনি? তবে যে বহুকাল ধরে এত গল্প!

কাকাবাবু বললেন, সবই গল্প। মানুষের কল্পনা, কোনো প্রমাণ নেই। মাঝে মাঝে গুজব ওঠে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ছবি তুলতে পারে নি।

সন্তু বলল, আমি ক্যামেরা এনেছি। সত্যি যদি একটা মারমেড দেখতে পাই, তা হলে পটাপট ছবি তুলব। তা হলে সেটা একটা বিরাট আবিষ্কার হবে তাই না?

কাকাবাবু বললেন, তা হবে। কিন্তু বেশি আশা করিস না। বেশি আশা করলে বেশি নিরাশা হতে হয়। সমুদ্রে ওরকম কোনো প্রাণী থাকতে পারে না!

বিমান অবিশ্বাসের সুরে বলল, থাকতে পারে না? একথা কি করে বললেন? সমুদ্রে এখনও কত রকম রহস্যময় প্রাণী আছে, মানুষ কি সব জানে?

কাকাবাবু বললেন, রহস্যময় প্রাণী থাকতে পারে। কিন্তু যে-প্রাণীর ওপরের দিকটা মানুষের মতন, তার হার্ট আর লাংসও তো মানুষের মতন হবে। সে বেশীক্ষণ জলে ডুবে থাকবে কি করে? তবে, অন্য দুটি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের দেশে অনেকে মানুষ বলে ভুল করে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, মানুষের মতন প্রাণী?

কাকাবাবু বললেন, মোটেই মানুষের মতন নয়। একেবারে জলজন্তু, একটির নাম মানাটি আর একটির নাম ডুগং! এরা বিরাট বিরাট প্রাণী। এক একটির ওজন প্রায় এক টন! তিমি মাছ জলের ওপর মুখ ভাসিয়ে নিঃশ্বাস

নেয়, তেমনি মানাটি আর ডুগং-রাও প্রায়ই জলের ওপর মুখখানা ভাসিয়ে থাকে। বহুকাল ধরেই গভীর সমুদ্রে নাবিকরা এদের দেখেছে। এদের মুখের সঙ্গে মানুষের কিছুটা মিল আছে!

একটু থেমে, অনেকখানি চওড়া করে হেসে কাকাবাবু আবার বললেন, মেয়েরা তো জাহাজের নাবিক হয় না। নাবিকরা সবাই পুরুষ। সেই জন্য মানুষের মুখের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এমন প্রাণী দেখেই নাবিকরা তাকে কোনো মেয়ে বলে মনে করে। সেই থেকেই জলকন্যার কাহিনী চালু হয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ঐ মানাটি আর ডুগংদের কেমন দেখতে?

কাকাবাবু বললেন, আমি নিজের চোখে দেখিনি, ছবি দেখেছি। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেখে লিখেছেন যে ওদের মুখে বিচ্ছিরি, রাগী বুড়োর মতন। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে অনেকটা বড়। এদের তলার দিকটা মাছের মতন। কিন্তু এরা মাছ নয়। ম্যামাল। অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী শিরদাঁড়া আছে।

বিমান বলল, দূর ছাই!

কাকাবাবু বললেন, আমি মারমেড দেখার আশা করিনি। তবে একটা মানাটি কিংবা ডুগং যদি দেখতে পাই, সেটাই যথেষ্ট। এদিককার সমুদ্রে সাধারণত ওদের দেখা পাওয়া যায় না।

রূপেনবাবু বললেন, আমার খালাসী দু'জন কিন্তু জোর দিয়ে বলেছে, ওরা একটা মেয়ের মতন প্রাণীকেই দেখেছে। আমাদের আজ ঠিক দেখাবে।

কাকাবাবু বললেন, ভালো কথা!

এরপর কফি এল। কফি খেতে খেতে ওরা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। নির্জন, সুন্দর সুন্দর দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে লঞ্চটা। মাঝে মাঝে বড় বড় ঢেউতে লাফিয়ে লাফিয়েও উঠছে। জল ছিটকে আসছে ওপরের ডেক পর্যন্ত। কাকাবাবু, সন্তু, বিমান তিনজনেই প্যান্ট-শার্ট পরা। কিন্তু রূপেনবাবু বনেদী বাঙালীদের মতন পরে আছেন কুচোনো ধুতি আর ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি। একবার জলের ছিটেয় তাঁর পাঞ্জাবি অনেকটা ভিজে গেল!

কাকাবাবু একটা বায়নোকুলার এনেছেন। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্যরাও দেখছে।

এক সময় সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে, ঐ যে!

সবাই চমকে ঘুরে তাকাল।

না, জলকন্যাও নয়, মানাটি কিংবা ডুগং-ও নয়, এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ। ফ্লাইং ফিস। পার্শের মতন সাইজ, দু'পাশে ডানা, মাছগুলো জল থেকে লাফিয়ে উঠে ফর ফর ফর ফর করে বেশ খানিকটা উড়ে আবার জলে ডুব দিল।

কাকাবাবু বললেন, এও তো একটা বেশ ভালো জিনিস দেখলি রে সন্তু।

এরপর আরও তিন ঘন্টার মধ্যে আর কিছু দেখা গেল না।

সমুদ্র যতই সুন্দর হোক, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগে। লঞ্চের ভট ভট ভট ভট শব্দটাও বিরক্তিকর। যদিও বেশ হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। গরম না লাগলেও চোখ ঝলসে যাচ্ছে যেন!

এক সময় লঞ্চটা হঠাৎ থেমে গেল।

রূপেনবাবু নীচের একটা ক্যাবিনে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবিটা পাল্টাতে! ওপরে এসে বললেন, আমার খালাসীরা একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কাছেই ঐ যে দ্বীপটা দেখছেন, ওর ধারেই নাকি দু'বার দেখা গেছে মারমেডকে। এখানে অপেক্ষা করলে তার দেখা মিলতেও পারে। কিন্তু লঞ্চের শব্দ শুনলেই সে পালাবে। একটা নৌকা করে আমরা এ দ্বীপটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি। দুপুরের খাবারেরও তো সময় হয়েছে। ওখানে গিয়েই আমরা খেয়ে নেব।

কাকাবাবু বললেন, চমৎকার আইডিয়া! জলকন্যা কিংবা বিরাট কোনো জলজন্তু দেখা যাক বা না যাক, নতুন একটা দ্বীপে পিকনিক তো হবে! সেটাই হোক!

বিমান সভয়ে বলল, এই দ্বীপে আবার জানোয়াররা থাকে না তো?

রূপেনবাবু বললেন, না-না। দেখছ না, ছোট্ট দ্বীপ। চার পাশটাই তো দেখা যাচ্ছে। আন্দামানের জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক থাকে না। নির্ভয়ে ঘোরা যায়!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এই দ্বীপটার নাম কী?

রূপেনবাবু বললেন, তা তো জানি না। বোধহয় কোনো নাম নেই। এখানকার অনেক দ্বীপ শুধু নম্বর দিয়ে চেনানো হয়।

সন্তু বলল, আমি এই দ্বীপটার নাম দিলাম মারমেড আয়ল্যাণ্ড!

লঞ্চের গায়েই বাঁধা রয়েছে একটা ডিঙ্গি নৌকা। সেটা ভাসান হলো জলে। মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল ছোট দ্বীপটায়।

দ্বীপটা একেবারে সুন্দর আঁকা একটা ছবির মতন। তীরের কাছে মিহি, সাদা বালি ছড়ানো। তারপর নানান রঙের নুড়ি পাথর। তারপর গাছপালা। তবে এখানকার জঙ্গল খুব ঘন নয়। বোধহয় কখনও কখনও সমুদ্র ফুলে উঠে পুরো দ্বীপটা ডুবিয়ে দেয়। ঘাস কিংবা ঝোপঝাড় কিছু নেই। বড় বড় গাছ আর মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা।

তীর থেকে খানিকটা ভেতরে চলে এসে সন্তু দেখতে পেল একটা গোল মতন পাথরের ঢিবি। জুতো খুলে সন্তু তরতর করে সেটার ওপরে উঠে গেল।

তারপর আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, এই জায়গাটায় সবাই মিলে বসলে খুব ভালো হয়। এখান থেকে সব দিক সমুদ্র দেখা যাচ্ছে!

কাকাবাবু পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বেশ পেছল! আমি আর খোঁড়া পা নিয়ে উপরে উঠব না!

বিমানও জুতো খুলে উঠে গেল ওপরে! টিবিটা একতলা সমান উঁচু। এখানে খুব বড় গাছ নেই বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বিমান বলল, বাঃ এরকম জায়গায় একটা বাড়ি বানাতে পারলে গ্র্যাণ্ড হতো। বেশ নিজস্ব একটা দ্বীপ। তাতে একটাই বাড়ি থাকবে।

কাকাবাবু বললেন, আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে দ্বীপের চারপাশটা একবার ঘুরে আসি।

কাকাবাবুর আড়ালে চলে যেতেই বিমান একটা সিগারেট ধরাল। কাকাবাবু সামনে সে সিগারেট খায় না কখনও।

ছোট নৌকোটা লঞ্চের দিকে ফিরে যাচ্ছে খাবার-দাবার আনতে। লঞ্চটা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে, এখন ভাসতে ভাসতে এদিকেই যেন সরে আসছে!

সন্তু আর বিমান গল্প করছে, হঠাৎ চমকে উঠল দুজনেই।

পাথরটা একবার কেঁপে উঠল না? মাটি কাঁপছে?

ওরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোন কথা বলবার আগেই আবার পাথরটা কেঁপে উঠল বেশ জোরে।

এবার বিমান চিৎকার করে উঠল, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

সন্তুও সড়াৎ করে পাথরটা থেকে গড়িয়ে নেমে চেঁচিয়ে বলল, কাকাবাবু সাবধান! ভূমিকম্প হচ্ছে!

সন্তুর ধারণা হলো, ভূমিকম্পে দ্বীপটার মাঝখানটা ফেটে দু'ভাগ হয়ে যাবে, তারপর সব সুদ্ধু ডুবে যাবে সমুদ্রে।

কাকাবাবু জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পিছিয়ে এলেন খানিকটা। সন্তু আর বিমান দু'জনেই চ্যাঁচাচ্ছে, তিনি ওদের কাছে এসে বললেন, কী হয়েছে? কোথায় ভূমিকম্প? আমি তো কিছু টের পেলাম না।

রূপেনবাবা এসে বললেন, আমিও তো বুঝতে পারিনি।

বিমান বলল, পাথরটা দু'বার জোরে কেঁপে উঠল!

সঙ্গে সঙ্গে সন্তু চোখ বড় বড় করে সাঙ্ঘাতিক বিস্ময়ে বলল, একী! একী!

ওদের চোখের সামনে পাথরের টিবিটা দুলতে শুরু করেছে। আর একটু একটু এগোচ্ছে। ঠিক জীবন্ত কোনো প্রাণীর মতন।

ভয় পেয়ে সবাই ছিটকে দূরে সরে গেল।

বিমান বলল, ওরে বাপ রে, এটা কোন বিরাট জন্তু?

রূপেনবাবু এক দৌড় মেরে জলের ধারে গিয়ে তাঁর খালাসীদের বলতে লাগলেন, ওরে রঘু, ওহে রতন, মানসিং, শিগগির লঞ্চটা নিয়ে এসো প্রকাণ্ড জানোয়ার! মেরে ফেলবে। মেরে ফেলবে।

পাথরের ঢিবির মতন প্রাণীটা কিন্তু একটু একটু নড়তে লাগল শুধু। ওদের দিকে তেড়ে এল না।

কাকাবাবু সাহস করে একটু এগিয়ে এসে একটা ক্রাচ দিয়ে পাথরটার গায়ে একটু ঘষে দিলেন। সেটার ওপরে শ্যাওলা জমে আছে, একটুখানি খসে গেল।

কাকাবাবু বললেন, এটা তো মনে হচ্ছে একটা কচ্ছপ!

বিমান বলল, অ্যাঁ? এতবড় কচ্ছপ? তা কখনও হতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও দেখি, কচ্ছপ হলে নিশ্চয়ই একটা মুখ থাকবে। মুখটা দেখলেই বোঝা যাবে!

কাকাবাবু প্রাণীটার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। বেশি খুঁজতে হলো না। একটা গাছের আড়াল থেকে ঝটাং করে বেরিয়ে এল তার গলা আর মুখ। হাতির শুঁড়ের মতন মোটা। ক্রিকেট বলের সাইজের দুটো চোখ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে! দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে।

কাকাবাবু তবু ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, মুখটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা কচ্ছপ। সমুদ্রে অনেক বড় বড় কচ্ছপ থাকে বটে, কিন্তু এত বড় কচ্ছপ যে হতে পারে, তা কখনও শুনিনি!

সন্তু বলল, কাকাবাবু আর এগোবেন না!

কাকাবাবু বললেন, কচ্ছপ যখন, তখন ভয়ের কিছু নেই। এরা নিরীহ প্রাণী, মানুষকে তেড়ে এসে কামড়ায় না।

এর মধ্যে রূপেনবাবুর চ্যাঁচামেচি শুনে লঞ্চটা হুইশল দিতে দিতে চলে এল এদিকে! লাঠি, লোহার রড নিয়ে নেমে এল ছ'সাতজন খালাসী। হৈ হৈ করে কাছে এসে বলল, কোন্ জানোয়ার? কোথায়? কোথায়?

এতবড় একটা কচ্ছপ দেখে তাদেরও চক্ষু ছানাবড়া। একজন বলল, একটা পাহাড়ের মতন কচ্ছপ? স্বপ্ন দেখছি না তো?

আর একজন বলল, এটাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে!

রূপেনবাবুও এখন খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি এবার খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাকে পোর্ট ব্লেয়ার নিয়ে যাব। তারপর কলকাতায় নিয়ে যাব। এরকম কচ্ছপ কেউ কখনও দেখেনি তারপর বিলেত আমেরিকায় পাঠাব। এটাকে উল্টে দাও। উল্টে পাগুলো বাঁধ।

কিন্তু এত বিরাট কচ্ছপকে উল্টে দেওয়া সহজ নাকি? কচ্ছপটা তার মুণ্ডুটা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে।

একজন বলল, সাবধান! কচ্ছপের মুখের কাছে গেলে কামড়ে দেবে।

হাত কিংবা পা কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না। ওর মুখটাকে আগে আটকাতে হবে।

একজন একটা লোহার রড বাড়িয়ে দিলে কচ্ছপটার মুখের কাছে। কচ্ছপটা সেটা সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরে, দুটো ঝটকা মারতেই রডটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল!

রূপেনবাবা দূর থেকেই এক লাফ দিয়ে বললেন, বাপরে! দাঁতের কি জোর!

রঘু নামের একজন খালাসী বলল, স্যার, আমি কচ্ছপ ধরার কায়দা জানি। একটা শক্ত নাইলনের দড়ি চাই।

একজন দড়ি আনতে ছুটে গেল! অন্য সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে! এতবড় চেহারা নিয়েও কচ্ছপটা বোধহয় বেশ ভীতু প্রাণী। সে দৌড়ে পালাবারও চেষ্টা করল না কারুকে তেড়ে কামড়াতেও এল না।

রঘু নাইলনের দড়িটা পেয়ে একটা ফাঁস তৈরি করল। তারপর সেটা ছুঁড়ে দিল কচ্ছপটার মুখের দিকে। দু'তিনবারের চেষ্টায় ফাঁসটা জড়িয়ে গেল তার গলায়। দু'জন খালাসী দু'দিক থেকে টান মারতেই সেটা আঁট হয়ে গেল। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ দুটো দিয়ে।

সন্তু বলল, কচ্ছপটা বোধহয় খুব বুড়ো।

কাকাবাবু বললেন, শুনেছি ওরা বহুদিন বাঁচে। এর বয়েস কয়েক শো বছর হলেও আশ্চর্য কিছু নেই।

রঘু বলল, এবার সবাই মিলে হাত লাগিয়ে ওকে উল্টে দিতে হবে!

সবাই কাছে এসে হাত লাগাবার আগেই কচ্ছপটার পিঠটা কেঁপে উঠল কয়েকবার। ওর পিঠে কিছু কিছু মাটির চাপড়া ছিল, তা খসে গেল। তখন দেখা গেল, তার পিঠে অনেক হিজি বিজি দাগ।

সন্তু বললো, কাকাবাবু দেখুন, দেখুন, এই দাগগুলো। মনে হচ্ছে এক জায়গায় অ লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, ঘরের দেওয়ালে জল পড়ে নোনা ধরলেও অনেক সময় এরকম মনে হয়। অ নয় রে, আ, পাশের দাগটা ঠিক আকারের মতন।

বিমান, রূপেনবাবুরাও ঝুঁকে এসেছেন দেখতে। বিমান বলল, তার পাশেই তোর! কেউ যেন লিখেছে 'আর'।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে কচ্ছপটার পিঠটা খুব ভাল করে ঘষলেন! অনেক ময়লা সরে গেল। এবারে ফুটে উঠল আরও অক্ষর। 'আর'-এর একটু পরেই 'মা'।

সন্তু বলল, তারপর এটা কি? এ মা এ?

কাকাবাবু বললেন, এ নয় তয়ে র-লা। মাত্র তা হলে হলো, 'আর মাত্র'।

রূপেনবাবু বললেন, আশ্চর্য! আশ্চর্য কচ্ছপের পিঠে এরকম লিখল

কাকাবাবু গভীর বিস্ময়ে কচ্ছপের পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর অভিভূতভাবে বললেন, প্রকৃতি লিখে দিয়েছে! কিংবা মহাকালও বলতে পারেন। প্রবাদ আছে, মহাকুর্ম অর্থাৎ বল কোনো কচ্ছপের পিঠে মহাকাল তার ইতিহাস লিখে রাখে!

সন্তু বলল, আরও কিছু লেখা আছে?

কাকাবাবু বললেন, আমি সবটা পড়তে পেরেছি। এই দ্যাখ ভালো করে। আর মাত্র দুটি। মেরো না, মেরো না, মেরো না!

সন্তু বললো, হ্যাঁ, স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রকৃতি লিখে দিয়েছে যে পৃথিবীতে এরকম কচ্ছপ মাত্র দু'টো বেঁচে আছে।

বিমান বলল, কি বলছিস! প্রকৃতি কিংবা মহাকাল বাংলায় লিখবে নাকি!

কাকাবাবু বললেন, মহাকাল কখন কোন্ ভাষায় লেখেন, তার তুমি আমি কি জানি! কথাগুলো যে লেখা রয়েছে, তা তো সত্যি। কচ্ছপটা নিজেই পিঠ ঝাঁকিয়ে তা আমাদের দেখাল।

তারপর হঠাৎ কাকাবাবু হাত জোড় করে আবেগের সঙ্গে খালাসীদের বললেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, ওকে ছেড়ে দিন। বন্দী অবস্থায় যদি ও মরে যায়, তা হলে পৃথিবী থেকে এই কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদের ধ্বংস করার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

খালাসীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রূপেনবাবু বললেন, ওরে বাপ রে বাপ! জন্মে কখনও এমন দেখিনি। ভগবান নিজে লিখে দিয়েছেন ওকে মেরো না! ওকে বন্দী করলে আমাদের মহাপাপ হবে। ইনি সাক্ষাৎ কুর্ম অবতার। ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, শিগগির ছেড়ে দে!

খালাসীরা এবার ফাঁস খুলে নিল ওর গলা থেকে। কাকাবাবু সবাইকে দূরে সরে যেতে বললেন। সকলে সার বেঁধে কচ্ছপটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

কচ্ছপ এবার থপ থপ করে এগোতে লাগল জলের দিকে।

রূপেনবাবু হাত জোড় করে বললেন, জয় বাবা কুর্ম অবতার। আমাদের দোষ নিও না।

তাঁর দেখাদেখি অন্য খালাসীরাও নমস্কার করল।

কচ্ছপটা জলের কাছাকাছি গিয়ে একবার মুখটা ফিরিয়ে ওদের দেখল! তারপর প্রবল আলোড়ন তুলে মিলিয়ে গেল নীল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে।

সমাপ্ত